উচ্চারণ: রাব্বে জেদ্‌নিন এলমা

হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।

বিশ্ব বুঝিল—কেন বলেছিলেন—
শেষ নবী মহম্মদ্—
মোর পরে যদি নবী হতো কেউ
ওমর পাইত পদ্।

ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস: তৃতীয় খণ্ড

ফারুক-ই-আজম

হযরত ওমর ফারুক

কোরআনের আলোকে: চার খলিফা, খোলাফা-ই-রা'শেদীন
(ন্যায়পরায়ণ খলিফাগণ)

ডক্টর ওসমান গনী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট.,

মল্লিক ব্রাদার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

HISTORY OF ISLAM—VOL. III

by—DR. OSMAN GHANI
M.A., Ph.D., D.Litt., R.L.S., F.A.S., S.R.F.

প্রকাশনায় :
আল্-হাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স,
৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫৮

প্রচ্ছদ ও অলংকরণে :
কুমার অজিত , শওকৎ আরা গনী (সেতারা)
ও বরুণ সাহা

অক্ষর বিন্যাসে :
স্ক্রিপ্ট
২০এ রামনাথ বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণে :
ইউনিক প্রিন্ট এন্ড প্রসেস
২০এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
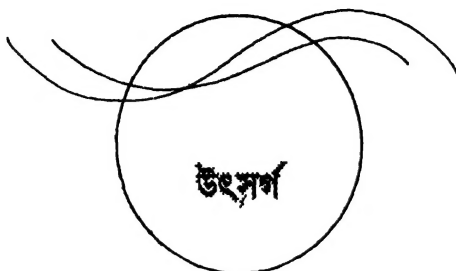
= মা =

কোব্‌রাতুন্‌ নেসা কোব্‌রা

মহীয়সী মহিলা

এবং সকল মা-কে

বিদায় নিয়েছো মা-গো যে কথাটি বলি—
'ল-লাখ ফকিরের দোয়া হোক বাবা বলি'।
তোমার দোয়াতে মা-গো সকাল ও সাঁঝে
জীবনের শুভ আর সকল কাজে
জীবনের উচ্চ শিরে সকল শাখায়
প্রাণের পাতায় আর্‌ প্রীতির লতায়
জীবন ভরিবে উঠে ফলে ও ফুলে;
দোয়া করো মা-জীবন দু-হাত তু'লে।

বলেন—মহম্মদ নবী রসুল্‌ মোদের—
'মায়ের পায়ের তলে জান্নাত্‌ তোদের'।
শিশুর জীবন শীর্ষে সে কার্‌ আসন—
নিদ্রাহীন জননীর রজনী যাপন।
তোমার স্বরূপ শোভা সাগরের মাঝ—
স্নেহের সাগরে মা-গো পদ্ম-বিরাজ।
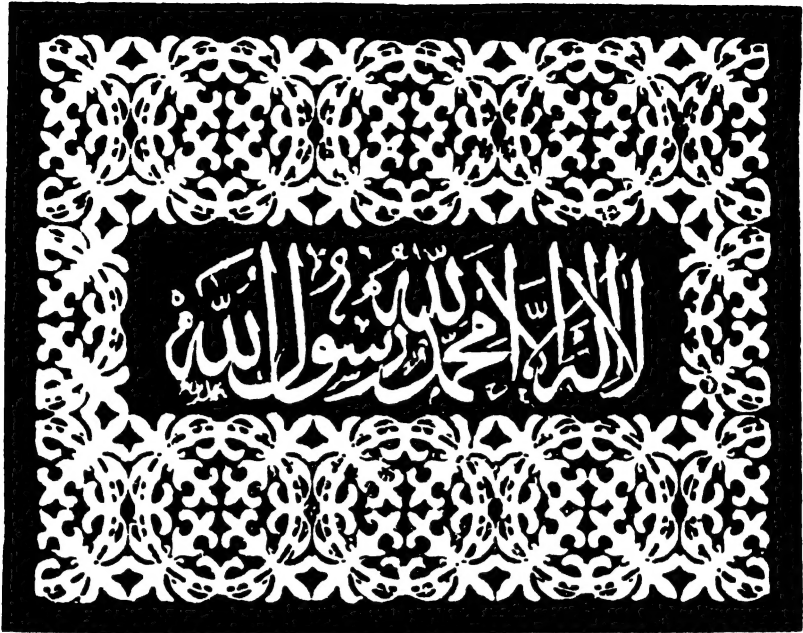
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্
আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত দূত।

ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ 'মহানবী' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী ও দেশজোড়া পাঠক-পাঠিকাগণের আশাতীত আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়েছি, উৎসাহ বোধ করেছি। বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি পত্রও দিয়েছেন—'ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস' শেষ করার জন্য। তাঁদের অকৃত্রিম অনুরোধে আমি অনুপ্রাণিত ও কৃতজ্ঞ। 'মহানবী' গ্রন্থটি সমাজে এত সত্বর এরূপ মর্মস্পর্শী সাড়া জাগাবে আমি ধারণাও করতে পারিনি। যে কোন লেখকের জীবনে এটা খুবই আনন্দের কথা।

'মহানবী'র পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করার ইচ্ছা রেখেছি। বহু বিদগ্ধজন হতে সাধারণ মানুষও 'মহানবী' (দঃ)-কে 'মানুষ' হিসাবে দেখার যথার্থ মূল্য দিয়েছেন, যার জন্য খুবই আনন্দ পেলাম। বাংলাদেশ হতেও বহু বিদ্যানুরাগী আমাকে অনুরূপ পত্র দিয়ে ধন্য করেছেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট 'মহানবী' গ্রন্থটি প্রভূত সমাদর লাভ করায় সকলকে আবার বিনম্র চিত্তে ধন্যবাদ জানাই।

কোরআন ১৮:১০৯, ১১০, ৪১:৬।

আজ সকলের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতা মাথায় নিয়ে ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড—'খোলাফায়ে রাশেদীন' (সৎপথে পরিচালিত ন্যায়পরায়ণ চার খলিফাগণ) প্রকাশিত হল। আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবনের অনুভূতি, বহু জনের আগ্রহ ও অনুরোধ আমাকে এই কাজে শক্তি জুগিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে নিবিড় সাধনায়।

মহানবী রচনাকালে যে কোরআনভিত্তিক নীতি অনুসরণ করেছিলাম, এখানেও সেই একই নীতির প্রয়োগ করেছি। কেননা, এখানে যাঁদের কথা আলোচনা করেছি তাঁরা ছিলেন মহানবী (দঃ)-এর একান্ত অকৃত্রিম অনুসারী, সুতরাং ঐ একই নীতির প্রয়োগ স্বাভাবিক।

মুসলিম খেলাফত ও সাম্যবাদ

মহান গুরুভার ও বিশাল গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েও সংসার-জীবনে, সমাজ-জীবনে ও প্রশাসনে মানুষ কি করে আপন গুণে মহান হতে পারে, মহিমান্বিত হতে পারে, খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনধারা তারই আলেখ্য। তাঁরা আপন কর্মগুণে আলোক-সামান্য প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন মানব সমাজে। সুতরাং এখানেও অহেতুক অলৌকিকতার মোহ বা দুর্বলতা পরিহার

করার চেষ্টা করেছি। কেননা, সাবধান বাণী এইটুকু—সত্য ও সুন্দরের পথে তাঁদের কঠিন-অর্জিত মনুষ্যত্বের দীপশিখা যেন কোন অনিশ্চিত অলৌকিকতার ঝড়-ঝাপটায় নিভন্ত হয়ে না ওঠে। সবার সম্মুখে তাঁরা দেহগতভাবে ছিলেন সাধারণ মানুষ, অন্তরে ছিলেন আদর্শ মানব।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সবসময় নিজেকে অতি সাধারণ মানুষ বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন এবং ঠিক ঐ ভাবেই দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরাও করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন—"আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ"। পরবর্তীকালে তাঁর চারজন অকৃত্রিম অনুসারী খলিফাও ঠিক ঐ ভাবেই নিজেদের সমাজে তুলে ধরেছিলেন। খলিফাগণের জীবন ছিল এমনই সরল ও সহজ, কোথাও কোন দুর্বলতা ও জটিলতা নেই, অভিনয় নেই; অভিমান নেই, আড়ম্বর নেই, অহমিকা নেই, অসাম্যের চিহ্ন নেই। তাঁরা শুধুমাত্র সাম্যের প্রবক্তা ছিলেন না, বাগ্মী ছিলেন না, তাঁরা বিশাল জনসমাবেশে সাম্যের সুন্দর ভাষণ দিয়ে অসাম্যের বিরাট অট্টালিকায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বৈধ-অবৈধ সম্ভোগের চরম প্রাচুর্যে দিন ও রাত্রি কাটিয়ে নিজেদেরকে নিজেই প্রবঞ্চনা করতেন না। ১৮:১১০।

তাঁরা ছিলেন সত্য, শান্তি ও সাম্যের আচার্য। তাই তাঁদের বলা হয়—খোলাফায়ে রাশেদীন, অর্থাৎ সৎপথে পরিচালিত খলিফাগণ। আরবী খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। মহানবী (দঃ) ছিলেন এক আল্লাহর প্রতিনিধি। চার খলিফা ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি ৬৩২-৬৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

মহানবী (দঃ) রাতের পর রাত, নিবিড় ধ্যানে, একান্ত আরাধনায় আত্মিক সাধনায় আল্লাহর নিকট হতে শক্তি সঞ্চয় করতেন এবং দিবালোকে মানুষের কল্যাণে ঐ শক্তির সদ্ব্যবহার করতেন। 'খোলাফায়ে রাশেদীন'ও [illegible] ঠিক তাঁর পূর্ণ অনুসারী। তাঁরাও বলতেন—'রাত্রিতে যে শক্তি সঞ্চয় করি, দিবালোকে তা খরচ করি।' তাঁরা আরো বলতেন, মনের জন্য যেমন প্রার্থনা আছে, দেহের জন্যও তেমনি প্রার্থনা আছে। মনের প্রার্থনা ধর্মযোগে, অর্থাৎ মন ভাল থাকে ধর্মযোগে, দেহের প্রার্থনা কর্মযোগে, অর্থাৎ দেহ ভাল থাকে কর্মযোগে। এইভাবে তাঁরা একদিকে ছিলেন ধর্মযোগী, আবার অন্যদিকে ছিলেন কর্মযোগী। তাই তাঁদের জীবনধারা ছিল আদর্শের ধারা, অনুশীলনের ধারা, মানুষ গঠনের ধারা, সমাজ গঠনের ধারা। তাঁদের ধারা শুধু জড়বাদের (Materialistic world) মতো দেহ ও ইহলোকের ধারা নয়। তাঁদের জীবনধারা দেহ ও মনের সমন্বিত ধারা, ইহলোক ও পরলোকের সম্মিলিত ধারা, এককথায় অখণ্ড জীবনের ধারা।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারায় বিধৃত হয়েছিল সমগ্র বিশ্বে একটি মাত্র জাতি, যার নাম মানবজাতি। একটি মাত্র সমাজ, যার নাম মানবসমাজ। তিনি চেয়েছিলেন একটি মাত্র সরকার, যার নাম বিশ্ব-সরকার বা মানব সরকার। (বর্তমানেব U.N.O. জাতিসংঘ তার

কিছুটা মাত্র।) একটিমাত্র শাসন, যার নাম বিশ্ব-শাসন বা মানব-শাসন; একটি মাত্র সভ্যতা, যার নাম বিশ্ব-সভ্যতা বা মানব-সভ্যতা; একটি মাত্র পরিবার, যার নাম বিশ্ব-পরিবার বা মানব-পরিবার। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে—"সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর পরিবার, যে ব্যক্তি এই পরিবারের নিকট ভাল লোক, সেই আল্লাহর নিকট ভাল লোক। যে তার প্রতিবেশীর চোখে ভাল লোক, সেই আল্লাহর নিকট ভাল লোক।" সুতরাং ভাল লোকের সংজ্ঞা তিনি কোন দেশ-পাত্র বংশ-গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে যাননি।

আজ ১৪০০ বছর পর সমগ্র বিশ্ব যেন একটি হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে। অতএব সমগ্র বিশ্ব-মানব আজ ঐরূপ একটি একান্নবর্তী পরিবারভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা নিতে না পারলে, একদিন বিশ্ব-সমাজ একে অপরের অব্যর্থ আঘাতে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসকে প্রতিরোধ করার জন্যই আজ হতে ১৪০০ বছর পূর্বে বিশ্বনবী এরূপ একটা চিন্তা নিয়েছিলেন—বিশ্ব-মানব, বিশ্ব-সরকার। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল—বিশ্ব সৃষ্টি, বিশ্ব-সমাজ। তাঁর বিচার্য বিষয় ছিল মানবাধিকার, মানব-সমাজ। তাঁর এক হাতে ছিল বিশ্বপিতার বন্দনা, অন্য হাতে ছিল সেই এক বিশ্ব-পিতার সকল সন্তানে এক ও অভিন্ন জানা এবং সকল মানুষের মানবাধিকারকে স্বীকার করা ও সম্মান দেওয়া।

খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস—সেই এক মাতা ও এক পিতার ইতিহাস, সেই এক ও অভিন্ন সন্তানের ইতিহাস, মানবাধিকারের ইতিহাস, সবল ও দুর্বল, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, পুরুষ ও রমণী সকলকে নিয়ে সাম্যভিত্তিক উন্নয়নশীল অখণ্ড মনুষ্য-সমাজের ইতিহাস।

ইসলাম ধর্ম মূলত তাই শান্তি ও সাম্যভিত্তিক, প্রতিবেশী, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সহ পরিবারভিত্তিক, উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানভিত্তিক, দেশ পরিচালনার জন্য রাজনীতি ও গণতন্ত্রভিত্তিক, সংসার ও সমাজভিত্তিক, সংস্কার ও সভ্যতাভিত্তিক এবং বিপ্লব ও বিবর্তনভিত্তিক। ইসলামের মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন ও পবিত্র হাদিস এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণপঞ্জী। শুধু গ্রন্থ মধ্যে কাগজে-কলমেই এই সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবন হতে তাঁর অকৃত্রিম খলিফাগণ 'খোলাফায়ে রাশেদীনের' জীবনধারা এর প্রমাণের কোন অপেক্ষাই রাখে না। ধর্মে, শাস্ত্রে, শাসনে, প্রশাসনে, ইতিহাসে, দর্শনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে এবং মানুষের দৈনন্দিন সমাজ-জীবনে দূর অতীত হতে সুদূর ভবিষ্যতের অখণ্ড মানুষের এবং মানুষের অখণ্ড জীবনের জন্য 'খোলাফায়ে রাশেদীন' সর্বজনগ্রাহ্য একটি আদর্শ জীবন-ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ যেন সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য কতিপয় মহাজীবনের প্রবল প্রয়াসের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ইতিহাস, দৃষ্টান্তের ইতিহাস, উপমার ইতিহাস, অনুশীলনের ইতিহাস, প্রতিজ্ঞার ইতিহাস, প্রজ্ঞার ইতিহাস, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস, আদর্শের ইতিহাস ও মানবাধিকারে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের ইতিহাস।

মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) নিরঙ্কুশ সাম্যের ভিত্তিতে জগৎ-শান্তির যে সমাজব্যবস্থা, যে বিধিবিধান দান করেছিলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন সেই পথে পরিচালিত হলেন। মহানবী (দঃ)-এর পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দেওয়া পথ ও পন্থা কিছু কিছু সমাজবিরোধীদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল, তখন ইসলাম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) (৬৩২-৩৪ খ্রীঃ) তরীর হাল ধরলেন। খুবই শক্ত হাতে, খুবই দক্ষতার সাথে বিপদাপন্ন উত্তাল তরঙ্গ হতে ইসলামের তরীকে তীরে আনতে সক্ষম হলেন। তাই তাঁকে Saviour of Islam বা ইসলামের ত্রাণকারী বলা হয়।

এরপর হাল ধরলেন আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ)। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা রূপে শাসনে সমাজ জীবনে, সাম্রাজ্য বিস্তারে এবং গঠনে ও বিচারাসনে যে অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় কৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ ও কালজয়ী প্রতিভার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন, তা জগতের ইতিহাসে আজও দুর্লভ। তাই তাঁকে Real Builder of Islamic State বা ইসলামি রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

অতঃপর এলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) (৬৪৪-৫৬ খ্রীঃ)। হযরত ওসমান (রাঃ) চিরদিনই ছিলেন অতীব দয়ালু, দাতা, মহানুভব। তিনি নিজে ধনী ব্যক্তি ছিলেন, পববর্তীকালে ইসলামের সেবায় সমস্ত ধন বিতরণ করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। ইসলামের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে জগতের বুকে অক্ষয় ও নিখুঁত রাখার জন্য তাঁর অবদান অসামান্য। অন্যান্য সকল কাজের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন একত্রীকরণে তিনি যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তা চিরস্মরণীয় বস্তু। তাই তাঁকে জা'মেয়ুল কোরআন বা কোরআন একত্রকারী বলা হয়।

এরপর এলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ বা শের-ই-খোদা হযরত আলী হায়দার (কঃ) (৬৫৬-৬১ খ্রীঃ)। পৃথিবীর বীরের ইতিহাসে বহু বীর এসেছেন ও গেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানব সমাজ দ্বিতীয় আলীর (কঃ) জন্ম দিতে পারেনি। তিনি শারীরিক শক্তির দিক থেকে ছিলেন মহাবীর, আবার মানুষের দিক থেকেও ছিলেন মহামানব, পৌরুষের দিক থেকে ছিলেন মহাপুরুষ, মনের দিক থেকে ছিলেন মহানুভব। দেহের বীরত্ব ও মনের মহত্ত্ব একযোগে তাঁকে এতদূর ঊর্ধ্ব-জগতে নিয়ে গিয়েছিল, স্বয়ং মহানবী (সাঃ) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ ও 'জ্ঞানের দরজা' বলে ভূষিত করেন। সত্যিই তিনি ছিলেন মানব সমাজের নজিরবিহীন সিংহ-পুরুষ। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন পবিত্র খোলাফায়ে

রাশেদীনের অক্ষত সময়কাল, মানবতার পরিপূর্ণ জীবনদীপ, সাম্যের পূর্ণ প্রতীক, শান্তির নিরঙ্কুশ বাহন চির ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠল। মানব সমাজ হারাল তার সাম্যের যুগ, স্বর্ণ যুগ, আদর্শ সাম্যবাদ। ইসলামের প্রকৃত খেলাফত যুগ এখানেই সমাপ্ত হল। পরবর্তী অধ্যায় খলিফা বনাম রাজা-বাদশার যুগ। মানবকালের মধ্য-গগনে মানবতার পূর্ণচন্দ্র যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সততা ও ধর্মপরায়ণতা, হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিচার ও প্রশাসনিক প্রতিভা ও যোগ্যতা, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জনহিতকর কার্য ও মহানুভবতা, হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্ব ও মহত্ত্বকে মানব সমাজে মানুষের স্মৃতিতে ম্লান করতে পারে মহাকাল আজও সে শক্তি অর্জন করেনি। খলিফাগণ এই যে অলোকসাধারণ শক্তি অর্জন করেছিলেন, এর মূলে ছিল তাঁদের অদম্য চরিত্রবল। তাই তাঁদের ইতিহাস একদিকে রাজা-বাদশার ইতিহাস, অন্যদিকে ফকিরের ইতিহাস; একদিকে মানুষের ইতিহাস, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের ইতিহাস, মানবতার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহাস, সমৃদ্ধির ইতিহাস। সবের উর্ধ্বে সত্য ও সুন্দরের পথে ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁদের ইতিহাস সাম্যের ইতিহাস, শান্তির ইতিহাস। এককথায় তাঁদের ইতিহাস রাষ্ট্রের ও সমাজের দরিদ্রতম মানুষের কথা স্মরণ করে সাম্যবাদের চূড়ান্ত রূপকারের অকৃত্রিমভাবে অনুস্মরণের ইতিহাস।

সাম্যবাদের চূড়ান্ত রূপকার

অতীতের ইতিহাস হতে, বর্তমানের অভিজ্ঞতা হতে, জ্ঞান-বিজ্ঞান হতে, ধর্মগ্রন্থ হতে ও নানা দিক হতে ভবিষ্যতের পথে একটি কথা বিশ্ব-মানবসমাজ বারবার জানতে পেরেছে—যখনই যে কোন সমাজ বা দেশ তার সাম্যের ভারসাম্য হারিয়ে, মনুষ্যত্বকে হারিয়ে পশুত্বের পরিচয় দিয়েছে, তখনই বিধাতা পুরুষ পরম করুণাবশত এক-একটি ক্ষণজন্মা পুরুষকে পাঠিয়েছেন তাঁর দূতরূপে, সাম্যকে ফিরিয়ে এনে শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর দূতগণের সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ দূত ছিলেন হযরত মহম্মদ (দঃ) (৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ)। কোরআন—৩:১৪৪, ৪:৭৯, ৩৩:২১, ৪১:৬, ৪৮:২৯, ৬১:৬।

ইসলাম জগতের মহান কাণ্ডারী মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন অখণ্ড মানবসমাজের দরিদ্র মানুষ ও অভাগা রমণীকুলের ত্রাণকারী ও দরদী বন্ধু; এবং দুর্গত মানবতার উদ্ধারকারী মহান দূত, মরুর কল্যাণে মরুদুলাল, দুর্লভ মানব জন্মে ও মানুষের চিন্তায় মহামানব, শান্তি-সাম্যে মহাসেনা, সমাজ সংস্কারের দুর্জয় সাধনায় সিদ্ধ সাধক, ক্ষমার দরবারে দয়ার সাগর, প্রেম ও ভালবাসায় পরমপুরুষ। কোরআন—৩:১৫৯, ৪:৭৯, ১৬৫, ১২৮, ১৫:১০, ১৬:৪, ২১:১০৭।

তুলিতে মানব জাতি মনুষ্য সম্মানে
এক সুরে ডাক দিলে মানব সন্তানে।
দুই হাত তুলে ধরে দিলে আমন্ত্রণ
শাশ্বত জীবনের স্বাদ বিতরণ।

* * *

জীবন হয়েছে যবে ওষ্ঠাগত
বাধার কণ্টকেতে ক্ষতবিক্ষত
তখনো নিবিড় প্রাণে অবিরাম ধ্যান
দাও প্রভু অবোধেরে বোধশক্তি জ্ঞান। —মহানবী

তবে বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক মহানবী (দঃ)-এর চিন্তাধারাকে তদানীন্তন বিশ্ব-সমাজের যে দুটো জিনিস সর্বাপেক্ষা বেশি অলোড়িত করেছিল, এবং যে দুটো দিকে তাঁর দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি নিবদ্ধ হয়েছিল, ঐ দুটো জিনিস সমাজের দরিদ্র মানুষ ও অবহেলিত নারী সমাজ। কোরআন—২ : ১৮৭, ৩ : ১২৯, ৪ : ৩৪।

পুরুষ-রমণী সমাজপাখি মহানবীর হুঁশিয়ার
একটি ডানায় নাহি থাকে বল আকাশেতে উড়িবার।
যুবক-যুবতী ভেদাভেদ নাই, উন্নত পরিবার
উভয়েরই শ্রম সাধনার দ্বারা গড়িবে এ সংসার।
এক যদি গরীয়ান তবে অন্য সে গরীয়সী
এক যদি মহীয়ান তবে অন্য সে মহীয়সী। —মহানবী

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহান ব্রতের মূল লক্ষ্য ছিল—সকল মানুষের মাঝে বিশ্ব স্রষ্টার বন্দনা, এবং সেই এক বিশ্ব স্রষ্টার অধীনে সকল মানুষের মাঝে জাতিগত-বর্ণগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত, অর্থনৈতিক দুরবস্থায় মানুষ রচিত কৃত্রিম ব্যবধানগুলোর মূলোচ্ছেদ করে সাম্যের ভিত্তিতে বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা। মানবতার এই বাস্তবায়নের জন্যই কখনও উড়িয়েছিলেন ধর্মের পতাকা, কখনও বা উড়িয়েছিলেন কর্মের নিশান, কখনও বা রেখেছিলেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রাণের সুদৃঢ় পদক্ষেপ, কখনও বা ঘোষণা করেছিলেন 'জেহাদ'—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কোরআন—৮৭ : ১৪, ৯১ : ৯, ১০, ৯৩ : ১০।

জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ
সাম্য ভ্রাতৃত্ব পরে সমাজ গঠন।
যার লাগি নির্যাতন যত নিপীড়ন
অন্যায় অবিচার করিতে দমন।
দেখিবারে দেখেছিলে জগৎ স্বপন
সাম্য ভ্রাতৃত্ব পরে সমাজ গঠন।

—মহানবী

মহানবী ঘোষণা করেছিলেন—এই জগতে যা কিছু আছে তার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ্, এবং তাঁর সৃষ্ট-জগতে ও সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। তিনি কোন রাজতন্ত্র মেনে নেননি। কোন রাজা মানেননি। কোন জমিদার ও জোতদারকেও স্বীকার করেননি। কোন অতিরিক্ত সঞ্চয়কারীকেও বরদাস্ত করেননি। এ বিশ্বে মদিনার বুকে নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন গণতন্ত্রমুখী সমাজব্যবস্থা। যা ছিল একান্ত সাম্যভিত্তিক।

এ ধরার মালিকানা জগৎপিতার
সকল সম্পদ হতে সবকিছু তার।
শিখায়েছ মানুষেরে স্রষ্টা সবাকার
সৃষ্টিকুলে সকলের সম অধিকার।
এ জগতে আছে যদি রাজ-সিংহাসন
সর্বহারা মানুষের হৃদয় আসন।
বলে নাই জোরে নাই জাতির জনক
মানুষই করিবে ঠিক মানব সেবক।
শিখাইলে মানুষের মান—মানবতার
অবাধে করিতে পার রুজি-রোজগার
অফুরন্ত সঞ্চয়ের নাহি অধিকার।
জগতের গণতন্ত্র সাম্য অধিকার।
মানুষ খলিফা শুধু খাদেম খোদার
এ কথা জানে না যেই নহে জনতার।
মহানবীর গণতন্ত্র সভ্যসমাজ
শিখায়েছে মানবেরে গড়িতে সমাজ।

অক্ষত সাম্যবাদের ক্ষতবিক্ষত রূপ

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত মহানবী (দঃ)-এর বিশ্ব সমস্যার সমাধানকারী ও মানবতার উদ্ধারকারী, চিন্তা ও কর্মধারার প্রয়োগ প্রণালীকে উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে চলেছিলেন তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন (ন্যায়পরায়ণ খলিফাগণ) ও সাহাবায়ে কেরামগণ অর্থাৎ মহান সঙ্গীগণ।

এই খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল মানব সমাজে প্রথম নিরঙ্কুশ সাম্যবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি চূড়ান্ত ফল। কি করে এই সংসারের একটি মানুষ সামান্য সংসার জীবন হতে অসামান্য বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেও সাম্যের ভিত্তিতে সহজেই প্রমাণ করতে পারেন—একদিকে তিনি ফকির, অন্যদিকে তিনি সম্রাট; আবার শক্তির দিক থেকে একদিকে তিনি পার্থিব জীবনের

শক্তিধর পুরুষ ও সম্রাট, অন্যদিকে আত্মিক দিক থেকে স্বয়ং স্রষ্টার অমিত শক্তির অসীম আধার। এইখানেই, এই তাৎপর্যেই তাঁরা স্রষ্টার দূতের প্রতিনিধি, প্রতিনিধিত্বও তাঁদের সার্থক হয়েছে। তাঁদের যে জীবন, তা জাগতিক ও ঐশ্বরিক দ্বিশক্তিকে দু'হাতে ধারণ করে মানব সমাজে সাম্যের সেনারূপে মানবতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনকাল সময়কাল জগতেরও (স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ) সংসারের এই পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল, সত্য পরীক্ষায় উন্নীত। সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনে-প্রশাসনে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সাম্য সত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোন গালভরা সংবিধানে নয়, কোন কনফারেন্স বা সেমিনারে নয়, কোন ঐতিহাসিক মঞ্চের আসনে নয়, ভাষণে নয়, তাঁদের কর্মময় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সাম্য পেয়েছে প্রাণ সমাজ-জীবনে।

তাঁদের পবিত্র জীবন ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব ইতিহাসে, রাজ-ইতিহাসে এই অপূর্ব সমন্বয়ের সাম্যের অধ্যায়টি অলিখিত থেকে যেত। সংসারের কঠিন ধারা ও স্বর্গের সুধা কেমন করে একটি মানুষের জীবনে একই সঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে, কি করে একটি সম্রাট ফকিরের জীবনযাপন করতে পারেন, সাম্যের প্রতীক খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন-প্রণালী, খেলাফতকাল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, নজিরবিহীন উপমা। এই দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন মরণোত্তর অখণ্ড জীবনের ও সাম্যবাদী মানব-সমাজের এবং সভ্যতার, শাসনের-প্রশাসনের মহান রূপকার।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) (৬৩২-৩৪) (ইসলামের ত্রাণকারী) অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই মহানবী (দঃ)-এর মহান চিন্তাধারাকে সমাজ-জীবনে রূপ দিলেন। দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ) (ইসলামি রাজ্য ও শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা) ঐ চিন্তাধারাকে সযত্নে লালন করে বিশ্ব-সমাজ জীবনের সারবান বৃক্ষরূপে পরিণত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রমাণ করেছিলেন সাম্যের ভিত্তিতে ধনী-দরিদ্র, মুসলমান-অমুসলমান যেন একটি একান্নবর্তী পরিবার। (মহানবী (দঃ) বলেছিলেন—"সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর পরিবার। যে এই পরিবারের নিকট ভাল মানুষ, সেই আল্লাহর নিকট ভাল মানুষ।") হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রশাসনে ও দক্ষ হাতে মহানবী (দঃ)-এর এই পরিবারভিত্তিক চিন্তার বলিষ্ঠ রূপায়ণ দেখতে পাই। চতুর্থ খলিফা হযরত আলীও ছিলেন এই পথেরই অনুসারী।

কোন অনিবার্য কারণবশত তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) (৬৪৪-৫৬) (কোরআন একত্রকারী)-এর সময় ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তনের ফলে সমাজে কিছু কিছু ধনী, জমিদার ও জোতদারের আবির্ভাব হলে মহানবী (দঃ)-এর কয়েকজন বিশেষ সাহাবী সাম্যের জন্য সিংহবিক্রমে গর্জিয়ে ওঠেন।

মহানবী (দঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্যের গায়ে সামান্যতম আঘাতকে তাঁরা যেন আপন শরীরের অসামান্যতম আঘাত বলে অনুভব করেছিলেন। এই সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) ছিলেন অন্যতম।

তখন (৬৪৪-৫৬ খ্রীঃ) সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া। সিরিয়াতে হযরত আবুজর গিফারীর (রাঃ) অসন্তোষের বহ্নি যখন বিরাট আকার ধারণ করল, তখন স্বয়ং গভর্নর প্রমাদ গুণলেন। তিনি কালবিলম্ব না করেই হযরত গিফারীকে সুকৌশলে মদিনায় খলিফার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। খলিফা বহু চেষ্টা করেও হযরত গিফারী (রাঃ)-কে বোঝাতে সক্ষম হননি। হযরত গিফারী (রাঃ) মহানবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের জন্য জনগণকে ডাক দিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর শরীর তাঁকে আর বেশিদিন সময় দেয়নি। কিন্তু তাঁর আন্দোলন ও আহ্বান সকলের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বিশ্ব-সমাজবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিল।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ, ভাষ্য, টীকা ও ব্যাখ্যা বেরিয়েছে, জার্মান ভাষা তাদের অন্যতম। এই পথে জার্মান পণ্ডিতগণ, রাজনীতিবিদগণ পবিত্র কোরআন ও ইসলামের ইতিহাস হতেই সর্বপ্রথম কমিউনিজমের সন্ধান পান। (কোরআন-সূরা*মাউন ১০৭:১-৭।) এবং আবুজর গিফারী (রাঃ)-কে বিশ্বের সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট—সাম্যবাদী) বলে আখ্যায়িত করেন। জার্মানবাসীদের মনে মুসলিম ভাব ও চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষার ফলে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী অধ্যয়ন শুরু হয়। পবিত্র কোরআন হতে আরবের ইতিহাস ও সংস্কৃতি জার্মান ভাষায় অনূদিত হল। পরবর্তীকালে (KARL MARX) কার্ল মার্কস ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফ্রেডারিক এঞ্জেলস মুসলিম ইতিহাসকে সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার ও উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন, এবং জার্মান পণ্ডিতগণও এই মুসলিম সংস্কৃতির সাথে পরিচিতির ফলে সারা বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

সুতরাং আজ যদি মহানবীর প্রিয় উম্মত বিশ্ব মুসলমানকে ও ঋষি মহর্ষীগণের বংশধর ভারতবাসীকে বা যে কোন ধর্মের যে কোন আস্তিককে কোন নাস্তিকের নিকট সাম্যের সেবক ও শান্তির শিক্ষার জন্য দ্বারস্থ হতে হয়, তাহলে বিশ্ব মুসলমানের জন্য ও বিশ্ব-আস্তিকের জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে!

---

*সূরা মাউন: (১) তুমি কি তাকে দেখেছ—যে ধর্মকে অস্বীকার করে? (২) ফলত সে ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, (৩) যে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। (৪) সুতরাং ঐ সকল নামাজ আদায়কারীদের জন্য পরিতাপ, (৫) যারা স্বীয় নামাজে (অর্থাৎ নামাজের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে) অমনোযোগী। (৬) যারা শুধু (যেন লোকচক্ষে লোক) দেখানোর জন্য (উপাসনা) করে। (৭) এবং (গৃহস্থালীর) প্রয়োজনীয় ছোটখাটো দ্রব্যাদি দ্বারা (গরিবকে) সাহায্য করতে বিরত থাকে। কোরআন ২:২৬১-৬৪, ৩:৯২, ১০৭:১-৭, ৯৩:১০।

পরবর্তীকালে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ইসলামের সেই অনাবিল শান্তি ও সাম্যকে ফিরিয়ে আনতে। ইসলামের প্রথম দুই খলিফা মূলত যুদ্ধ করেছিলেন অমুসলমানদের সাথে। তখন মুসলমানদের মধ্যে কোনপ্রকার মতভেদের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু হযরত আলীর জন্য চরম দুর্ভাগ্য, তাকে তাঁর আপন জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধেই তরবারি ধরতে হল। তিনি যখন খেলাফতে বসলেন, তার পূর্বেই ইসলাম জগতে বা রাষ্ট্রে দুষ্টু কায়েমী স্বার্থ বসে পড়েছে। তখন অনেকেই বড় বড় জমিদার ও জোতদার বা ধনকুবের। হযরত আলী (রাঃ) কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেননি। বরং যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে। যখন আঁতে ঘা লেগেছিল কপট মারওয়ান ও কুচক্রী মুয়াবিয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণের, তখন তাঁরা হযরত আলীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁরা সকলেই জানতেন হযরত আলী (রাঃ) মহানবীর (সাঃ) চিরছায়া স্বরূপ ছিলেন। চরিত্রে ব্যক্তিত্বে ছিলেন তুলনাহীন মানুষ। তবুও তাঁরা তাঁকে সহ্য করতে পারলেন না শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্য। অন্যদিকে মহাবীর মহানুভব আলী (রাঃ) তাঁদেরও সহ্য করতে পারলেন না শুধুমাত্র ইসলামের শান্তি ও সাম্যের জন্য। এই যুদ্ধে হজরত আলীর পরাজয়ের প্রধানতম কারণ কোথাও তিনি অসৎ, হীন ও নীচ হতে পারেননি। যে কোন পরিবেশে, যে কোন পরিস্থিতিতে হীনতা ও নীচতা কোনদিনই মহানুভব আলীর (রাঃ)-এর একটি স্নায়ুবিহীন লোমকেও স্পর্শ করতে পারেনি। পরিশেষে তাঁর শাহাদাত বরণের সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খলিফাগণ কর্তৃক লালিত-পালিত ইসলামের প্রকৃত সাম্যবাদ সমাধিস্থ হল, এবং কপট কুচক্রী আমির মুয়াবিয়ার হাতে ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম জগতে কুখ্যাত রাজতন্ত্র জন্ম নিল।

—ওসমান গনী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

ইসলামের চারজন খলিফার সংক্ষিপ্ত জীবনী ছিল। বহুজনের অনুরোধে, প্রয়োজনের তাগিদে আজ পৃথক পৃথকভাবে ঐ চার মহান খলিফাকে একটু সবিস্তারে আলোচনা করা হল।

যাঁদের অগাধ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় একদিন কলম ধরেছিলাম—পিতা মওলবী মোহঃ ইউনুস্, পিতৃব্য মওলানা মোহঃ ইলিয়াস, অগ্রজ মোহঃ সোলেমান। শ্রদ্ধাভাজন মনীষী অধ্যাপক হুমায়ূন কবির, মাস্টার মশাই—আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য সুকুমার সেন প্রমুখ পরিবার-পরিজন ও বিশ্ববিশ্রুত মনীষীগণ। আজ তাঁরা কেউ-ই নেই। বড়ই দুঃখ-বেদনা ও অনুতাপের সাথে তাঁদের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করছি।

বাকি যারা সহায়করূপে সদাই পাশে ছিল—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-ভাইপো, বন্ধু-বান্ধব-ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই মাপের কাজ হাতে নেওয়াই সম্ভব হতো কি না জানি না, যদি আল-হাজ্ব আবুল কালাম মল্লিকের মতো একজন নিষ্ঠাবান-রুচিবান মানুষকে প্রকাশক রূপে না পেতাম। যাঁরা কাজে নামিয়েছিলেন, তাঁরা কেউই নেই। যাঁর হাতে কাজ আরম্ভ করেছিলাম, তিনিই শুধু মাত্র একা আমার চোখের সামনে। আল্লাহ্ তাঁকে হায়াৎ দিন আরো বহুদিন সুস্থ শরীরে। আজ এই কামনা করি। প্রকাশনার সকলকেই জানাই সাধুবাদ।

ভুল মানুষের চিরসঙ্গী, ভ্রান্তি মানুষের চিরসাথী। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে গেল। আল্লাহ্ যদি সুযোগ দেন, পরে শোধরাবো। দূর অতীতের ঐ সব জ্ঞানী-গুণী মানুষদের কথা বারবার মনে স্মৃতির পটে ভেসে ওঠায় বড়ই বিষণ্নচিত্তে, বিষাদক্লিষ্ট মনে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলকে জানাই অন্তরের ধন্যবাদ, সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা ও শোকরিয়া।

তোমার সৃজিত জীব গুণ ছাড়া কই
দেখি না মানব-সৃষ্টি দোষ ছাড়া বই।
সমস্ত প্রশংসা তোমারই।—কোরআন ১ : ১।

—ওসমান গনী

ওমরের শাসন

মহামানব মহাজন খলিফা ওমর
কালের করালগ্রাসে আজিও অমর।
মরুচারী মরুবাসী হযরত ওমর
বিজয় করিল কেন বিশ্ব-অন্তর।
ন্যায় ও অন্যায় ছিলে প্রখর রবি
ফারুক উপাধি দিলেন দ্বীনের নবী।

অলংকৃত করেছিলে কোন সিংহাসন
জগৎ যতদিন আছে করিবে স্মরণ।
তুচ্ছভরে দেখেছিলে রাজ সিংহাসন
অলংকৃত করেছিলে ন্যায়ের আসন।
হে বিরাট হে মহান হযরত ওমর
জগৎ-শাসনে তুমি আজিও অমর।

এক হাতে ধরেছিলে আল্লার শাসন
অন্য হাতে প্রাণ পেল রাজ্য প্রশাসন।
নিমিষে কাড়িয়া নিয়ে লাটের আসন
গভর্ণরের হাতে দিলে রাখাল-পাচন।
লাটেরে বলিলে তুমি ন্যায়দণ্ড ধরো
উটের পালেতে যাও রাখালী করো।

যে-শিক্ষা দিয়েছিলে বিবি কুল্‌সুমেরে
জগৎ রাষ্ট্রপতি শিখুক অচিরে।
রোমান রাণীর তরে গেল উপহার
প্রতিদানে এলো যাহা বিপুল সম্ভার।
দেখিয়া কুলসুম বিবি আত্মহারা মন
স্বামীকে বলেন-মম উপঢৌকন।
নাহিক কিছুই মোর কিছুই জমানো।
এত সোনা দানা আমি দেখিনি কখনো।

বলেন ওমর ফারুক 'ওগো প্রিয়তমা——
রাখিলে ওসব কিছুর কিঞ্চিৎ জমা,
তব স্থান হবে জেনো মোর কারাগারে
পাঠাও এখনি সব রাজ-কোষাগারে'।
দেখিয়া তোমার নীতি তোমার পদ্ধতি
লজ্জায় আনত হোক শত-রাষ্ট্রপতি।
ধরণীতে এনেছিলে এমনি সুশাসন।
জগৎ করিবে স্মরণ তব প্রশাসন।
আপন পুত্রের বিয়ে দিলে কার সাথে'
জগৎ পুত্রের পিতা শিক্ষা নিক তাতে।
বধূরূপে যে বালিকা ঘরে এল আজ
দ্বারে দ্বারে দুগ্ধ বেচা ছিল তার কাজ।
ন্যায়ের প্রবাদ পুরুষ খলিফা ওমর
খলিফার বেয়াই হলো আস্‌লাম চাকর।

আর কিছু নয় ওমর! সৎশুধোজেনে
সততার মূল্য দিলে বধূরূপে এনে।
যে বালিকা হলো আজ চরম বিখ্যাত
দ্বিতীয় ওমর-মাতা তারই গর্ভজাত।
অলংকৃত করেছিলে ন্যায়ের আসন
মানুষ আজিও চায় ওমরের শাসন।

চিরদিন অর্ঘ্য দিবে এ বিশ্ব ভূমি
আজিও শাসনে ওমর প্রবাদ তুমি।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
বংশ-জন্ম

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলাম প্রথম বহির্জগতে

তৃতীয় অধ্যায়
রাজ্য-বিজয়ে বিজয়ী ওমর

চতুর্থ অধ্যায়
পারস্য বিজয় ও ইরানের পূর্বাংশ জয়

পঞ্চম অধ্যায়
ইরাকের পশ্চিমাংশ (পারস্য) জয়

ষষ্ট অধ্যায়
পারস্য ও ইরাকের বাকি পূর্বাংশ জয়

সপ্তম অধ্যায়
পরিশিষ্ট
হযরত ওমরের শাহাদত বরণ

অষ্টম অধ্যায়
হযরত ওমরের প্রশাসন ও সংবিধান
বিশ্ব-সংবিধান

ইসলামের রাজ্য জয়ের অন্তরালে কি ছিল (মহানবীর যুগ (৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ)—খলিফাদের যুগ (৬৩২-৬৬১ খ্রীঃ)—জয়ের উপসংহার—খলিফা ওমর বদ্ধপরিকর—তাড়িত ও বিতাড়িত সম্রাট—খলিফার সতর্ক বাণী—ভাগ্যহত শাহানশাহ। ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হযরত ওমর রাজ্যজয়—ইসলামিস্তান; রাজ্য সীমানা — পতনের অন্তরালে চরিত্রহীনতা — শেষের ঘণ্টা (কবিতা)—উত্থানের অন্তরালে জাতীয় চরিত্র—কোরআনের সতর্কবাণী—ওমরের ব্যক্তিত্ব—আরব গোত্রসমূহের মধ্যে জাতীয় চেতনা—বিশ্ববিজয়ী ওমরের বিজয় নীতি—বিশ্ববিজয়ে ওমরের বীরত্ব—ওমরের যুদ্ধ পরিচালনা—ওমরের রাজ্য সংগঠন—মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি: শুরা (সংসদ)—দ্বিতীয় পরামর্শ সভা—নিখুঁত ইসলামিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—হযরত ওমরের (রাঃ) প্রশাসন ব্যবস্থা—আল্লাহ্-তন্ত্র (Theocracy)—উপদেষ্টা পরিষদ: (মজলিস-উস-শুরা)—আরব জাতীয়তাবাদ—প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা: (বিভাগ)—শাসনকর্তা—দুর্নীতিমুক্ত শাসন-ব্যবস্থা—সচিবালয়—বেতন ব্যবস্থা—জেলা প্রশাসন—হযরত ওমরের রাজস্ব ব্যবস্থা: ইরান-ইরাক-মিশর, সিরিয়া, ফারস্, কিরমান ও আর্মেনিয়া—রাজস্বের পরিমাণ—রাজস্বের উৎস—জাতীয় অর্থ বণ্টন—হযরত ওমরের ভূমি-রাজস্বব্যবস্থা—প্রাচীন ব্যবস্থা—মহানবীর জামানা—হযরত ওমরের আমলে কৃষিজমি—খলিফার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও কৃষি নীতি: লাঙ্গল যার জমি তার—রাজস্ব ব্যবস্থার চিন্তানায়ক ওমর—ভাষা সমস্যার সমাধানে ভাষাবিদ ওমর—ইসলামি মুদ্রার প্রবর্তন—ইসলামি বা হিজরী সনের প্রবর্তনকারী ওমর—হযরত ওমরের সমর বিভাগ (কোরআন শরীফ)—যুদ্ধ—সূরা বাকার—সূরা নিসা—সূরা তওবা—সূরা হজ্ব—মূল উৎপত্তি—আরবে সেনাবাহিনী—প্রথম কোষাগার ও সমর দপ্তর সামরিক ঘাঁটি—সেনানিবাস—জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সেনা নিয়োগ প্রণালী—সৈনিকদের বেতন ও ব্রত: (মারলে গাজী, মরলে শহিদ)—অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক—সৈন্যবিন্যাস—সেনাবাহিনীর খাদ্যব্যবস্থা—সৈনিকগণের স্বাস্থ্য বিভাগ—ছুটি—সমর বিভাগের সর্বময় কর্তা ওমর—হযরত ওমরের চির বিভাগ (কোরআনে বিচার)—বিচারক ওমর—স্বাধীন বিচার বিভাগ—বিচারের মূলনীতি—বিচারক নিয়োগ—বিচার পদ্ধতি—পরামর্শদাতা—ফৌজদারী ও পুলিশ—জেলখানা দ্বীপান্তর—হযরত ওমরের শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞানচর্চা পদ্ধতি—জাতির মহান কাণ্ডারী মহানবী—খলিফার জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব—শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

বংশ-জন্ম

আজ পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর যত রাজনীতিবিদ জন্মগ্রহণ করেছেন, হযরত ওমর ফারুক তাঁদের গর্ব। এবং বিশ্বের বুকে যত ন্যায়বিচারক জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁদের গৌরব।

আরবের পবিত্র মক্কা নগরের বিখ্যাত কোরেশ বংশের আদিয়া গোত্রের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৫৮২ খ্রীস্টাব্দে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব এবং দাদার নাম ছিল নুফাইল ইবনে আল-ওজ্জা। যিনি কোরেশ বংশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। মাতার নাম খানতানাহ্, মাতামহ—হিসাম। হযরত ওমরের সপ্তম পূর্বপুরুষ ছিলেন আদ্, এবং আদের আপন ভাই মোররাহ। এবং এই মোররাহ মহানবী (দঃ) সপ্তম পুরুষ ছিলেন। (দ্রঃ মহানবী পৃঃ ৭৫, তৃয় সং)। দেখা যাচ্ছে মহানবী ও ওমর একই বংশোদ্ভুত মানুষ। যে বংশটি আরবের বিশ্ববিখ্যাত। হযরত ওমরের একটি ডাকনামও ছিল—আবু হাফস্। কাব উভয়েরই পূর্বপুরুষ।

জন্মসন: হযরত ওমরের জন্মসন নিয়ে বেশ কিছু মতভেদ আছে। Shorter Encyclopaedia of Islam-এর অভিমত, হিজরী সনের চার বছর পূর্বে ওমর ২৬ বছর বয়সে ইসলামধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। হিজরী সন আরম্ভ হয় ইং ৬২২ খ্রীস্টাব্দ হতে। এই ৬২২ খ্রীস্টাব্দের চার বছর পূর্বে তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। অর্থাৎ ৬১৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। সুতরাং তাঁর জন্ম সন ৬১৮-২৬=৫৯২ খ্রীস্টাব্দ। এইটা ইসলামি বিশ্বকোষের অভিমত।

কিন্তু আমরা হাদিস শরীফ হতে যে প্রমাণ পাই, সেই মতে হযরত ওমরের জন্মসন ৫৮২ খ্রীস্টাব্দ। হাদিস হতে জানা যায় মহানবী, ওমর অপেক্ষা তেরো বছরের বড় ছিলেন, অর্থাৎ মহানবীর জন্ম ৫৭০+১৩= ৫৮৩ ওমরের জন্মসন। আবার জানা যায়-মহানবীর নবুয়ত (ঐশী) লাভের সপ্তম বছরে ওমর তাঁর চৌত্রিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী নবুয়তপ্রাপ্ত হন ৬১০ খ্রীস্টাব্দে। এই নবুয়তের সপ্তম বছর হচ্ছে (৬১০ হতে ৬১৬ খ্রীস্টাব্দ) এই ৬১৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর। তাহলে ওমরের প্রকৃত জন্মসন হচ্ছে ৬১৬-৩৪=৫৮২ খ্রীস্টাব্দ। আমাদের মতে, ৫৮২ খ্রীস্টাব্দই হযরত ওমরের সঠিক জন্মসন। আমার মনে হয়, বিশ্বকোষ কোথাও গণনাতে একটি 'দশের' যোগ-বিয়োগ ভুল করেছে। হাদিস শরীফে

৬৮২-৮৩ হচ্ছে। চন্দ্রমাস অনুযায়ী সময় কিছুটা পেছিয়ে যায়। সেই মতে ৬৮২ সনই সঠিক জন্মসন।

দেহ-গঠন :

তখনকার দিনে আরবে একটি জনপ্রিয় প্রবাদ বাক্য জনসমাজে খুবই প্রচলিত ছিল—"কুল্লু তাবিলুন আহ্মাকুন্ ইল্লা ওমর"। সব লম্বা মানুষই বোকা একমাত্র ওমর ব্যতীত। এই প্রবাদ বাক্যটি হতে আমরা ওমর সম্পর্কে দুটো জিনিস জানতে পারলাম, একটি তিনি ছিলেন অতীব লম্বা মানুষ, এবং অন্যটি অত্যন্ত বুদ্ধিমানও ছিলেন। কৈশোরে ও যৌবনে তিনি ছিপছিপে ও দীর্ঘায়িত মানুষ ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল রক্তিমাভ গৌরবর্ণ, মাথা বড়, হাত প্রলম্বিত, বুক অত্যন্ত প্রশস্ত, চক্ষু দুটো ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। এককথায় পা হতে মাথা পর্যন্ত তিনি একটি অসাধারণ দেহের অধিকারী ছিলেন।

মহাজীবন : বাল্য, কৈশোর ও যৌবন :

সে যুগের জীবিকার্জনের প্রধান উপায় ছিল—ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিকার প্রভৃতি। এই কারণে তখনকার দিনে লেখাপড়া অপেক্ষা শরীরচর্চা, কুস্তিগিরি, অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনা প্রভৃতি শিক্ষা খুবই জনপ্রিয় ছিল। হযরত ওমর এই সমস্ত বিষয়ে খুবই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। আজকের দিনের মতো তখনকার দিনে ডিগ্রীভিত্তিক ও জীবিকাভিত্তিক লেখাপড়ার খুব একটা প্রচলন ছিল না। কিন্তু তাই বলে জ্ঞানচর্চার অভাব ছিল না। হযরত ওমর এই জ্ঞানচর্চারও অধিকারী ছিলেন, তাঁর হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি কবিতা খুবই পছন্দ করতেন এবং নিজেও খুব সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন।

জগতে বহু মানুষ দেহের দিক থেকে বীর হতে মহাবীরের পরিচয় দেন, আবার অনেকে মেধার দিক থেকে জ্ঞানী হতে মহাজ্ঞানীর পরিচয় দেন। কিন্তু বড়ই সৌভাগ্যের কথা হযরত ওমর তাঁর জীবনে দুটো পরিচয়ই এক সঙ্গেই দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরূপ জীবন জগতে সত্যিই দুর্লভ। হযরত ওমর জগতের সেই দুর্লভ এক মহাজীবন। হযরত ওমরের বাল্য ও শৈশব কালে যা লক্ষ্য করা যায়, তা অন্যান্য বালকদেরও মধ্যে দেখা যায়। একটি দেশের সমাজ ব্যবস্থার ওপরই নির্ভর করে সেই দেশের ছেলেমেয়েদের জীবন গঠনের বা পরিচালনার ধারা। তখনকার দিনে আরবে লেখাপড়ার তেমন কোন চর্চা ছিল না। তবে আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর খুব কম দেশেই লেখাপড়ার বিশেষ চর্চা ছিল। সমাজের ঐ সাধারণ পরিবেশেই ওমর বড় হয়েছিলেন। বাল্য হতে যখনই কৈশোরে পা দিলেন, প্রত্যহ কতকগুলো উট ও মেষ নিয়ে মাঠে চরাতে বেরুতেন। সারাদিন মাঠেই

কাটত। মাঝে-মধ্যে যেটুকু সময় পেতেন, কখনও তীর ধনুক চালাতেন, কখনও কুস্তীর আসরে খেলতেন, কখনও বা কবিতা চর্চা করতেন। এইগুলোই ছিল তখনকার আরব সমাজের অন্যতম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ওমর শরীরের দিক থেকে খুবই বলবান ছিলেন; আবার মেজাজের দিক থেকেও ছিলেন খুবই মেজাজি মানুষ। কাজেই কোন বালকই তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস করত না। ওমর তাঁর পিতার নিকট হতেই উত্তরাধিকার সূত্রে কড়া মেজাজটা পেয়েছিলেন। বাল্যকালে তিনি দাজনান নামক প্রান্তরে অধিকাংশ সময় উট ও মেষ চরাতেন। পরবর্তীকালে একদিন তাঁর খেলাফতকালে ঐ প্রান্তর অতিক্রম কালে মনে জাগল—একদিন এই প্রান্তরে তিনি ছিলেন একজন রাখাল বালক মাত্র, এবং আজ মাথার ওপরে এক আল্লাহ্ ব্যতীত তাঁর কোন ওপরওয়ালা নাই।

"সে আজিকে হল কতকাল,
তবু মনে হয়, সে তো সে দিন সকাল।"

—রবীন্দ্রনাথ, চিত্রাঙ্গদা

যৌবনে হযরত ওমর জীবিকার্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোসংযোগ করেন। সেদিনের জন্য ওটা ছিল একটি সম্মানিত পেশা। এই কাজে তিনি খুবই দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরেন। প্রথম যৌবনেও সততা-সাধুতা-ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভীকতা তাঁর জীবনের ভূষণ ছিল। তাঁর চরিত্রে একটি মহৎ গুণ ছিল যে কাজটিকে তিনি অন্তরের সাথে ভাল মনে করতেন, তাকে সমাধা করার জন্য হযরত ওমর নিজ জীবনকেও বিপন্ন করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তাই সেদিনের আরব সমাজে তাঁর মূল্যও ছিল অপরিসীম। মক্কার বুকে যে কয়েকজন সেদিনের সমাজ জীবনের গতি নির্ণয় করতেন, হযরত ওমর ছিলেন তাঁদের একজন। একদিন তাঁর গুরুত্বকে উপলব্ধি করেই স্বয়ং মহানবী (সাঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন—"হে আল্লাহ্, আপনি অনুগ্রহ করে কোরেশ নেতা আবু জেহেল অথবা ওমর, যে কোন একজনকে মুসলমানদের অন্তর্গত করে ইসলামের শক্তিকে বৃদ্ধি করুন।"

আল্লাহর নিকট আল্লাহর নবীর প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নি। তবে মানুষের কাজ করার ধারা এক রকম, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাজ করার ধারা একেবারেই অন্যরূপ। মানুষ সে ধারার কথা কোনদিন চিন্তাও করতে পারবে না। আমরা লক্ষ্য করেছি মিশরের ফেরাউন-রাজের রাজত্বকালে আল্লাহ্ কিভাবে, কি অচিন্ত্যনীয় ভাবেই অহঙ্কারী ফেরাউনকে চরম শিক্ষা দিয়েই হযরত মুসাকে লালন-পালন করলেন। কোরআন—২: ৪৯-৫০। এবং মহান আল্লাহ্ যখনই যা কিছুই করতে চান, মানুষের মতো তাঁকে হেতু বা কারণ খুঁজতে হয় না। তাঁর 'হও' বলাটাই যথেষ্ট। এবং সেটা এমনিভাবে ঘটে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি সেখানে আর কাজ করে না। ২: ১১৭, ৩:৪৭, ১৯:৩৫, ৩৬: ৮৩।

এখন আমরা লক্ষ্য করব হযরত ওমরের মতো মানুষের জীবনের চাকা কিভাবে ও কোন পথে ঘুরল। ২৮:৫৬, ৭৬:৩০, ৮১:২৯।

আবু জেহেলের ঐতিহাসিক ভাষণ:

ইসলামের বয়স তখন সবেমাত্র ছ' বছর (৬১৫-'১৬ খ্রীঃ) অতিক্রম করছে। এরই মধ্যে ইসলাম আরবের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হতে আরম্ভ করেছে। রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আরব নেতৃবৃন্দের। যে ঘুম কোনদিনই কোন অতি প্রত্যাশী রাজাধিরাজও কাড়তে পারেনি। সেই সুখনিদ্রা আজ চরমভাবেই বিঘ্নিত একজন নিরক্ষর মানুষ মহম্মদ (দঃ)-এর দ্বারা। যাঁর নেই কোন ধন, নেই কোন জন, নেই কোন উচ্চশিক্ষার তকমা, এরূপ একটি সহায়-সম্বলহীণ মানুষ, আরব নেতাদের দিনের পর দিন বিব্রত করবে, বিচলিত করবে, তাদের ছেলেমেয়েদের বিভ্রান্ত করবে, যা পারেনি কোন দিনই কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্রাটও। এমনি যাঁদের সাহস, নেতৃত্ব, জেগে উঠলেন সেই সমস্ত নেতাগণ, চরম ব্যক্তিত্বপূর্ণ কঠোর পুরুষগণ।

আবু জেহেল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান প্রমুখ আরব বীরগণ এই বিরাট সমস্যার সমাধানকল্পে সমবেত হলেন। সমস্ত আরব যুবককে একত্রিত করে আবু জেহেল একটি নাতিদীর্ঘ জ্বালাময়ী বক্তৃতা করলেন—"আমরা আর কতদিন মহম্মদ (দঃ)-এর এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করব, কতদিন নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চিন্ত মনে দিন অতিবাহিত করবো। আমাদের মান-সম্মান, ধর্ম-সমাজ, অতীত-ঐতিহ্য, বংশের মহিমা-গরিমা সমস্ত কিছুই আজ বিপন্ন। আমরা আমাদেব সমাজে এই অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে আর কতদিন প্রশ্রয় দেব। একটি মাত্র যুবক মহম্মদ আমাদের চরম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিপ্লবের নামে এক মহাবিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করছে দিনের পর দিন। আজ আমাদের সমস্ত কিছুকে সে ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আমরা তার প্রত্যুত্তরে নীরব ও নিশ্চল দর্শকের ভূমিকা পালন করছি। আমাদের এই কাপুরুষতা ও নীরবতা দিনের পর দিন তাকে সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে। ধিক আমাদের বীরত্বকে, ধিক আমাদের বংশকে, বিবেককে ও বিজ্ঞানকে!

অতঃপর বললেন—হে যুবকগণ, এখনও যদি আমাদের সম্বিৎ ফিরে না আসে, এখনও যদি আমরা সচেতন না হই, তাহলে একদিন মহম্মদ আমাদেরকে ধরার বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সুতরাং তোমরা আজ অনতিবিলম্বে তৈরি হও, প্রস্তুত হও তোমাদের বংশকে, ঐতিহ্যকে, মান সম্মানকে ঐ একটা স্বেচ্ছাচারী যুবকের হাত হতে রক্ষা করতে। তোমরা কালবিলম্ব না করেই ঝাঁপিয়ে পড় তোমাদের পূর্বপুরুষদের মুখ রক্ষা করার জন্য। আমি আজকের এই বীর সমাবেশে "হুবাল লাত, মানাত্ ও ওজ্জার" নামে সকলের সম্মুখে শপথ করেই ঘোষণা করলাম—যে মহম্মদ (দঃ)-এর বিদেহী মস্তকটিকে

আমার সম্মুখে হাজির করতে পারবে, আমি তাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ও এক হাজার উট পুরস্কার দান করব। আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে এমন কোন বীর আছে, যে কোনও প্রকার কালক্ষেপ না করেই আমার ঘোষিত পুরস্কারটিকে অনতিবিলম্বে লাভ করে নিজেকে করবে গৌরবান্বিত, জাতিকে করবে মহিমান্বিত এবং দেশকে করবে বিপদমুক্ত। বীরের জাতি, বীরের জননীকুল, আরব-রমণীকুল কি একটি বীর সন্তানকেও গর্ভে ধারণ করেনি, যে বীর আজ আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশজননীকে বিপদমুক্ত করতে পারে!"

নিঃসন্দেহে আবু জেহেলের পুরস্কারটি ছিল অতি লোভনীয়। কিন্তু তা অপেক্ষাও আকর্ষণীয় ছিল তাঁর অনল ভাষণ, জ্বালাময়ী বক্তৃতা, সুদূরপ্রসারী বাগ্মীতা, যা একটি জাতিকে যথাসময়ে উত্তেজিত করতে, উদ্বেলিত করতে, উৎসাহিত করতে, অনুপ্রাণিত করতে, একত্রিত করতে, এককথায় জীবণ-মৃত্যুর মহাপণ-সহ দুর্বারবেগে লক্ষ্য সাধনের বেগবান মহাস্রোতে নামিয়ে দিতে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অভাবনীয়।

মহাবীর ওমরের মহানবীকে হত্যার প্রতিজ্ঞা:

সমবেত বীর যুবকগণের মধ্যে হযরত ওমরও সেখানে হাজির ছিলেন। আবু জেহেলের পুরস্কাব বীর ওমরকে যতখানি প্রলুব্ধ করেছিল, তা অপেক্ষা তাঁর তিরস্কারই তাঁর বীরের আত্মা ও বীরের বীরত্বকে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে ব্যথিত ও মর্মাহত করেছিল। সকলেই একে অন্যের দিকে লক্ষ্য করছেন, কিন্তু সাহসে ভর দিয়ে কেউই দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছেন না। হেনকালে বীর ওমর উত্তর দিলেন—"নিছক পুরস্কারের জন্য নয়, বরং দশ ও দেশের প্রয়োজনে আমি সকলের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম এই মহৎ কাজটিকে সমাধা করার জন্য। আমি মনে করি দশ ও দেশের কল্যাণে এই গৌরবজনক গুরুদায়িত্বের সম্মানজনক সমাধান না করা পর্যন্ত আর আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করব না। আজ আমার জীবনে কেবলমাত্র আরব জাতির গৌরবকে অকলঙ্কিত রাখতেই মহম্মদ (দঃ)-এর শিরচ্ছেদই হবে প্রধান লক্ষ্য ও জীবনের পবিত্রতম কাজ।"

মহাবীর ওমরের মুখে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সকলেরই যেন একটা আত্মপ্রত্যয় ফিরে এল, এবার দেশে আবার শান্তি ফিরে আসবে, এবার মহম্মদ (দঃ)-এর বাক্‌চাতুরী শেষ হবে, এবার মহম্মদ (দঃ) চিরতরে খতম হবেন, মহম্মদ (দঃ)-এর আর কোন পরিত্রাণ নেই। আবার তাদের পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সকল কিছু নির্বিঘ্নে চলতে থাকবে।

এখানে আমরা ওমর চরিত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে, ইসলামের

প্রতি ওমরের ভাল-মন্দ তিলার্ধ বিশ্বাসও ছিল না। অধিকন্তু আপন দেশের, সমাজের প্রাচীন প্রথাগত কাজগুলোতে ছিল অন্ধবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বলেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু স্বয়ং মহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি তাঁর তখনও এতটুকুও বিরাগ বা বীতশ্রদ্ধা নেই। এমনকি স্বয়ং আবু জেহেলও মহম্মদ (দঃ) সম্পর্কে, ব্যক্তি হিসাবে কোন কটূক্তিই করেননি। এটাই ছিল আরব চরিত্রের চিরমাহাত্ম্য।

মহানবীকে হত্যার পথে ওমর:

তখনও মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, কমবেশি ৪৫জন পুরুষ ও ২১ জন মহিলা। এই সামান্য সংখ্যকের ওপরই চলছে অসামান্য অত্যাচার ও জীবনান্ত জুলুম। কেউ কেউ অত্যাচারে অবিচারে অধৈর্য হয়েই দেশ ছাড়ছেন, যেন সম্মুখে ঘনঘোর অন্ধকার। কোথাও গিয়ে যদি সামান্য আলো-বাতাস পাওয়া যায়। কতিপয় মুসলমান যেন অতি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাছুটি করছেন। ঠিক এই পরিস্থিতিতে হযরত ওমরের ন্যায় বীর যুবককে কোরেশগণ প্রবল ভাবে উত্তেজিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে, মহানবীর জীবন-নাশে উৎসাহিত করল, উদ্বুদ্ধ করল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ষড়যন্ত্রকারী, কৌশলকারী কোরেশকুল একেবারেই ভুলে গিয়েছিল যে, মহাকৌশল একমাত্র আল্লাহ্‌রই হাতে। "আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।" কোরআন—৩:৫৪, ৮:৩০, ৮৬:১৫-১৭।

দাসী লবিনাহ:

ওমরের আপন ঘরের দাসী লবিনাহ্। মহিয়সী লবিনাহ আপন ইচ্ছামতেই মনেপ্রাণে ইসলামকে কবুল করেছেন। ওমর তরবারি হাতে বাড়ি হতে বের হওয়ার পূর্বেই চিন্তা করলেন, সবের প্রথম নিজের বাড়িকেই ঠিক করতে হবে। তাই তিনি দাসী লবিনাহকে ইসলাম প্রত্যাখ্যানে নির্দেশ দিলেন। সামান্য দাসী তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ওমর তাঁকে অতীব বিরক্তভাবে সতর্ক করেও যখন সে পথে এল না, তখন ওমর দাসীকে প্রহার শুরু করলেন। বহু লোভ বহু প্রলোভন দেখালেন, তবুও দাসীকে আপন পথে আনতে না পেরে সত্যিই চিন্তিত হলেন। পলকের মধ্যে বিজ্ঞ ওমরের মাথায় খেলে গেল আবু জেহেলের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতামালা। তখন তাঁর মনে হল—সব কিছুর মূলে একমাত্র মহম্মদ (দঃ)। তাঁকে শেষ করতে পারলেই সব কিছুই এক নিমিষে শেষ হয়ে যাবে। অসংখ্য মানুষ রক্ষা পাবে, দেশ ও জাতি রক্ষা পাবে। দেশের ঐতিহ্য-অতীত রক্ষা পাবে। সুতরাং সবের প্রথম মহম্মদ (দঃ)-কে বধ করাই শ্রেয়।

ওমর ও নঈম:

উলঙ্গ তরবারি হস্তে ওমর আজ মহানবীর শিরচ্ছেদে ও সন্ধানে পথিমধ্যে দ্রুত ধাবমান। হঠাৎ নঈমের সাথে সাক্ষাৎ। নঈম জিজ্ঞাসা করলেন—'ওমর

খোলা তরবারি হস্তে নিয়ে কোন্ উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছো? ওমরের সংক্ষিপ্ত সরল উত্তর—"মহম্মদ (দঃ)-কে বধ করতে যাচ্ছি"। তখন নঈম উত্তরে বলেন—"তুমি তাঁকে বধ করে কি তাঁর সাহায্যকারী বানু যোহরা, বানু হাশেম ও বানু মান্নাফ গোত্রের হাত হতে বাঁচতে পারবে?" একথা শোনা মাত্র ওমর খুবই উত্তেজিত হয়ে তাঁকে উত্তর দিলেন—'তোমার কি এতে খুবই মাথাব্যথা দেখা দিয়েছে; তুমিই তো একজন মহাপাপী, তুমি মহম্মদ (দঃ)-এর অনুগত মানুষ মুসলমান। সুতরাং তোমাকেই প্রথম শেষ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। বলার সঙ্গে সঙ্গে ওমর বিশাল তরবারিটি তাঁর মাথার ওপর খাড়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঈমানের তেজে উদ্বুদ্ধ নঈম উত্তর দিলেন—"মৃত্যুকে আমি কখনও ভয় করিনি, তবে শোন, মুসলমান হওয়ার জন্য যদি আমাকে হত্যা করতে হয়, তাহলে তুমি প্রথম তোমার ঘরকে সংশোধন কর, পরে পরকে সংশোধন করবে। জেনে রেখো—তোমার আপন ভগিনী ফাতেমা ও তাঁর স্বামী সাইদ আমারই ন্যায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন। প্রথম তাঁদের পথে আনো, পরে আমাকে আনবে।" এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বীর ওমরের উলঙ্গ তরবারি নঈমের মাথার ওপর হতে নিচে নেমে এল।

ওমর ও সাইদ:

অতঃপর ওমর দ্রুতগতিতে ভগিনী ফাতেমার বাড়ির দিকে ধাবমান হলেন। ওমর যখন ফাতেমার বাড়ির সন্নিকটে হাজির হলেন, তখন সাহাবী খাব্বার ওমরের ভগ্নি ও দুলাভাই সাইদকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। দরজাতে ওমরের উপস্থিতি লক্ষ্য করেই খাব্বার প্রাণভয়ে আত্মগোপন করেন। কিন্তু তখনও চামড়াতে লেখা কোরআনের আয়াতগুলো এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়ে গেছে, তাড়াহুড়োর জন্য গোপন করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর ওমর বাড়ির ভেতরে এসে সাইদকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মহম্মদ (দঃ)-এর অনুচর বা শিষ্য হয়েছ, তোমরা কি এতক্ষণ কোরআন শিক্ষা করছিলে?" উত্তরে সাইদ বললেন, ইসলাম যদি ভাল জিনিস হয়, তাহলে তাকে গ্রহণ করলে দোষের কি আছে, কোরআন যদি মানুষকে সৎপথ দেখায়, তাহলে কোরআন আলোচনাতে দোষের কি আছে। এইসব কথাবার্তা শুনে ওমরের গায়ের রক্ত একেবারেই মাথায় উঠল। তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সাইদকে অত্যন্ত গালাগালি-সহ প্রচণ্ডভাবে মারধর করতে আরম্ভ করলে স্বামীকে প্রকাশ্য যমের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য স্ত্রী ফাতেমা ওমরের প্রহারে বাধা দিলে ওমর সবকিছু ভুলে গিয়ে আপন ছোট বোন ও একটি নারীর গায়েও হাত তুলতে দ্বিধাবোধ করলেন না। বীরের ধর্ম স্খলিত হল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তাক্ত

হয়ে উঠল। ছোট বোনের রক্তাক্ত দেহ দেখে ওমরের বীরপ্রাণ যেন বিচলিত বোধ করল। তাঁর স্বাভাবিক বীরত্ব যেন মহত্ত্বের সাথে মিশতে চাইল, মূঢ়তা যেন মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হল, ওমরের চির কপটতাহীন কার্যাবলী আজ মহা মানবের দ্বারোদ্ঘাটনে, মানবতার উত্তরণে উত্তীর্ণ হল।

ওমর ও ফাতেমা :

অতঃপর অনুতপ্ত ওমর, আগামী দিনের দিগ্বিজয়ী ওমর অত্যন্ত স্নেহভরে ছোটবোন ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তাঁরা কি সত্যিকারেই ইসলামকে বরণ করেছে, তাঁরা কি মনেপ্রাণে কোরআনকে গ্রহণ করেছে। বোন দ্বিধা-হীন কণ্ঠে, নির্ভীক চিত্তে, অবিচলিত ভাবে প্রবল প্রতাপান্বিত ওমরকে উত্তর দিলেন—"আমরা ইসলামকে বরণ করেছি এবং যে কোন কিছুর বিনিময়েই তাকে রক্ষা করব, ত্যাগ করব না। পৃথিবীর কোন কিছুই আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না। আমরা আমাদের স্থির লক্ষ্যে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকবো।" তখন ওমর স্তম্ভিত, বিস্মিত, এ কোন্ শক্তি সামান্যতম ক্ষীণ মানুষকে করেছে অসীম ক্ষমতার অধিকারী!

এবার পরিবর্তিত অন্তর ওমর, বিগলিত অন্তর ওমর, শ্রদ্ধাবিজড়িত হৃদয় ওমর আপন বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা এতক্ষণ কি পড়ছিলে, আমাকে একবার দেখাবে কি, বোন উত্তর দিলেন—"সকলকে দেখাবার জন্যই কোরআন, পড়াবার জন্যই কোরআন, বিশ্ব-মানবের জন্যই কোরআন। ২:২, ১৫:৯, ১৯:২৭, ১৬:১৯২, ২৭:৭৭, ৩০:৮১, ৬৮:৫২, ৬৯:৪০-৫২। তবে আপনাকে কোরআন স্পর্শ করতে হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে, কেননা "যারা পূত-পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউই ইহা স্পর্শ করে না।" ৫৬:৭৯। তখন ওমর অজু-গোসল সহ বোনের কথায় প্রস্তুত হলেন, পবিত্র কোরআনকে স্বহস্তে ধরে স্বচক্ষে পড়ার জন্য। অতঃপর বোন ফাতেমা চর্মখণ্ডে লিখিত পবিত্র কোরআনের আয়াত (বাক্য) গুলো ওমরের হাতে অর্পণ করলেন। ওমর আপন হস্তে কোরআন তুলে নিয়ে অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে ও গভীর আগ্রহের সাথে পড়তে আরম্ভ করলেন। এখানে ছিল পবিত্র কোরাআনের সুরা 'ত্বা-হা' ও 'হাদিদ', এই সুরা দুটো (২০ ও ৫৭) পড়তে পড়তে ওমরের চিত্ত একেবারেই বিমোহিত হয়ে উঠল। তিনি যেন একেবারেই তন্ময় হয়ে গেলেন। পবিত্র কোরআনের ভাষা-বাকভঙ্গি, মর্মার্থ সকল কিছুই একযোগে ওমরকে জয় করে বসল। তাঁর হৃদয়ে সঞ্চারিত হল এক অভাবনীয় ভাব, এক স্বর্গীয় অনুভূতি, এককথায় মহাসত্যের উপলব্ধি ও বোধদয়। ২৮:৫৬, ৭৬:৩০, ৮১:২৯।

যে কাজ করিল তারা অবুঝ মনে
তুমি তাদের ক্ষমা করো আপন গুণে।

দিন নাই রাত নাই অবিরাম ধ্যান
দাও আল্লাহ্ অবুঝেরে বোধ শক্তি জ্ঞান।
আকৃতি কাকুতি মোর ভুলে ভরা ভূমি
ভূ-জনে বুঝিতে দাও মহাসত্য তুমি।

—মহানবী

শিকারী আজ শিকারে পরিণত:

হযরত ওমর তাঁর বাড়ি হতে বের হয়েছিলেন মহানবীকে হত্যা করার জন্য, তাঁর শিরচ্ছেদ করার জন্য। এখন তিনি সাইদকে অনুরোধ করলেন, তাঁকে মহানবীর নিকট নিয়ে যাওয়ার জন্য। সাইদ প্রস্তুত হলেন তাঁকে মহানবীর সমীপে হাজির করার জন্য। হেনকালে বাড়ির মধ্যে আত্মগোপনকারী সাহাবা খাব্বার বের হয়ে বীর ওমরকে একটি সংবাদ দিলেন। সংবাদটি শোনামাত্র ওমর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। খাব্বার ওমরকে বললেন—"গতরাত্রে আমি স্বয়ং মহানবী (দঃ)-কে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে শুনেছি—'হে আল্লাহ, আপনি পরম করুণাবশত আবু জেহেল অথবা ওমরকে ইসলামে দাখেল করে আমাদের দলভুক্ত করে দিন।" এত সত্বর মহানবীর প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে, এটা আমি ধারণাও করতে পারিনি।" এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওমর আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সাইদ ও খাব্বারকে অনুরোধ করলেন তাঁকে মহানবীর সমীপে হাজির করার জন্য।

ঠিক সেই সময় মহানবী শাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী আকরামা নামক এক মুসলমানের বাড়িতে বসে আবুবকর, আমির হামজা, আলী ও অন্যান্য সাহাবী-সহ ইসলামের আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ একজন বলে উঠলেন—ওমর এই দিকে আসছেন কেন। মহাবীর আমির হামজা উত্তর দিলেন—ওমরকে আসতে দাও, যদি অসদুদ্দেশ্য নিয়ে আসে, তাহলে আমি তার তরবারি দ্বারাই তার দেহকে দ্বিখণ্ডিত করে দেব তার বিদেহী মস্তককে তারই বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।

তখন দ্বীনের নবী মহম্মদ (দঃ) আপন স্বভাবজাত শান্তস্বরে সকলকেই বললেন—"ওমরকে আসতে দাও, তাকে যা বলার আমিই বলব।" ক্ষণিকের মধ্যেই ওমর সদলবলে গৃহে প্রবেশ করলেন। মহানবী ওমরকে নিজের দিকে আহ্বান করা মাত্র তিনি নতমস্তকে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। তখন মহানবী তাঁকে তাঁর শুভাশুভ সংবাদ জিজ্ঞাসা করে বললেন—"আর কতদিন সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।" মহানবী ওমরের পৃষ্ঠদেশে হস্ত রেখে তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই ওমর সবিনয়ে উত্তর দিলেন—"সত্যের বিরুদ্ধে আমার লড়াই শেষ, এবার শুরু হোক সত্যের পক্ষে, আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে অনুমতি দিন। আপনার চরণতলে স্থান দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।" এই বলে হাতের দীর্ঘ তরবারি মহানবীর পদতলে নামিয়ে দিলেন।

আরবের বিরাট জল্পনা-কল্পনার সমাধি ঘটল। মহান আল্লাহর অফুরন্ত কুদ্‌রতে শিকারী আজ স্বেচ্ছায় শিকারে পরিণত হোল। ৩:৫৪, ৮:৩০, ৮৬:১৬।

দীক্ষিত ওমর:

অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত মহম্মদ (সঃ) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সমস্বরে তক্‌বির ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। মহান আল্লাহর জয় বিঘোষিত হল। আল্লার নবীর প্রার্থনা মঞ্জুর হল। 'আল্লার দ্বীন ইসলাম' প্রতিষ্ঠিত হল। ৩:১৯। সকলেই শান্ত হলেন। সকলেরই মধ্যে একটি প্রশান্তি এসে গেল। মহানবী কলমা তৈয়ব পাঠ করিয়ে ওমরকে দ্বীন-ইসলামে দীক্ষিত করলেন। এইভাবে সুকৌশলেই আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে দিনের পর দিন এগিয়ে নিতে থাক্‌লেন, যা রোজ হাশর পর্যন্ত এটা চলতেই থাকবে। কেননা মহানবী শেষ নবী, ইসলাম শেষ দ্বীন। এই দ্বীনকেই আল্লাহ্ বিশ্ববুকে স্থায়ী করবেন। ৯:৩৩।

একদিন ফেরাউনরাজ তাঁর জ্যোতিষীর কথামতো চিন্তিত হয়ে ভাবী বিদ্রোহীর হাত থেকে মিশরকে বা আপন মসনদকে সুরক্ষিত করার নিমিত্ত ঐ বছরের নবজাত সকল পুত্র সন্তানের প্রাণদণ্ডের বা বধের ফরমান জারী করেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ এমনি কৌশলী, মিশররাজ যে সন্তানটির আশঙ্কায় নিরপরাধ সকল সন্তানকে বধ করলেন, আল্লাহ্ সেই সন্তাটিকেই লালন-পালন করালেন মিশরের রাজা ও রাণী কর্তৃক। ২:৪৯, ৭:১৪১। এখানেও হযরত ওমরের জীবনেও ঐরূপ ঘটল। কোরেশকুল প্রধান আবু জেহেল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হযরত ওমরকে নিযুক্ত করলেন ইসলামের নবীকে বধ করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। আল্লাহ্ মহাকৌশলী, তারা যাকে নিযুক্ত করল, আল্লাহ্ সেই একই ব্যক্তির দ্বারা ইসলামের নবীকে অফুরন্ত সাহায্য করেই ইসলামকে জগতের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রথম যুগে ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)।

ওমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু!
আহ্বান নয়-রূপ ধরে এস! গ্রাসে অন্ধতা রাহু
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া—জ্বলিছে জোনাকীর আলো ক্ষীণ।
—কাজী নজরুল ইসলাম

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম প্রথম বহির্জগতে

এতদিন মুসলমানগণ ইসলাম ধর্ম পালন করতেন গোপনে বা আপন আপন ঘরের মধ্যে। বহির্জগতে বা প্রকাশ্যে কাবাগৃহে তাঁদের প্রার্থনা করার কোন স্বাধীনতাই ছিল না। বরং পদে পদে ছিল মহাবিপদ। কোথাও লাঞ্ছনা, কোথাও নির্যাতন, কোথাও একেবারেই নিধন। হযরত ওমর ইসলামে দীক্ষা নেওয়ার পরই মহানবীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন প্রকাশ্যে নামাজ পড়ার জন্য। এমনকি কাবা শরীফে দলবদ্ধ হয়ে নামাজ আদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হযরত ওমরের যুক্তি ছিল—তাঁরা সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক ধর্ম পালন করবেন, কারো ক্ষতি করবেন না, সুতরাং এই কাজে কেউ বাধা দিতে এলে তাকেও বরদাস্ত করা হবে না। ওমরের এই প্রস্তাবে মুসলমানদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও নবীন উদ্দীপনা দেখা দিল।

মহানবী (সাঃ) হযরত ওমরের প্রস্তাবটিকে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করলেন। উপদেশ দিলেন—মুসলমানগণ কাবা শরীফে নামাজ আদায় করতে যাবে দু'দলে বিভক্ত হয়ে। এক-একটি দলের নেতৃত্বে থাকবে মহাবীর আমির হামজা, ও মহাবীর ওমর। এইভাবে কাবা শরীফে প্রথম নামাজ অনুষ্ঠিত হল। ইসলাম বহির্বিশ্বের মুখ দেখল। দলে দলে মানুষ ইসলামে দীক্ষা নিতে আরম্ভ করল। ইসলামের জয়যাত্রা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল।

বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলেন—"হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করার পর কোরেশদের সাথে বহুবার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু প্রতিবারেই ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। বলতে বাধা নেই, ওমরের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বলেই আমরা প্রথম কাবাগৃহে প্রকাশ্যে নামাজ আদায়ে সাহসী হয়েছিলাম।"

সুতরাং আমরা এখানে নির্দ্বিধায় বলতে পারি শিশু ইসলাম একদিন ওমরের বীরত্বে ও বাহুবলে বাড়ির বাইরে পদসঞ্চালনেব সাহস ও শক্তি অর্জন করল। ইসলামের ইতিহাস নতুন দিকে মোড় নিল আজ। ইসলাম জগতে এটি ছিল হযরত ওমরের প্রথম অবদান।

মদিনার পথে হযরত ওমর:

৬২২ খ্রীস্টাব্দে মহানবী মক্কা ত্যাগ করে মদিনার পথে পাড়ি দেন। এই হিজরতের পূর্বে তিনটি বছর মক্কার কোরেশগণ মুসলমানদের প্রতি যে কি অবর্ণনীয় অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন, লাঞ্ছনা চালিয়েছে তা একেবারেই অচিন্ত্যনীয়। (দ্রঃ মহানবী, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ১৫৪, তৃতীয় সং)। এই

সময় ইয়াসরেব (বর্তমানে মদিনা) শহরের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা মহানবীকে প্রস্তাব দেন তাঁদের শহর ইয়াসরেব হিজরত করার জন্য। মহানবী নিজেও চিন্তা করছিলেন কিছু একটা করা দরকার।

প্রথম দিকে মহানবী মুসলমানদের মদিনাতে হিজরত করার জন্য উপদেশ দিলেন মাত্র দু'-একজন করে যাওয়ার জন্য। যেন মক্কার কোবেশ কুলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। নচেৎ তারা বাধা দেবে। একের পর এক বধ করবে। মহানবীর উপদেশানুযাযী মুসলমানগণ দু'-একজন করেই মদিনাতে গোপনে যাত্রা আরম্ভ করলেন। প্রথম যে ক্ষুদ্র দলটি গেলেন—একের পর এক, তাঁরা—আবু সালমা ইবনে আয়হাল, হযরত বেলাল, আম্মার ইবনে ইয়াসের। হযরত আলীও এই কথাই বলেন—প্রথম প্রথম দু'-একজন করে গোপনে চলতে থাকেন।

কিন্তু হযরত ওমর যখন যাওয়ার মনস্থ করলেন, তখন তিনি কোন গোপনীয়তা অবলম্বন করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি সর্বপ্রথম সঙ্গে তরবারি ও তীর-ধনুক নিয়ে কাবাতে গেলেন, সেখানে নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগী করলেন। প্রাণভরে কাবাগৃহকে 'তাওযাফ্' বা প্রদক্ষিণ কবলেন। অতঃপর সজোরে ঘোষণা করলেন—তিনি মদিনা যাচ্ছেন, যদি কেউ তাব জননীকে পুত্রশোকে কাঁদাতে চায়, যদি কেউ আপন সন্তানদের অনাথ করতে চায়, যদি কেউ আপন স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, তাহলে আমাব সম্মুখে এসে আমার গতি রোধ করুক। কিন্তু কেউই সাহসী হল না তাঁর এই গতিকে রোধ করতে।

কুবাতে হযরত ওমর :

হযরত ওমর বলেন—"মক্কা ত্যাগ করে মদিনাতে হিজরত করার ব্যাপারে আমি পূর্বেই আয়াস ইবনে আবি রাবিয়া এবং হিশাম ইবনে আল আশের সাথে পরামর্শ করেছিলাম। আমাদের মধ্যে কথা ছিল যদি কোন ব্যক্তি ঠিকমতো সময়ে হাজির হতে না পারে, তাহলে বাকি দুজন তৃতীয় জনেব জন্যে অপেক্ষা না করেই যাত্রা করবে। এই কথানুযায়ী আমি এবং আয়াস রওনা হলাম মদিনার পথে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হিশাম আমাদের সাথে যোগদান কবতে পারল না। আমরা দু'জন কুবাতে এসে পৌঁছালাম। কিন্তু আয়াস পুনবায মক্কাতে ফিরে গেল তার মাতাকে আনার জন্য, পরে ওখানে কোরেশদেব হাতে বন্দী হয়ে শহিদ হন। মক্কা হতে আগত ব্যক্তিদের জন্য তখন মদিনাতে তেমন কোন সুব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ মানুষ (মোহাজিরবৃন্দ) মদিনা হতে তিন মাইল দক্ষিণে কুবাতে অবস্থান করতে থাকেন। আমিও ঐখানেই রাফা ইবনে আব্দুল মুনজেরের বাড়িতে তাঁর অতিথি হিসাবে বসবাস শুরু

করি। আমার হিজরতের পর মহানবীর অনুমতিসহ সকল সাহাবীই একের পর এক মক্কা পরিত্যাগ করেন। সকলের শেষে আল্লাহ্র নবী হযরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মদিনাতে উপনীত হন। মহানবীও সরাসরি মদিনাতে না গিয়ে প্রথম কুবাতেই উপনীত হন, এবং রবিউল আউয়াল মাসের বারোই তারিখে শুক্রবার দিন সেখানে জুম্মার নামাজ আদায় করেন। অতঃপর কুবাতে কয়েকদিন অবস্থানের পর মদিনাতে গমন করেন। মহানবীর মদিনা গমনের দিন হতেই সেখানকার অর্থাৎ ইয়াসরেবের জনসাধারণ তাঁদের প্রিয় শহর ইয়াসরেবের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করলেন—'মদিনাতুন নবী' অর্থাৎ 'নবীর শহর।

মহানবীর মক্কা ত্যাগের পরও তাঁরই নির্দেশে কেবলমাত্র হযরত আলী মক্কাতে রয়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনিও মদিনাতে এসে মহানবীর সাথে যোগদান করেন। আবার অনেকেরই মতে, মহানবীর নির্দেশমতো ওমর ২০ জনের একটি কাফেলাকে মদিনাতে হাজির করেন।

হযরত ওমর ও উৎবান:

মহানবীর মদিনাতে আগমনের পূর্বে সেখানকার মোহাজিরদের অবস্থা অস্থায়ী ও অনিশ্চিত ছিল। তিনি মদিনাতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সকল কিছুতে মনসংযোগ করলেন। সকল মুসলমানকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন—'মোহাজির' ও 'আনসার'। আনসারগণ মক্কার মোহাজিরগণকে অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে বরণ করেছিলেন। মহানবী মোহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রতি দু'জনকে একটা বিশেষ ধর্ম-ভাই সম্পর্কে বেঁধে দিয়েছিলেন। মদিনার বনী সালিম গোত্রের নেতা ওতবান ইবনে মালিক হযরত ওমরের ধর্মভাই নির্বাচিত হয়েছিলেন। অনেক মোহাজির বহুদিন পর্যন্ত কুবাতেই বসবাস করেছিলেন। এমনকি হযরত ওমরও বহুদিন কুবাতেই ছিলেন। তিনি প্রায় মদিনাতে এসে মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। মক্কায় মুসলমানদের জীবনযাত্রা ছিল অতীব সঙ্কটজনক, দিবারাত্রি ছিল বিপদের আশঙ্কা, এমনকি প্রাণহানিরও। সুতরাং সেখানে মুসলমানদের জন্য কোন কিছু করা বা নতুন ভাবে চিন্তা করা একেবারেই অভাবনীয় ছিল।

মদিনাতে এসে তাঁরা পেলেন মুক্ত জীবনের মহাস্বাদ, স্বাধীন চিন্তার সুন্দর অবকাশ, সমাজ গঠনের সুন্দর পরিবেশ, ধর্মীয় জীবনযাপনের বিড়ম্বনাবিহীন বাতাবরণ। এককথায় ইসলাম যেমন পেল শাখা-প্রশাখা মেলার মুক্ত প্রাঙ্গণ, হযরত ওমর তেমনি পেলেন ইসলামের সেবা করার সহস্র সুযোগ।

এবার মহানবী সুযোগ পেলেন ইসলামের ধর্মীয় বিধিবিধানগুলোকে যথাযথভাবে রূপ দেওয়ার জন্য। মক্কাতে মুসলমানদের জীবন রক্ষা করাই ছিল প্রথম ও প্রধান কাজ। যে কোন সময়ে কোরেশগণ তাঁদের নানা অছিলায় নানা

ভাবে আক্রমণ করত, এমনকি জীবনের মতো শাস্তি দিতেও দ্বিধা বোধ করত না। তাই মুসলমানদের মক্কাতে ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের চেষ্টা করাটা ছিল একেবারেই অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। তাঁদের প্রতি অত্যাচারের কোন সীমা ছিল না। যেহেতু তাঁরা ইসলামকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ও সাদরে বরণ করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁদের মহাপাপ। তাই তখনও যথাযথভাবে নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত, জুম্মার নামাজ, দুই ঈদের নামাজ—সদকা, ফেতরা প্রভৃতি নানা আনুষ্ঠানিক কাজ নিয়ে মহানবী বিশেষ কোন নির্দেশ দেননি। মক্কাতে নামাজ প্রচলিত থাকলেও, তা ছিল খুবই সীমিত, খুবই সংক্ষিপ্ত করা হতো, এশার নামাজ ব্যতীত সব নামাজই দু'রাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল। তখনও আজান প্রচলিত বা প্রবর্তিত হয়নি।

ইসলামের আজান ও হযরত ওমর:

নামাজের জন্য মুসলমানদের কিভাবে মসজিদে আহ্বান জানানো যায়, এ সম্পর্কে মহানবী সর্বপ্রথম চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ করেন। নানা ধর্মে নানা পদ্ধতি বজায় ছিল। ইহুদিদের বিউগিল বাজনা, খ্রীস্টানদের ঘণ্টা, কারো বা বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। মহানবী যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্যতম সাহাবীদের আহ্বান করলেন, তখন সমবেত সাহাবীদের মধ্যে হযবত ওমর মহানবীকে জানালেন যে, তিনি স্বপ্ন যোগে নামাজে আহ্বানের জন্য একটি পদ্ধতি লাভ করেছেন এবং মহানবীকে জানালেন বর্তমান আজানেব আদি-অন্ত। মহানবী অত্যন্ত আনন্দের সাথে সকলকেই জানিযে দিলেন—তিনি যে ইঙ্গিত পেযেছেন, তাও ঐরূপই। এবং ওমরেব দেওয়া আজান (আহ্বান) পদ্ধতিটিকেই অনুমোদন করে প্রথম ইসলামের মোয়াজ্জীন রূপে হযরত বেলালকে আজান দেওযাব জন্য নিযুক্ত করলেন। ইসলাম জগতে আজানের মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব গৌরবজনক। এককথায় আজানকে কেবলমাত্র নামাজেব জন্যই নয়, বরং সমগ্র ইসলাম জগতের 'মহান ভূমিকা' বলা যেতে পারে। কোনদিনই ভুলে গেলে চলবে না, ইসলামের এই মহান ভূমিকাটি হযরত ওমরেরই অবদান। এমনকি মহানবীর পর, হযরত আবুবকরেরও পর, ফজব (প্রভাত) নামাজে হযরত ওমর আরো একটি লাইন আজানে জুড়ে দেন—"নিদ্রা অপেক্ষা নামাজ উত্তম।" "আস্ সালাতো-খাইরুম্-মিনান্-নায়ূম্।" অনেকের মতে, এটিও হযরত ওমরের দান।

সুতরাং সমগ্র ইসলাম জগতের ভূমিকা স্বরূপ যে আজান তা হযরত ওমরের অবদান। একটি মূল্যবান গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করা কতখানি শক্ত কাজ তা সকলেই জানেন। হযরত ওমর সেই মূল্যবান শক্ত কাজের গৌরবে চির গৌরবান্বিত। এককথায় হযরত ওমর ইসলামের ভূমিকা রচনাকারী।

আলোচনার দিক নির্ণয় :

হযরত ওমর সম্পর্কে আলোচনা করতে এবার আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নিতে হবে। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে মহানবীর হিজরতের পরদিন হতে তাঁর মৃত্যু দিন (৬৩২ খ্রীঃ) পর্যন্ত এই দশ বছর মদিনার মাটিতে ইসলামের যে ইতিহাস রচনা হয়েছিল, তা একমাত্র মহানবীকে কেন্দ্র করেই । মহানবী ছিলেন ইসলামের আসমানে সূর্যস্বরূপ, এবং তাঁর সকল সাহাবীগণই ছিলেন তাঁর গ্রহ বা উপগ্রহ মাত্র। তিনি যেভাবে যাঁকে যা আদেশ দিতেন, তিনি ঠিক সেইভাবেই তা পালন করতেন। এই জন্যই মদিনার বুকে হযরত ওমরের প্রথম দশ বছরের যে ইতিহাস, তা মহানবীর জীবন-ইতিহাসের সাথে একেবারেই ওতপ্রোতভাবে নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই মদিনার বুকে যে কোন সমস্যা, যে কোন সংগ্রাম, যে কোন নীতি নির্ধারণ, সমস্ত কিছুই গ্রহণ করেছেন একাকী আল্লাহর নবী মহানবী। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি সবার সাথে পরামর্শ করতেন, সকলেরই সাহায্য নিতেন, সকলেই তাঁকে সকল কাজেই সাহায্য করতেন। ৩:১৫৯, ৪২:৩৮।

মহানবীকে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম যে কয়েকজন ছিলেন, হযরত ওমর তাঁদের অগ্রগণ্য। সুতরাং ঐ সমস্ত ঘটনারাশি আমরা অতি সংক্ষেপে বলে যাব। ঐ অংশটাই আমরা শুধু গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করবো, যেখানে হযরত ওমরের ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে। এবং এইটাই আমাদের এখানে মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত—হযরত ওমরের মহান কার্যাবলী, মহান ব্যক্তিত্ব, মহান চরিত্র। এতদ্ব্যতীত ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডেব (মহানবী) কথাগুলোর আবার তৃতীয় খণ্ডে পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। তাই সতর্কতার সাথেই এই গ্রন্থে হযরত ওমরকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করা হয়েছে।

সুতরাং যাঁরা ঐ সমস্ত ঘটনারাশির বিস্তৃত বিবরণ জানতে চান, তাঁরা দয়া করে বর্তমান লেখকের ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড, হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী 'মহানবী' দেখুন। [মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ নং, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩]

বদর যুদ্ধে হযরত ওমর :

হিজরীর দ্বিতীয় সনে (৬২৪ খ্রীঃ) ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর প্রান্তরে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল মক্কার কোরেশদের মহানবী সম্পর্কে অনমনীয় মনোভাব; তারা চেয়েছিল মহানবী ইসলামসহ অচিরাৎ চিরতরে ধ্বংস হোন। তা হয়নি। বরং মদিনার মাটিতে ইসলাম নতুন জীবন লাভ করল। এইটাই ছিল কোরেশদের মূল আক্রোষের মূল কথা। কোরেশগণ ৯৫০ জন সৈন্য-সহ মদিনা আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে মহানবী মাত্র

৩১৩ জন সাহাবীকে নিয়ে তাদের মোকাবিলা করেন। যুদ্ধে কোরেশগণ শোচনীয় ভাবেই পরাজয় বরণ করল।

এই যুদ্ধে ওমর মহানবীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁর বহু অমুসলমান আত্মীয়-স্বজন যুদ্ধে যোগদান করেছিল। এবং তাদের অনেকেই ওমরের হস্তেই নিহত হন। এখানে আমরা ওমর চরিত্রকে লক্ষ্য করছি—ইসলামই যার একমাত্র বক্তব্য। সেখানে ঘর-পর বা আত্মীয়-স্বজনের কোন প্রশ্নই ওমরের মনকে টলাতে পারেনি। এই যুদ্ধের প্রথম শহিদ ওমরের গোলাম মাহ্জা। আমরা হযরত ওমরের জীবনে একটি জিনিস সর্বদাই লক্ষ্য করছি, ইসলামই ছিল তাঁর সকল সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দু। তাই বদর যুদ্ধে ওমর ইসলামের জন্য আপন আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেও তরবারি ধরতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেননি। কোন কিছুরই মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি তাঁকে ইসলামের কাজে পরাস্ত করতে পারেনি।

এইজন্যই বদর যুদ্ধে যখন কোরেশকুলের ৭০ জন নিহত হল, ও ৭০ জন বন্দী হল তখন ওমর তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন, যাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের নির্মমভাবে শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু আবুবকর বললেন—যতই হোক তারা আমাদের নিকট মানুষ, কিছু মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। কিন্তু ওমর এই অভিমতের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এই কাহিনী দ্বারা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি, ইসলামের শত্রুকে নিজের প্রধান শত্রু ভাবাই ছিল ওমরের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

যাই হোক, দয়ার নবী মহানবী দয়াবশত আবুবকরের নরম সিদ্ধান্তটিকেই গ্রহণ করলে মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে ওমরের সিদ্ধান্তটিই বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল বলে ওহী (ঐশী) নাজেল করেন। দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত কোন নবীর বন্দী রাখা সঙ্গত নহে; তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ, কিন্তু আল্লাহ্ চান পরকালের কল্যাণ।"—কোরআন : :৬৭।

ওহোদ যুদ্ধে হযরত ওমর :

মক্কার কোরেশগণ বদর যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতি ও একান্ত লজ্জাকর পরিণতি একেবারেই ভুলতে না পেরে পরবর্তী যুদ্ধ ওহোদে অবতারণা করল। কোরেশদের তিন হাজার সৈনিক, মহানবীর মাত্র সাতশো জন। হিজরী তৃতীয় সনে ওহোদ পাহাড়ের প্রান্তে যুদ্ধ আরম্ভ হল। কোরেশগণ একেবারেই পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলে মুসলমান তীরন্দাজগণ ভুলবশত আপন আপন স্থান পরিত্যাগ করে যুদ্ধের ধনরাশি সংগ্রহে মনোনিবেশ করলে রণকুশল খালিদ পেছন হতে অসতর্ক মুসলমানদের অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করে স্বয়ং মহানবীকেই আঘাত করেন। হযরত ওমর এই চিত্র দেখা মাত্র চরম বিক্রমে খালিদকে বহু দূরে বিতাড়িত করে আবার মুসলমানদের একত্রিত করেন। এই যুদ্ধে

হযরত ওমরের বীরত্ব ইসলামের ইতিহাসে একান্তভাবেই উল্লেখযোগ্য। [বিস্তারিত মহানবী দ্রষ্টব্য।]

মহানবী ও ওমর-কন্যা হাফসা :

কন্যা হাফসা বিধবা হলে ওমর কন্যার পুনর্বিবাহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। প্রথমে আবুবকর ও পরে ওসমানকে অনুরোধ করেন বিয়ে করার জন্য। কিন্তু তাঁরা দু'জনেই অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইতিহাসে অসম্মতির দুই প্রকারের কারণ দেখা যায়। প্রথম, কেউ কেউ বলেন—কন্যা হাফসা অত্যন্ত মুখরা রমণী ছিলেন, তাই তাঁরা অসম্মতি জানান। দ্বিতীয়, কেউ কেউ বলেন মহানবী নিজেই সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন, তাই অন্যরা অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু অধিকাংশেরই মত ও আমাদেরও মত, আবুবকর ও ওসমানের অসম্মতি জ্ঞাপন করার জন্যই মহানবী ওমরকে দায়মুক্ত করার নিমিত্ত তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। যাই হোক, এই কাজের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে স্বয়ং মহানবী ওমরকে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। এই বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় হিজরীর তৃতীয় সনে শাবান মাসে। [দ্রঃ মহানবী পরিশিষ্ট-২]

পরিখার যুদ্ধে হযরত ওমর (রাঃ) :

মক্কার কোরেশ ও মদিনার ইহুদিগণ পর পর বদর ও ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের সামান্য সংখ্যক মানুষের সাথে বারবার শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এর প্রতিশোধার্থে তারা সকলে মিলে প্রতিজ্ঞা করল, এমন একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করতে হবে, যা আরবদেশ কোনদিনই চোখে দেখেনি, এবং মনে চিন্তাও করতে পারেনি, এবং সেই অভূতপূর্ব বাহিনীকে নিয়ে মহানবী, মুসলমানও মদিনার মাটিকে পর্যন্ত চিরতরে বিলীন করে দিতে হবে। কোরেশ নেতা আবু সুফিয়ানের যেই কথা, সেই কাজ। সংগৃহীত হল সেই বিশাল বাহিনী। কেউ বলেন দশ হাজার, কেউ বলেন চব্বিশ হাজার। হিজরীর পঞ্চম সনে ৬২৭ খ্রীস্টাব্দে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বের হল ঐ অভূতপূর্ব বিশাল বাহিনী মদিনাকে শেষ করতে। যেদিন আল্লাহর নবী জানতে পারলেন, তখন আর ছ' দিন বাকি বাহিনীর মদিনা পৌঁছতে।

মহানবী (সাঃ) আবু সালমার পরামর্শমতো মদিনার দক্ষিণ দিকে সালা পাহাড়ের নিকট পাঁচ গজ চওড়া ও পাঁচ গজ গভীর একটি খাল খনন করলেন। এবং কয়েকজনের ওপর ভার দিলেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। হযরত ওমর এই কাজে এই যুদ্ধে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা বর্ণনাতীত। একদিন প্রচণ্ড গতিতে শত্রুকুল এগোতে থাকলে তিনি একাকী যেভাবে শত্রুর গতিরোধ করেন, তা মহাবীরের বীরত্বকেও ম্লান করে দেয়। একবার অতি ব্যস্ততার জন্য তাঁর আশরের (বৈকাল) নামাজ যায় যায় সময়ে মহানবীকে বললেন, এখনও আশরের নামাজ পড়া হয়নি। তখন মহানবী বললেন, তাঁরও

তখন আশর পড়া হয়নি। এই যুদ্ধে যে কয়েকজন মহান সাহাবী অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে মদিনাকে রক্ষা করেছিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁদের অন্যতম। [বিস্তারিত দ্রষ্টব্য—মহানবী, পরিখার যুদ্ধ, ষষ্ঠদশ অধ্যায়।]

ঐতিহাসিক হোদাইবিয়ার সন্ধি ও হযরত ওমর (রাঃ):

হিজরীর ষষ্ঠ সনে ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে মহানবী (সাঃ) হজের উদ্দেশ্যে সাহাবীদের দিয়ে মক্কার কাবার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মক্কা হতে কিছু উত্তরে হোদাইবিয়া নামক স্থানে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মক্কার কোরেশগণ ভাবলেন, মহানবী মক্কা বিজয় করতে আসছেন, তাই তারা সর্বশক্তি দ্বারা বাধা দিল। মহানবী তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের কথা তাদের বারবার বোঝাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা কিছুতেই বুঝল না। তখন সাহাবীগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মহানবীর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মহানবী ওমরকে মক্কা গিয়ে সকলকে মূল উদ্দেশ্যটাকে বোঝাবার জন্য নির্দেশ দিলে ওমর বললেন—মক্কাতে বর্তমানে তাঁর নিকট আত্মীয় কেউই নেই, বরং সকলেই তাঁর ভীষণ শত্রু, সুতরাং তাঁর কথায় ভাল কাজ হবে না। মহানবী ব্যাপারটা বুঝে হযরত ওসমানকে পাঠালেন।

অতপর বহু জলঘোলা হওয়ার পর একটি সন্ধি হল। এই সন্ধিতে যে শর্তগুলো হয়েছিল, তাতে ওমর প্রচণ্ড বাধা দিলেন। পরে একমাত্র মহানবীই তাঁকে শান্ত করতে পেরেছিলেন। এই সন্ধির ফলে মাত্র দু' বছরেব মধ্যে এত মানুষ মুসলমান হয়েছিল যে, বিগত ১৮ বছরেও এত মানুষ হয়নি। তাই পবিত্র কোরআনে এই সন্ধিকে 'প্রকাশ্য বিজয়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ৪৮:১। যার নামে একটি সুরাও অবতীর্ণ হল— সূরা ফাতহ্: ৪৮।

এই সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের বিবাহ সম্পর্কে খুব একটা কড়াকড়ি ছিল না। এরপরই কোরআন নাজেল হল—"তোমরা মোশরেক নারীকে বিবাহ করবে না, যতক্ষণ না সে ঈমান আনে।" ২:২২১। অতঃপর ওমর তাঁর দুই মোশরেক স্ত্রী কারিবা ও উম্মে কুলসুম বিনতে-জরুলকে তালাক দেন। এবং আফলাহার কন্যা জামিলাহকে বিবাহ করেন। [বিস্তারিত দ্রঃ—মহানবী, সপ্তদশ অধ্যায়।]

খাইবার বিজয় ও হযরত ওমর (রাঃ):

সপ্তম হিজরীতে (৬২৯ খ্রীঃ) খাইবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বানু নাজির গোত্র নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মদিনা হতে নির্বাসনদণ্ড লাভ করে খাইবারে আশ্রয় নিয়ে পুনরায় মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি করতে থাকলে মহানবী খাইবার আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েই চোদ্দশো পদাতিক ও দু'শো অশ্বারোহী সৈন্য-সহ খাইবারে হাজির হন। এই যুদ্ধে প্রথম আবুবকর ও পরে ওমর যুদ্ধ পরিচালনার ভার পান। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর এই অঞ্চলের 'সামমাগ' নামক একটি ভূখণ্ড ওমরের ভাগে পড়লে ওমর সেটিকে

"ফি-সাবিলিল্লাহ" বা 'আল্লাহর পথে দান' করেন। ওমরের এই ঐতিহাসিক দানটিই পরবর্তীকালে মুসলিম জাহানের 'ওয়াকফের' প্রথম মূল দলিল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই বছর ওমর মহানবীর নির্দেশে মাত্র ত্রিশজন সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহী হাওয়াজিনদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাঁরা বিনা যুদ্ধেই অঞ্চল ত্যাগ করে। [বিস্তারিত মহানবী—অষ্টাদশ অধ্যায়।]

বিখ্যাত মক্কা বিজয় ও ওমর:

অষ্টম হিজরীতে (৬৩০ খ্রীঃ) মহানবী বিনা বাধায় মক্কা বিজয়লাভ করেন। এই বিজয়ের পিছনে কোরেশদের দুর্বুদ্ধিই ছিল একমাত্র কারণ। বিখ্যাত হোদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করার জন্যই মহানবী কোরেশদের বিরুদ্ধে অভিযান ও আক্রমণ করতে বাধ্য হন। রমজান মাসে দশ হাজার মানুষের একটি অভিযান-সহ মহানবী মক্কার অতি নিকটে হাজির হয়ে বিরাটাকারে মশাল জ্বালার নির্দেশ দেন। আবু সুফিয়ান তাঁর কতিপয় সঙ্গী-সহ ঐ আগুন দেখতে মক্কার বাইরে আসেন, এবং আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে আব্বাস তাঁকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মহানবীর নিকট গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে পরামর্শ দেন, এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মহানবীর নিকট যাত্রা করলে পথিমধ্যে ওমরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। ওমর আর কালবিলম্ব না করেই মহানবীর নিকট হাজির হয়েই ঐ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর আবু সুফিয়ানের প্রাণদণ্ডের জন্য পরামর্শ দেন। এমনকি ওমর মহানবীকে অনুরোধ করেন যে, ইসলামের চিরশত্রু আবু সুফিয়ানের প্রাণদণ্ডের ভার যেন তাঁকেই অর্পণ করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আব্বাস ও ওমরের মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা আরম্ভ হয়। তখন আব্বাস ওমরকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে ওমর, আবু সুফিয়ান যদি তোমার গোত্রভূক্ত হতেন, তাহলে তুমি কি তাঁর প্রাণদণ্ডের জন্য এভাবে সুপারিশ করতে। উত্তরে ওমর বলেন, "যেদিন তুমি ইসলাম বরণ করেছিলে, সেদিন আমি এত আনন্দ পেয়েছিলাম যে, স্বয়ং আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম বরণ করলেও এত আনন্দ পেতাম না।" শেষ পর্যন্ত দয়ার নবী মহানবী আবু সুফিয়ানের নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাঁকে জীবন ভিক্ষা দান করেন।

অতঃপর মহানবী ওমরকে সঙ্গে নিয়ে সাফা পাহাড়ের ওপর উঠে দূরবর্তী মানুষকে নিকটবর্তী করলেন, অপরকে আপন করলেন, মানবতার জয় ঘোষণা করলেন, মনুষ্যত্বের জয় প্রচার করলেন, শত্রু-মিত্র সকলের জন্যই নিরাপত্তা ঘোষণা করলেন। তখন মানুষ দলে দলে মহানবীর হাতে হাত দিয়ে বায়াত বা শপথ করতে আরম্ভ করলেন। তখন মহানবী ওমরকে নির্দেশ দিলেন—মহানবীর অনাত্মীয়া রমণীগণকে বায়াত করাতে। কেননা তিনি কোন অনাত্মীয়া রমণীর হস্তস্পর্শ পছন্দ করতেন না। এই মক্কা বিজয়ে মহানবীর পাশে ওমরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মক্কা বিজয় ছিল পবিত্র কোরআনেরই ভবিষ্যদ্বাণী। ৪৮: ৩,২৭, ৯০:১-২।

তাবুক অভিযানে ওমর :

নবম হিজরী (৬৩১ খ্রীঃ)। তদানীন্তন বিশ্বে রোমান-শক্তি ছিল সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি। তারা চেয়েছিল ইসলামকে ও ইসলামের নবীকে চরম এক শিক্ষা দিয়ে জগৎ থেকে চিরতরে বিদায় দিতে। তাদের এই ভাব যখন প্রবল ভাবে জেগে উঠল, তখন মহানবী নিরুপায় হয়েই ঐ বিশাল শক্তির মোকাবিলা করার জন্য সকলের নিকট আহ্বান জানালেন। কেননা বছরটি ছিল দুর্ভিক্ষের। দেশে ছিল নিদারুণ অভাব। তখন যে যা পারলেন মহানবীকে সাহায্য করলেন। ওমর তাঁর যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক এনে মহানবীর নিকট হাজির করলেন। এবং আবুবকর তাঁর যাবতীয় সম্পদের যা কিছু ছিল, সবই মহানবীর নিকট এনে হাজির করলেন। মহানবী আবুবকরকে জিজ্ঞাসা করেন, ঘরে কি রেখে এসেছেন পরিবারবর্গের জন্য ? উত্তরে আবুবকর বলেন, "আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসুলকে। তাঁরাই যথেষ্ট জানি।" এই কথা শুনে ওমর বলেন, "ইসলামের সেবায় আবুবকরকে কেউই অতিক্রম করতে পারেনি, এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।" [বিস্তারিত দ্রঃ ২১ অধ্যায় মহানবী]

মহানবীর পারিবারিক জীবনে ওমর :

একবার পারিবারিক কারণে মহানবী একমাস পর্যন্ত তাঁর সকল স্ত্রী হতে পৃথক ছিলেন। এই কথা যখন ধীরে ধীরে সকল সাহাবী জানতে পারলেন, তখন তাঁদের মনকষ্টের কোন সীমা ছিল না। কিন্তু কেউই সাহস করে মহানবীকে জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না মূলত কি ঘটেছে। সকলেরই ধারণা—একমাত্র অতি সাহসী ও অতি আপনজন ওমরই রহস্যের ভেদ উদঘাটন করতে পারেন। ওমরও এই অস্বস্তিকর পরিবেশে অস্থির হযে উঠলেন। পরে একদা সাহসে ভর করেই মহানবীর গৃহের দরজাতে হাজির হয়ে মহানবীর সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন। যখন সাক্ষাৎ পাওয়ার কোন লক্ষণই দেখতে পেলেন না, তখন সজোরে বলে উঠলেন—"আমি আমার কন্যা হাফসার, (মহানবীর স্ত্রী) জন্য এখানে আসিনি। আমি আপনার জন্যই এখানে এসেছি। প্রয়োজন হলে, আল্লার শপথ, আমি আপনার জন্য আমার কন্যার শিরশ্ছেদ করে দেব।" এই কথা শোনা মাত্র মহানবী ওমরকে ভেতরে ডাকলেন। এবং ওমর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি তাঁর সকল স্ত্রীকেই তালাক দিয়েছেন। তখন মহানবী উত্তরে বলেন—"কখনও না"। এবার ওমর আবার সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি এই সংবাদ এখনই মসজিদে নববীতে গিয়ে সকল সাহাবীগণকে জানিয়ে তাঁদের দুশ্চিন্তা দূর করতে পারি ! মহানবী উত্তর দিলেন—। 'পার'। [বিস্তারিত মহানবী, একবিংশ অধ্যায়]

মহানবীর ওফাত ও ওমর :

আমরা একটি ঘটনা হতে যথেষ্ট ভাবেই বুঝতে পারি যে, মহানবী ওমরের

জ্ঞান-গরিমাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দান করতেন। তখন মহানবীর ওফাতের মাত্র কয়েকদিন বাকি। তিনি তাঁর রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেই মুসলমানদের ইঙ্গিত করলেন—"তোমরা কাগজ কলম নিয়ে এস, আমি তোমাদের শেষ শিক্ষা দিয়ে যাই, যাতে তোমরা বিপথগামী না হও।" তখন সাহাবীদের কেউ কেউ কাগজ আনার জন্য প্রস্তুত হল, বাকি সাহাবীগণ কাগজ না আনার জন্যই তাগিদ দেন, তাঁরা বলেন—এখন মহানবীর কষ্ট হচ্ছে, এসময় তাঁকে আর বিরক্ত করা ঠিক নয়। আমাদের নিকট কোরআন আছে, কোরআনই আমাদের চলার জন্য যথেষ্ট। ওমরের মুখ হতে এই কথাগুলো মহানবী শোনার পরই সকলকেই তাঁর ঘর হতে চলে যেতে নির্দেশ দেন। মহানবী ওমরের কথাটিকেই মেনে নিলেন। অর্থাৎ তিনি জানিয়ে দিলেন কোরআনই মুসলমানদের জন্য চলার পথের পাথেয় রূপে যথেষ্ট।

মহানবীর পরলোকগমন ও ওমরের ঘটনা ইসলাম জগতে কিংবদন্তী রূপ লাভ করেছে। মহানবীর ওফাতের সংবাদ শোনা মাত্র ওমর জ্ঞানহারা হয়ে গিয়েছিলেন। পরে যখন চেতনা ফিরে পেলেন, তখনও প্রকৃত জ্ঞান ফিরে পাননি। তাই মুক্ত তরবারি হাতে ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি বলবে, মহানবী মারা গেছেন, তার গর্দান নেওয়া হবে। পরে আবুবকরের আগমনে ও তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ওমর প্রকৃত জ্ঞান ফিরে পান। [বিস্তারিত মহানবী দ্রষ্টব্য]।

ইসলামের খেলাফত ও ওমর:

মহানবীর পরলোক গমনের পর কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন, একথা মহানবী জানিয়ে যাননি। তিনি জনগণের ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন জনগণের নেতা নির্বাচনের দায়িত্ব। তাই তাঁর পরলোক গমনের পর তিন শ্রেণীর মানুষের পক্ষ হতে খলিফা হওয়ার দাবি ওঠে। প্রথম আনসারগণ, দ্বিতীয় মুহাজেরিনগণ, তৃতীয় বানু হাশিম গোত্র। এই শেষ গোত্রের নেতা ছিলেন বিবি ফাতেমার স্বামী আলী। তিনি ছিলেন মহানবীর চাচাতো ভাই, আবার 'জামাতা'। ইসলামের তাসাউফের জড় স্বরূপ, কেননা স্বয়ং মহানবী বলেছিলেন—"আনা মাদিনাতুল ইল্‌মে, আলী বা' বুহা" — আমি জ্ঞানের শহর, এবং আলী তার দরজা। এই কথার দ্বারা বোঝা যায়—আলী ছিলেন পারলৌকিক জ্ঞানের স্বত্বাধিকারী, ঐশীজ্ঞানের স্বত্বাধিকারী। সুতরাং ঐশীজ্ঞানের স্বত্বাধিকারের বা উত্তরাধিকারের মতো একটি মহৎ বা স্বর্গীয় অধিকার মানুষের ইচ্ছাধীন হতে পারে না। এই যুক্তিতে বানু হাশিম বা বিবি ফাতেমার দাবি ছিল আলীই একমাত্র খেলাফতের যোগ্যতম অধিকারী মানুষ।

উপরোক্ত তিন গোত্রের কলহ যখন ইসলামকেই ক্ষতবিক্ষত করার পথে, তখন ওমর বিচলিত হয়ে উঠলেন কেবলমাত্র ইসলামের ভবিষ্যৎ চিন্তায়,

খেলাফত নিয়ে মোটেই নয়, কোন গোত্রকে নিয়েও নয়। তাঁর বিবেচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র ইসলামের মঙ্গল। ওমরের সমগ্র জীবনে এইটাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি জীবনে একটি বারও মহান লক্ষ্যচ্যুত হননি। যখনই যেখানে যে কাজ করেছেন—তার পেছনে বা সম্মুখে ছিল ইসলামের সেবা, ইসলামের কল্যাণ-চিন্তা, ইসলামের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। এই মানসিকতাতেই তিনি আবুবকরের নাম প্রস্তাব করেন ইসলামের প্রথম খলিফা রূপে।

এখান থেকেই মহানবী-তনয়া, রসুল-নন্দিনী ইসলাম জগতের শ্রেষ্ঠতমা রমণী ফাতেমা জোহারার সাথে আবুবকর ও ওমরের বিরোধের প্রথম সূত্রপাত। এমনকি বিবি ফাতেমা নানা কারণে জীবনের শেষদিন পর্যন্তও আবুবকরের প্রতি বিমুখ ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল আবুবকরই তাঁকে তাঁর পিতৃ-সম্পদ হতে বঞ্চিতা করেছেন, এবং স্বামী আলীকে খেলাফত হতে বঞ্চিত করেছেন। যদিও আমরা একথা সবিস্তারে আবুবকর অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি, তবুও বিবি ফাতেমা আবুবকরের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। আবুবকর বারবার বিনীতভাবেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন নবী ও রসুলগণের কোন উত্তরাধিকার থাকে না, জগৎ মেনে নিয়েছে যে, আবুবকর কাউকেই বঞ্চিত করার জন্য 'ফিদাক' নামক মহানবীর বাগানটিকে রাজ-কোষাগারের সম্পত্তিতে পরিণত কবেননি। ইসলামের নীতিকে শুধু মাত্র অনুসরণ করার জন্যই এটা কবেছিলেন। তবুও মহানবী-তনয়া কেন যে ঐ সিদ্ধান্তটি মেনে নেননি, সে কথা আমবা কিছুতেই আজও অনুধাবন করতে পারলাম না। এই ব্যাপারে আমাদের মনে হয় মূল রহস্যটি অন্য কোথাও গভীরে লুকিয়েছিল, বা আছে যা ইতিহাসে বা সাধারণভাবে ধরা পড়ছে না, বা পড়েনি। কিন্তু দু'জনের কাউকেই দোষাবোপ করার মতো মানসিকতা মুসলিম জাহানের কারোরই নেই। এককথায় বলতে পারি—এটা ছিল হয়তো বা কোন ভুল বোঝাবুঝির নিকৃষ্ট ফসল। তবে আবুবকর খলিফা হিসাবে নবী-নন্দিনীকে খুশি করার জন্য বা একটি শুভ মীমাংসাতে আসার জন্য বিকল্প কিছু করতে পারতেন।

অতঃপর এই প্রসঙ্গে এখানে যদি ওমরের কথা তুলতে হয, তাহলে বলতে হবে, ওমরই ছিলেন মূল ব্যক্তি, যাঁর প্রচেষ্টায় ও প্রস্তাবে আবুবকর ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন। এখানে ওমরও বিবি ফাতেমার চোখের মণি থেকে চোখের বালিতে পরিণত হলেন। আমরা পূর্বেই বলেছি, এই কাজের পশ্চাতে ওমরের কোন ব্যক্তিগত দিকই ছিল না। তিনি কেবল মাত্র ইসলামের কথা চিন্তা করেই এ কাজটি করেছিলেন। দূরদর্শী ওমর যেন তড়িৎবেগে বুঝতে পেরেছিলেন যদি অতি সত্বর এই কাজটিকে সমাপ্ত করতে না পারি, তাহলে ইসলাম জাহানের ভাবী ও ভবিষ্যৎ কি হবে বলা যায় না। তাই তিনি আবুবকরকে যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করেই প্রস্তাব রেখেছিলেন,

প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এখানে ওমরও কারো প্রতি বিরাগভাজন হয়ে বা কাউকে অতিরিক্ত ভালোবেসে এ কাজটি করেননি। তিনি চিরদিনই বিরাগভাজন ছিলেন ইসলামের দুষমনদের প্রতি, এবং চিরদিনই ভালোবেসেছিলেন ইসলামকে। এ কথাটিকে অস্বীকার করার মতো মুসলিম জাহানে কেউই নেই।

আমাদের মনে হয়, সেদিন যদি ওমরের ন্যায় নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব, বিরল ব্যক্তিত্ব এই কাজটিকে এইভাবে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে না দিতেন, তাহলে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই ঘটানার (৬৩২ খ্রীঃ) দীর্ঘ ২৯ বছর পর ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে যে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, যে হানাহানি ও খুনোখুনি দেখা দিয়েছিল, তা হয়তো ঐ দিনেই দেখা দিত। তাহলে ইসলামের পরিণতি কি হতো! সেটা কি একবার ভাববর কথা নয়। কেননা ইসলাম তখনও সবেমাত্র শিশুবৃক্ষ। এবং তাকে একেবারেই মুড়িয়ে খাওয়ার জন্য তদানীন্তন দুই বিশ্বশক্তি—ইরান ও রোম আড়াই হাত জিহ্বা বের করে নেকড়ের ন্যায় ওত পেতে বসেছিল। সুতরাং হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা সম্পর্কে আমরা নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তে নিষ্কাম মনে যে কথাটি প্রাণভরে চিরদিন বারে বারে বলতে পারি—

এক যদি মহীয়ান—
তবে অন্য সে মহীয়সী,
এক যদি গরিয়ান—
তবে অন্য সে গরীয়সী। —

আমরা লক্ষ্য করছি ওমর চরিত্র চিরদিনই দুর্বার এবং দুর্লঙ্ঘনীয়। যখনই যেটাকে ভালো বুঝেছেন, তখনই সেটাকে অকৃত্রিম মনে প্রবল বেগে করে গেছেন। জগৎ-কৃত্রিমতা কোনদিনই ওমরের একটি স্নায়ুবিহীন লোমকেও স্পর্শ করতে পারেনি। ওমর ছিলেন এমনি একটি অকৃত্রিম মানুষ। তাঁর গতি ছিল চিরদিনই দুর্বার। সেখানে ছিলেন তিনি আপসবিহীন মানুষ। এই দুর্বারগতিতে ইসলামের প্রথম খেলাফতকেও তিনি সংগঠন করলেন। হয়ত বা আমরা কেউ কেউ বলবো, ওমর যদি সেদিন একটু ধীর ও স্থিরভাবে আলী ও ফাতেমাকে সঙ্গে নিয়ে কাজটি সমাধা করতেন, তাহলে এই জটিলতার ও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকত না। কথাটা খুবই সঙ্গত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, পরিবেশ ও পরিস্থিতি তখন এমনই হয়ে উঠেছিল, ধীর ও স্থির ভাবে কোন কিছুকে গ্রহণ করার মতো সুযোগ ও সুবিধা তিনি পাননি। ক্ষেত্রবিশেষে স্বয়ং মহানবীকেও এরূপ কাজ মাঝে মাঝে করতে হতো। যখন তিনি প্রথম মদিনায় পৌঁছালেন, তখন কালবিলম্ব না করেই আনসার ও মোহাজিরগণকে এক রসিতে বাঁধলেন, কোন মতবিরোধ ঘটার পূর্বেই মদিনার খ্রীস্টান ও ইহুদীগণকে অতি সত্বর একটি চুক্তিতে আনলেন। কেননা একবার

ভুল বোঝাবুঝি বা সংঘর্ষ বেধে গেলে কিছুই করা যায় না। ওমরের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল একদিকে, যে দিকে ছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল, যে দিকে ছিল পবিত্র কোরআন ও হাদিস, এবং মুসলমানগণ। এই পাঁচটিকে নিয়ে ছিল ইসলাম এবং এই ইসলামকে নিয়েছিলেন ওমর। তাঁর নিকট এই ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না।

সুতরাং মুসলমানগণ পরবর্তী অধ্যায়ে সুন্নি বা শিয়া হতে পারে, যা ইচ্ছা তাই হতে পারে। কিন্তু ইসলামের ক্ষতিকারক হতে পারে, এমন কিছু হওয়াটা কি ঠিক! কখনও না। তা যদি কেউ করেন, তাহলে পবিত্র কোরআনকেই অমান্য করা হয়, যখন আর কিছুই থাকে না। ৩:১০৩, ৪:১৪৬।

অন্তিম শয়নে আবুবকর ও খলিফা পদে ওমর:

আবুবকর অন্তিম শয়নে যে সমস্যাটি নিয়ে বারবার চিন্তা করেছিলেন, সেটি ইসলামের খেলাফত-চিন্তা। কারণ অতীতের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁব ছিল। তাঁর খেলাফত আমলে ওমর তাঁর প্রধানমন্ত্রী রূপে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই জন্যই আবুবকর বারবার চিন্তা করছিলেন ওমরকে ইসলামেব দ্বিতীয় খলিফারূপে পাওয়ার জন্য। তিনি এই সম্পর্কে সকলেবই সাথে আলোচনা আরম্ভ করলেন। একমাত্র তালহা ব্যতীত সকলেই আবুবকরেব সাথে একমত হলেন। অতঃপর খলিফা একটি অসিয়তনামা (শেষ নির্দেশ) লিখতে নির্দেশ দিলেন। লেখা সম্পূর্ণ হলে সকলকে শোনাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। সকলেই আনন্দের সাথেই অতি উৎফুল্ল চিত্তে ওমরকে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত করেন।

অতঃপর খলিফা আবুবকর ওমরকে কিছু উপদেশ দিলেন। সমাজ পরিচালনা সম্পর্কে, রাজ্য প্রশাসন সম্পর্কে, ধর্ম সম্পর্কে। সবার ঊর্ধ্বে ওমর ছিলেন বড়ই কঠিন প্রকৃতির মানুষ, তাই আবুবকর তাঁকে স্মবণ কবিযে দিলেন মহানবী ছিলেন, 'বিশ্বজগতের করুণাস্বরূপ,' একথা যেন খলিফা ওমর কোনদিনই ভুলে না যান। স্বয়ং আল্লাহ্ মহানবীর কোমল ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য কোরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। ওমর সঙ্গে সঙ্গে একথাগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করলেন—কিভাবে তাঁকে পরবর্তী জীবনে চলতে হবে।

৩:১৫৯, ২১:১০৭, ২৪:২৭-২৮, ৩৪:২৮।

ওমর ইসলাম জগতের দ্বিতীয় খলিফার গৌরবজনক গুরুদায়িত্ব লাভ করলেন সম্মানজনক সমাধানার্থে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজ্য-বিজয়ে বিজয়ী ওমর

রাজ্য ভাঙা-গড়াতে
পবিত্র কোরআনে বিশ্বাসী ওমর

"হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্
তুমি যাকে খুশি রাজত্ব দান কর,
এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও,
এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর;
তোমারই হস্তে সকল কল্যাণ,
নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।"

(কোরআন—সূরা ইমরান ৩:২৬।)

খেলাফতের উষালগ্নে ওমর :

হযরত ওমরের পূর্বে হযরত আবুবকর যখন খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তখন তিনিও ছিলেন ওমরের ন্যায় একজন ব্যবসায়ী। প্রথম দিকে রাজকোষ হতে কোন কিছু না নিয়েই বিনা বেতনে খেলাফত চালাতেন। পরবর্তীকালে কতিপয় সাহাবীর অনুরোধে এবং রাজকার্য পরিচালনার জন্য ব্যবসা করতে না পারায় বাধ্য হয়েছিলেন কিছু বেতন নিতে। ওমরের জীবনেও ঠিক একই ঘটনা ঘটল। কিন্তু খলিফা ওমর এতই কম পয়সা নিতেন যে, সংসারে প্রচণ্ড অভাব চলছিল। তখন কতিপয় বয়স্ক সাহাবী একত্রিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, খলিফাকে অনুরোধ করা হোক বেতন আরো কিছু বেশি নিতে। কিন্তু এই কথাটি খলিফাকে কে জানাবেন, এই দুঃসাহস কারোরই ছিল না। তখন স্থির হল মহানবীর স্ত্রী ও খলিফার কন্যা হাফসার মাধ্যমে এই অনুরোধটি খলিফার সমীপে পেশ করা হোক। কন্যা হাফসা সুযোগ ও সুবিধামতো পিতার নিকট বক্তব্যটি তুলে ধরলে পিতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন, কে বা কারা এই প্রস্তাবটি দিল। কন্যা হাফসা বিষয়টি চেপে গেলেন।

তখন পিতা কন্যাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—মহানবীর সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক কি ছিল? কন্যা উত্তরে জানান, তাঁর ঘরে মহানবীর দুটো সবুজ রংযেব কাপড় ছিল। তিনি জুম্মার দিনে কিংবা কোন বিদেশী রাজদূত বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে ঐ কাপড় পরতেন। এতদ্ব্যতীত কোন অন্য কাপড় তাঁর ছিল না। ওমর আবার প্রশ্ন করলেন—মহানবী কোন্ উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করতেন? উত্তরে কন্যা বলেন—তাঁরা আচালা যবের মোটা রুটি খেতেন। ওমর পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—তাঁর ভাল বিছানা বলতে কি ছিল? উত্তরে কন্যা বলেন—তাঁদের একটি পুরু কাপড় ছিল, গ্রীষ্মকালে ওটাকে ভাঁজ করে বিছাতেন, এবং শীতকালে অর্ধেকটা বিছাতেন, এবং বাকি অর্ধেকটা গায়ে দিতেন।

অতঃপর খলিফা ওমর সকলকে জানিয়ে দিলেন—"হযরত আবুবকর ও আমি মহানবীকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। তাঁরা আজ দু'জনেই দুনিয়া হতে চিরবিদায় নিয়েছেন, আমি যদি তাঁদের সাথে মিলিত হতে চাই, তাহলে আমাকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেই হবে। এবং আমি তা করবই। নচেৎ আমি তাঁদের সাথে মিলিত হতে পারবো না।"

তদানীন্তন বিশ্বে প্রতাপশালী সম্রাটগণও ওমরেব ভয়ে কম্পিত ছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রা, জীবনাদর্শ সকলকেই একদিকে যেমন মহা বিস্ময় বোধ করিয়েছিল, অন্যদিকে ঠিক তেমনি মহামানবের ধারেকাছে যেতেও মানব মাত্রেই সতর্ক হয়ে উঠত। এমনি ছিল তাঁর জীবন মহিমা। মানুষ অহরহ লক্ষ্য করত, তাঁর জামাতে কতকগুলোই তালি দেওয়া থাকত। অনেক সময়

তিনি মসজিদে আসতে কিছু বিলম্ব করতেন, পরে সকলেই তাঁর বিলম্বের কারণটি জানতে পেরে সম্মানে ও শ্রদ্ধায় আপন আপন চোখের অশ্রুবরণ করতে পারেননি। একটি মাত্র জামা থাকার জন্য, সেটিকে ধুয়ে দিলে, বাইরে আসতে একটু বিলম্ব হতো। কি মহান জীবন!

একদিন খালিফা আহারে বসেছেন, এমন সময় সাহাবী উতবা বিন আবি সারবাদ খলিফার সাক্ষাতার্থে হাজির হলে তিনি তাঁকে ভেতরে ডেকে নিলেন। এবং তাঁকে খলিফার সাথে আহার করতে বললে তিনি খলিফার সাথে আহার শেষ করে খলিফাকে অনুরোধ করলেন—আটা চেলে নিতে আপনার কি কোন আপত্তি আছে? উত্তরে খলিফা বলেন—আরবের একটি মানুষও যতদিন অভাবের তাড়নায় আচালা রুটি খাবে, আমি তার সঙ্গে থাকবো। আমি আল্লাহর নিকট এই শক্তিই কামনা করেছি।

হযরত আবুবকর জীবিতকালেই ইরাক ও সিরিয়া প্রান্তে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বীরবর খালিদ ইরাক প্রান্তে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, কিন্তু সিরিয়া প্রান্তে বিশাল রোমক বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে নগণ্য সংখ্যক মুসলিম বাহিনী যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে আত্মবিশ্বাস ও মনোবল হারিয়ে ফেললে খলিফা আবুবকর মহাবীর খালিদকে তৎক্ষণাৎ সিরিয়া প্রান্তে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেনাপতি খালিদ খলিফার নির্দেশকে মাথা পেতে নিয়ে সিরিয়া প্রান্তে গমন করে ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে বিশাল রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করেন।

শাহাদতের সেই মহাক্ষণ:

পবিত্র মাস রমজান, পবিত্র দিন শুক্রবার, পবিত্র ক্ষণ ফজর নামাজ, দিনের শুভারম্ভ, তখনও ভোরের অন্ধকার বিরাজমান, তখনও কোন পাখির কিচিমিচি ভোরের সঙ্গীত শুরু করেনি। তখন দিনের আলো কাউকে চিনতে দেয়নি। তখন প্রভাত সমীরণ সৃষ্টিলোকে প্রবাহিত হয়নি। তখনও দিনের রবি তার আগমনের পূর্বাভাসে পূর্বদিগন্ত আলোকিত করে তোলেনি। তখনও অমাযামিনীর অন্ধকারে ধরা আচ্ছন্ন, কেবল আমিরুল মোমেনীন প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত, তিনিই যেন তাঁর শুভ প্রার্থনার মাধ্যমে প্রভাতকালীন সকল কাজের দ্বারোদঘাটন করবেন। আপন বাড়ি হতে বের হয়ে পদক্ষেপ রাখলেন পবিত্র মসজিদ প্রাঙ্গণে, ইসলাম জগতের শেষ খলিফা মসজিদ প্রাঙ্গণে সবেমাত্র কয়েক পা ফেলেছেন, আলো-আঁধারের মাঝে, হেনকালে ঐ তিন মহা পাপাত্মা আব্দুর রহমান, আশ্য়াস ও শাবীব নামাজীর বেশে চোরের মত নিজদের চিরস্থায়ী ভাবে আপন হাতে আপনাদের চির ঘৃণিত ও চির নিন্দিত হয়ে চির বন্দিত মানুষটিকে লক্ষ্য করে, ইহকাল ও পরলোক সকল কালকে ধূলিসাৎ করে, মহাকালের মহাকলঙ্কটিকে আপন আপন কপালে তুলে নিয়ে এক সাথে তিনটি অভিশপ্ত মানব জাহান্নামের অতল আগুনে ঝাঁপ দিল।

তিনটি আরবীয় তরবারি এক সঙ্গে চমকিয়ে, ঝলসিয়ে ও গর্জিয়ে উঠল শেরে খোদার মাথার ওপর। সমগ্র জীবনে এই প্রথম ও শেষ, শেরে খোদা তরবারির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অভিশপ্ত আশয়াস লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, ঘৃণিত শাবীব আঘাত হানল, নিদ্রিত জীব আব্দুর রহমান আঘাতপ্রাপ্ত, রক্তাক্ত, ভূপতিত আল্লাহর সিংহকে কপালে এত জোরে আঘাত হানল, মস্তকের গভীর প্রান্ত পর্যন্ত তরবারি সঞ্চারিত হলে শেরে খোদা সেই সহজাত সিংহবিক্রমেই বলে উঠলেন—"আল্লাহর কসম, আজ আমি কৃতকার্য, ইসলামের খেদমতে সবকিছুই দিয়েছিলাম, একটি শুধু বাকি ছিল—প্রাণ, তাও আজ অকাতরে অবলীলায় দিলাম।"

একটি নিকৃষ্ট জীবঃ

তিনজনের একজন ঘাতক আশয়াস পালাতে সক্ষম হলো, শাবীব ওখানেই জনগণের রোষানলে প্রাণ হারালো। শেষ ঘাতক আব্দুর রহমান তরবারি ঘুরিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে বীর মুগিরা ইবনে নওফেল দুরাচরকে কম্বল ছুঁড়ে ধরে ফেলল। এবং সজোরে মাথার ওপর তুলে আছাড় মারল। আহত খলিফাকে গৃহে আনা হলো। আততায়ীকে সম্মুকে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"হে আল্লাহর দুষমন, আমি কি কোনদিন তোর কোন উপকার করেছি?" উত্তর—"বহু উপকার করেছেন।" খলিফা—"আজ তুই এই কাজ করলি? উত্তর—"আমি চল্লিশ দিন যাবৎ আমার এই তরবারিকে শান দিয়েছি, এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি — এর দ্বারা তোমার একটি নিকৃষ্ট জীব হত্যা হোক।" খলিফা—"আমি মারা গেলে আমার নির্দেশেই এই আপত্তি আছে? উত্তরে খলিফা বলেন — আরবের একটি মানুষও যতদিন অভাবের তাড়নায় আচালা রুটি খাবে, আমি তার সঙ্গে থাকবো। আমি আল্লার নিকট এস শক্তিই কামনা করেছি।

হজরত আবুবকর জীবিতকালেই ইরাক ও সিরিয়া প্রান্তে বিশাল রোমান বাহিনীর সাথে সম্মুখসমরে নগন্য সংখ্যক মুসলিম বাহিনীযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে আত্মবিশ্বাস ও মনোবল হারিয়ে ফেললে খলিফা আবুবকর মহাবীর খালিদকে তৎক্ষণাৎ সিরিয়া প্রান্তে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেনাপতি খালিদ খলিফার নির্দেশকে মাথা পেতে নিয়ে সিরিয়া প্রান্তে গমন করত ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে বিশাল রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদের অবদান ও অপসারণ-পদচ্যুতি

খালিদের অবদান:

ইসলামের বীরত্বের ইতিহাসে যে মানুষটি জগৎ সভায় অদ্বিতীয় স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনিই বর্তমান জগতের একমাত্র অজেয়

বীর মহাবীর খালিদ। আরবের কোরেশ বংশে এই ক্ষণজন্মা বীরের জন্ম। হিজরীর ষষ্ঠ সাল অর্থাৎ ৬২২+৬=৬২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্বয়ং মহানবীর বিরুদ্ধে ছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয়, তার মূলে ছিল মহাবীর খালিদের বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও রণকুশলতা। তিনি তখন আবু সুফিয়ানের দক্ষিণ হস্ত। বিখ্যাত হোদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ও আমর বিন আল আস ইসলাম গ্রহণ করেন। বীর খালিদ জীবনে কোথাও কোন যুদ্ধেই পরাজিত হননি।

অনেকেরই ধারণা, ইসলামের বিজয় গৌরবের মূলে আছে মহাবীর খালিদেব অসামান্য অবদান। ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়া প্রান্তে মুতার যুদ্ধে তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করে মুসলিম বাহিনীর মান-সম্মান বক্ষা করে মহানবীর অমোঘ ইচ্ছাকে রূপদান করেছিলেন, সে কথার কোন অবধি নেই। যার ফলে স্বয়ং মহানবী তাঁকে এই মহাবীরত্বের জন্যই 'সাইফুল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর তরবারি' নামে ভূষিত করেন। ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে মক্কা বিজয় ও দামাতুল জাদালের খ্রীস্টান রাজা উখাইদার বিরুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তা ইতিহাস কোনদিনই ভুলবে না। ৬৩১ খ্রীস্টাব্দে নাজরানের হারিস গোত্রের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার মূলে খালিদের যে বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা, ইসলামের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় ঘটনা। মহানবীর সময় যখনই যেখানে তিনি পা দিয়েছেন, সেখানেই ইসলামের সোনার ফসল দেখা দিয়েছে। ইসলামের সেবায় তিনি নিজেকে এমনভাবে নিযুক্ত করেছিলেন, স্বয়ং মহানবী নিজেই মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এবং এই সূত্রেই আবুবকরও তাঁকে খুবই ভালবাসতেন, কেননা আবুবকর ছিলেন—মহানবীর জীবনছায়া। জীবন যা করত, ছায়া ঠিক সেটাকেই অবলম্বন করত। হযরত আবুবকরের যুগে ইসলামের মধ্যগগণে আবুবকর যখন সূর্যসম, মহাবীর খালিদ তখন চন্দ্রসম সম্মান লাভ করছেন। মহানবীর পরলোক গমনে ইসলামের মহাতরী যখন ঝড়-ঝটিকার মহাসমুদ্রে আন্দোলিত, প্রবল ঝঞ্ঝা যখন তাকে অতল দেশে ডুবিয়ে দিতে চায়, বিদ্রোহীদের মহা রণহুঙ্কার যখন তাকে ধরার মাটি থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করতে চায়, এই মহাদুর্দিনে, দুঃসময়ে মহাবীর খালিদ তখন নিবিড়ভাবে আবুবকরের পাশে দণ্ডায়মান। কোথাও ভণ্ডনবীদের উত্তাল তরঙ্গ, কোথাও প্রতারক প্রবঞ্চকদের প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা, কোথাও স্বধর্মত্যাগীদের সীমাহীন বিড়ম্বনা খলিফা আবুবকরকে যেন পাগল করে তুলতে চায়, এই বিরামবিহীন বিশাল বিপদ সমুদ্রে আবুবকর যেন বলে উঠলেন :—

বাড়ুক বিপদ স্রোতে সাগরের জল
সাঁতার কাটিতে দাও সন্তরণ বল।

খলিফা আবুবকরের নির্দেশে আল্লাহর তরবারি খালিদ একের পর এক বিপদে সিংহবিক্রমে ঝাঁপ দিলেন, কোথাও ব্যাঘ্রবিক্রমে গর্জন করে উঠলেন।

সকল ভণ্ডনবী, সকল প্রতারক, সকল বিদ্রোহী সেদিন খালিদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে ধরার মাটি থেকে একেবারেই মুছে গেল। ঐ সমস্ত অনাচার, ব্যভিচার, বিদ্রোহ ইত্যাদি দেখে খালিদ-কণ্ঠে যেন বেজে উঠেছিল—

হাঁটু জলে ক্ষুদ্র পুঁটি লাফায় বেদম
রুই সে সাগর জলেও নীরব নিঝুম।

ঘরে ছিল নানা বিদ্রোহ, বাইরে ছিল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের অপরিমিত রণহুঙ্কার। মহাবীর খালিদ এই দুজনকেই দিলেন সমুচিত জবাব। ৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে উলিসের যুদ্ধে পারস্য বাহিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে হীরা দখল করেন। এবং ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে আজনাদাইনের যুদ্ধে বিশাল রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে এক ঝলকে বিশ্বখ্যাতি ও বিশ্ব-বীরের গৌরব অর্জন করেন।

ঐতিহাসিক ভন ক্রেমার বলেন—"খালিদের বীরত্ব ও আবুবকরের বিচক্ষণতা না থাকলে রিদ্দা যুদ্ধে ইসলামের শত্রুগণ জয়লাভ করত।" স্বয়ং আবুবকর বলেন, "আর কোন মাতৃগর্ভ দ্বিতীয় খালিদকে গর্ভে ধারণ করবে না।" তিনি যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শেষ বীর।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে পদচ্যুতি: (৬৩৫ খ্রীঃ):

যুদ্ধ যখন প্রবলবেগে ধাবিত, দু'পক্ষই যখন জীবন-মরণ পণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অন্যপক্ষকে হারাবার জন্য। কার ভাগ্যে জয়মাল্য আসবে, কেউই জানে না। ঠিক এই মহাক্ষণে খলিফা ওমর খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্র তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ রূপে গ্রহণ করলেন খালিদের পদচ্যুতিকে। ফরমান পাঠিয়ে দিলেন খোদ রণাঙ্গনেই। ফরমান:—"খালিদ, আমার পত্র পাওয়া মাত্র তুমি সেনাপতির পদ হতে বরখাস্ত হলে। তোমার স্থলে আমি আবু উবায়দাকে সেনাপতি নিযুক্ত করলাম। আজ হতে তুমি তার অধীনে একজন সাধারণ সেনারূপে কাজ করবে।"

মহাবীর খালিদ পত্র পড়লেন, ধৈর্য ধারণ করলেন, যুদ্ধ যেমনভাবে পরিচালনা করছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই পরিচালনা করলেন, যুদ্ধে জয়ী হলেন। এইবার আবু উবাইদার হস্তে পত্র তুলে দিলেন, আপন শিরস্ত্রাণ তাঁর মাথাতে নিজ হাতে পরিয়ে দিলেন। ইসলামের 'খিদমতে' সাধারণ সৈনিকের বেশ ধারণ করলেন বিনা বাক্যে, বিনা চিন্তায়। জগতের ইতিহাসে মহাবীর খালিদ চিরদুর্লভ, কিন্তু তা অপেক্ষাও অতি দুর্লভ খালিদের এই ব্যবহার, এই ধৈর্য। এই মহারণাঙ্গনে মহাবীর খালিদ যদি একটি বার আবেগ বা উত্তেজনায় একটু বেঁকে বসতেন, তাহলে মহামানব ওমর ইসলামের আপাত শান্ত তরীকে কতখানি শান্ত রাখতে পারতেন, সে কথায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা তিনি যত বড়ই হোন না কেন, তিনিই একদিন আবুবকরের সময় ইসলামের

অঙ্গহানি করেই বিরোধীদের সাথে সন্ধির 'প্রস্তাব' দিয়েছিলেন খলিফাকে। যদিও খলিফা তা অগ্রাহ্য করেছিলেন।

খলিফা ওমরের এই কাজে তখন অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েই মহাবীর খালিদকে উত্তেজিত করতে থাকেন। কিন্তু বীর খালিদ শুধুমাত্র ইসলামের কথা চিন্তা করেই ঐ সমস্ত কথাকে কানে তোলেননি। তিনি ইসলামের সেনাপতির পদ অপেক্ষা ইসলামের সেবাকেই বেশি পছন্দ করেছিলেন। শুধু এই কারণেই নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। 'অনন্তর ধৈর্যই উত্তম'। কোরআন— ২: ১৫৩, ১৭৭, ৩: ২০০, ৮: ৪৬, ৬৬, ১১: ১১৫, ২৯: ৬০, ৭০: ৫। ১২:১৮।

এখানে আমরা লক্ষ্য করবো, প্রধানত কি কি কারণে একটি মহামানব একটি মহাবীরকে বরখাস্ত করলেন:

১। রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার পর যুদ্ধে জয় হেতু বহু ধন-সম্পদ সৈনিকদের হস্তগত হয়। তখন খলিফা ওমর সেনাপতি খালিদকে যুদ্ধলব্ধ ধনের হিসাব দিতে নির্দেশ দিলে খালিদ ইসলামের বিধিমতে তা দিতে অমান্য ও অস্বীকার করেন। কেননা তখনকার দিনে ইসলামের যুদ্ধনীতিতে ছিল—যুদ্ধলব্ধ ধনের এক-পঞ্চমাংশ সরকারকে দিতে হবে। এবং বাকিটা সৈনিকদের নিজস্ব সম্পদ।

২। সিরিয়া যখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে, তখন খালিদ একজন কবিকে ১০০০ দিনার পুরস্কার দেন, এতে খলিফা খুবই রুষ্ট হন। তখনকার দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বিখ্যাত কবিকে আনা হতো কেবলমাত্র সৈনিকদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার জন্য। এটা ছিল সেনাপতির কৌশল ও দায়িত্ব। খালিদ সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এমনকি তিনি কবিকে রাজকোষ হতে কোন টাকাও দেননি, বরং নিজস্ব টাকা হতেই দিয়েছিলেন, তাই খলিফার নিকট জবাবদিহির কোন প্রয়োজন বোধ করেননি।

৩। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি খালিদ কোন কোন সময় অত্যন্ত নিষ্ঠুর নীতি প্রয়োগ করতেন। খলিফা এটাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন স্বয়ং মহানবী বদরের যুদ্ধে বন্দীদের প্রতি কি অসাধারণ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু খালিদ নিষ্ঠুর হতেন অত্যান্ত প্রয়োজনের খাতিরেই।

৪। হিসাবে খালিদের মোট সম্পদ হওয়ার কথা ছিল ৬০,০০০ দিনার, কিন্তু হয়েছিল ৮০,০০০ দিনার। খলিফা ২০,০০০ দিনার বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ ধনকে এইভাবে হিসাবে আনা যায় না। কিন্তু সর্বকালে সর্ব সমাজে সৈনিকদের একটা স্বাধীনতা থেকেই যায়।

৫। রিদ্দার যুদ্ধে ইয়ারুবু গোত্রের দলপতি মালিক বিন নুয়াইরা পরাজিত

ও নিহত হলে তাঁর বিধবা পত্নী পরমা সুন্দরী লায়লাকে খালিদ পত্নীত্বে বরণ করায় খলিফা খুবই অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু অনেকেই বলেন লায়লা স্বেচ্ছায় খালিদকে পতিত্বে বরণ করেন। এর পশ্চাতে কোন নোংরামি ছিল না। এ প্রমাণও আছে, খালিদ তাঁর রণাঙ্গণকে আল্লাহর এবাদতগারে পরিণত করেছিলেন।

৬। খালিদ শৌর্যবীর্যে এবং জনপ্রিয়তায় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছালে খলিফার ভয় হল, 'মানুষ যেন সকল বিজয়ের মূল একমাত্র খালিদ, এই ভেবে আল্লাহকে ত্যাগ করে তাঁরই পূজা না করে বসে।' তাই তিনি জনগণের দৃষ্টি আল্লার দিকে ফেরাবার চেষ্টা করেন। কিছু নিরপেক্ষ বিবেকবান মানুষ খলিফার ঐ যুক্তিকে মেনে নেয় না, তাহলে কাজের ও মহান কর্মীর মূল্যায়ন কিভাবে হবে।

৭। সর্বশেষ কারণ রূপে দেখতে পাই, খলিফা ওমর আন্তরিক ভাবেই মহাবীর খালিদের বীরত্বকে, গৌরবকে, ঐতিহ্যকে, অতীতকে একদিকে রক্ষণ করার জন্যই এবং অন্যদিকে ইসলামকেও অক্ষুন্ন রাখার জন্যই মহাবীর খালিদের মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে বরখাস্ত করার মতো অতীব অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যেন নিখুঁত ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, সঠিক গন্ধও পেয়েছিলেন, দু'য়েরই ধ্বংস বা সমূহ ক্ষতি এগিয়ে আসছে— ইসলাম ও খালিদ। খালিদ ছিলেন সেনাপতি মহাবীর; যাঁর সামান্য অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তামাম সেনাবাহিনী আলোড়িত হয়ে ওঠে। তিনি যদি একবার শাসন-ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন, তাহলে আর কোন উপায়ই থাকবে না। খালিদের মনে এরূপ কোন ভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর বহু অনুসারীর মনে এটা দানা বাঁধছিল। অতীব বিজ্ঞ ওমরের দৃষ্টি এড়ায়নি— ঐ ভীষণ বস্তুটি। তাই তিনি একাজটা করে রক্ষা করলেন স্বয়ং খালিদকেই, সুসংহত করলেন ইসলামকে, আল্লাহ্মুখী করলেন মুসলিম জনগণকে, রুখে দিলেন রাজতন্ত্রকে, রক্ষা করলেন গণতন্ত্রকে। স্বয়ং মহানবীর সময়েও ভবিষদ্বাণী করতে ওমর ছিলেন সিদ্ধমানব, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং সেদিনে খালিদের বরখাস্ত বহু কিছুকেই রক্ষা করেছে, তবে কাজটা নীরবে নির্জনে ডেকে করলে কতই না ভাল হতো। এটাই ছিল মহানবীর নীতি।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি জিনিস আলোচনা না করে পারি না। নানা কারণে খলিফা খালিদকে পদচ্যুত করেছেন। আমরা এতে একমত। কিন্তু মহাজ্ঞানী খলিফার কাজের পদ্ধতিটা খলিফাকেই আপন বিবেকের তাড়না থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। তাই খালিদের মৃত্যুর পর খলিফা তাঁর সমাধিতে গিয়ে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করতে করতে গড়াগড়ি যান। এবং বারবার মৃত খালিদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। খলিফা তাঁর ন্যায়বিচারে ও দিব্য দৃষ্টিতে অনেক

কিছু দেখেই, অনেক কিছু ভেবেই খালিদকে ববখাস্ত কবেছিলেন, ঠিকই কবেছিলেন। কিন্তু ঐভাবে 'অতি তাড়াতাড়ি' ঐ ভীষণ বণক্ষেত্রেই ইসলাম জাহানেব 'সাইফুল্লাহ' ও একজন সম্মানিত সেনাপতিকে ঐভাবে সকলেব সম্মুখে ছোট কবে ববখাস্ত এবং 'আল্লাব মুক্ত তববাবিকে' খাপবন্দ কবাটাই একদিন খলিফাকে নীবব মনে ও নির্জনে কাঁদিয়ে তুলেছিল তাঁব আপন সিদ্ধান্তেব সত্ত্ববতা ও হঠকাবিতা। যেহেতু তাব ছিল একটি মহান হৃদয়।

নিজবে নিজেই কবন তিক্ত তিবস্কাব
এ হেন শাস্তি নাই শোক তুলনায়।

যদি কোনদিন মহা বিচাবকেব কাঠগড়ায় হযবত ওমবেব মতো ক্ষণজন্মা বিচাবককে দাঁড়াতে হয, তাহলে তাঁকে তাঁব এই কাজটিব জন্যই দাঁড়াতে হবে না, দাঁড়াতে হবে কাজটিব পদ্ধতিব জন্য, প্রযোগেব সত্ত্ববতাব জন্য। আব আল্লাহ্ যদি কোনদিন মহাবীব খালিদকে কোন অসীম পুবস্কাবে পুবস্কৃত কবেন, তাহলে তা কববেন তাব শুধু অসীম বাহাদুবেব জন্য নয, অসীম ধৈর্যেব জন্যও, যা তিনি ধাবণ কবেছিলেন হযাবমুকেব যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতে ববখাস্তেব ফবমান পেযেও। ১১ : ১১৫, ১২ : ১৮।

মহানবী বলেন "মানুষেব কার্যাবলী তাব আপন নিয়েত বা উদ্দেশ্যেব ওপব নির্ভব কবে।" এই দিক থেকে খলিফা ওমব মুক্ত পুরুষ। কেননা মনেব দিক থেকে, অন্তবেব দিক থেকে তাব কোন ত্রুটি নেই। অনিবার্য ভাবেই তাঁব উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, তিনি ছিলেন মহান, আজও মহান, চিবমহান।

কলমা নামাজ বোজা হজ ও জাকাত
সব কিছু পড়ে থাকে মন দেখে নাথ।
মনেব ফসল নয মানসিক ক্ষেত
দেখবে মহান প্রভু তোমাব নিয়েত।

কোবআন ২ : ১৭৭, ২৯ : ৪৫।

বিনা যুদ্ধে বিখ্যাত জেরুজালেম জয় (৬৩৭ খ্রীঃ) :

জেরুজালেমেব জয বিশ্ব ইতিহাসেব একটি অবিস্মবণীয ঘটনা। ইসলামেব প্রথম খলিফা আবুবকব সিবিযা বিজযেব জন্য চাবদিকে চাবজন সেনাপতিকে পাঠিযেছিলেন। সেনাপতি আমব বিন আস প্যালেস্টাইন প্রদেশ অধিকাবে আদিষ্ট হন। পববর্তীকালে আমব একেব পব এক দুর্গ অধিকাব কবতে কবতে খলিফা ওমবেব সময নাবলাস, লুদ, আমাওযাস ও বাযেত জাবিন নামক প্রসিদ্ধ শহবগুলো অধিকাব কবেন। আবাব ঐ চাবজন সেনাপতিব মধ্যে জরুবী কাবণে যখনই যাঁব প্রযোজন হতো একে অন্যেব সাহায্যার্থে সকলেই সত্ত্বব সেখানে গমন কবতেন; এইভাবে তিনি একেব পব এক আক্রমণ

করে ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুজালেম অবরোধ করেন, ইতিমধ্যে খ্রীস্টানগণ দুর্গ মধ্যে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু আমরের জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত অনুকূল হয়ে উঠল, যখন আবু উবাইদা সিরিয়ার শেষ সীমানাস্থ কিনিসিরিন অধিকার করে মহানন্দে জেরুজালেমে উপস্থিত হন। এই কারণেই জেরুজালেমের খ্রীস্টানগণের জয়ের শেষ বাসনা বিলীন হয়ে গেলে তাঁরা সন্ধির বা আত্মসমর্পণের একটি প্রস্তাব দেন যে, স্বয়ং খলিফা জেরুজালেমে উপস্থিত হয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। আবু উবাইদা তৎক্ষণাৎ খলিফার নিকট দূত মারফত প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে খলিফা তার শুরাকে (পরামর্শ সভা) আহ্বান করে জানতে চাইলেন—কি করা উচিত। ওসমান যাওয়ার জন্য মত ব্যক্ত করলেন, আলী অন্য মত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু সর্বশেষে অধিকাংশের মতে খলিফার যাওয়াটাই স্থির হলো। তখন ওমর আলীকে মদিনার ভার ন্যস্ত করে ষোল হিজরীতে জেরুজালেমের পথে যাত্রা করলেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দেখল, জানল, ইসলাম জগতের খলিফা কে বা কেমন। তখন তিনি এই পৃথিবীর অচিন্ত্যনীয় মহা শক্তিধর শাসক বা সম্রাট (বর্তমানে যে শক্তিধর পুরুষ প্রেসিডেন্ট)। যাত্রাকালে বাজল না কোন বাদ্য, ধ্বনিত হল না কোন তোপধ্বনি, সজ্জিত হল না পথিমধ্যে কোন তোরণ, সঙ্গে চলল না কোন বিশাল বাহিনী। এক হাতে সম্রাট, অন্য হাতে ফকির খলিফা ওমর চললেন আপন মনে একাকী। আল্লাহর আরশ্ ভূমি ও মানুষের আসন যেন এক হয়ে গেল। সঙ্গে একটি মাত্র উট, একটি মাত্র মানুষ। এ অপরূপ দৃশ্য, এ অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় ছবি পৃথিবী কোন দিন দেখেনি, এবং ভবিষ্যতেও দেখবে না। এ যেন কোন এক সিদ্ধ তাপসের তপোভূমিতে যাত্রা।

খলিফার নির্দেশমতো সিরিয়ার ঐ অঞ্চলের সমস্ত সেনাপতি জাবিয়া নামক স্থানে অপেক্ষা করতে থাকেন। তারা সকলেই খলিফাকে অভ্যর্থনা জানালেন। এবার খলিফার আসল রূপ প্রকাশ পেল। খলিফা অবলোকন করলেন—সেনাপতিদের বেশভূষায় যেন দারুণ জাঁকজমক এসে গেছে। তখন তিনি কয়েটি পাথরকুচি কুড়িয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, "কি আশ্চর্য, এত শীঘ্রই তোমাদের এত পরিবর্তন, খোদার কসম! তোমরা দু'শো বছর এভাবে চললে আল্লাহ্ তোমাদের বদলে অন্য কাউকে কর্তৃত্ব দান করবেন।" তখন সেনাপতিরা কিছুটা কারণ ব্যাখ্যা করলে খলিফা অনেকটা শান্ত হন। অতঃপর খলিফা আবার কোরআন থেকে কিছুটা পাঠ করলেন—"তারা ফেলে গেছে বহু বাগিচা, বহু ফোয়ারা, বহু বিহার ভূমি ও নানা সম্পদ, এককালে তারা এসব উপভোগ করতো। এমনি করে আমরা পরবর্তী জাতিকে এ সবের উত্তরাধিকারী করি।"

জাবিয়াহ্ বিখ্যাত ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তরে অবস্থান করছিল। তখন এটি ছিল মুসলমানদের শক্তিশালী সামরিক কেন্দ্র। বর্তমানেও দামেস্ক শহরের পশ্চিম দিক জাবিয়ার নাম বক্ষে ধারণ করে আছে। খলিফা ওমরের এখানে আসার প্রধানত দুটো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমটি, জেরুজালেমের খ্রীস্টানদের প্রস্তাবটিকে সম্মান দেওয়া, এবং দ্বিতীয়টি ছিল, ঐ সমগ্র অঞ্চলটিকে একবার স্বচক্ষে পরিদর্শন করা এবং নতুন সেনাধক্ষ্য আবু উবাইদার সাথে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা। ইতিমধ্যেই জেরুজালেমের খ্রীস্টানগণ সদলবলে সেখানে হাজির হয়ে খলিফার নিকট আত্মসমর্পণ তথা সন্ধিপত্রে সই করলেন।

খলিফা ওমরের জেরুজালেমে প্রবেশ:

খলিফা ওমর যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করছেন, তখন তাঁর শরীরে তালিযুক্ত্ জীর্ণ জামা। সামরিক নেতাগণ অনুরোধ করলেন—তাঁকে একটি ভাল জামা গ্রহণ করার জন্য। উত্তরে খলিফা বলেন—"আল্লাহ্ আমাকে ইসলামে আশ্রয় দিয়ে ধন্য করেছেন, ভাল জামা, ভাল তুর্কী ঘোড়া আমার দরকার নেই। আমার মর্যাদার জন্য ইসলামই যথেষ্ট।" অতঃপর তিনি এ অবস্থাতেই জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন। যখন তাঁর সহিস উটের ওপর, তখন তিনি সহিসরূপে উটের দড়ি ধবে নিয়ে যাচ্ছেন।

কে খলিফা, কে সহিস্; কে প্রভু, কে গোলাম:

প্রকৃত ঘটনা, খলিফা যখন মদিনা হতে বের হলেন, তখন তিনি উটের উপর চেপে ছিলেন। এবং সহিস উটের রশি ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এক মাইল পথ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহানুভব খলিফা নামলেন, এবং সহিসকে বললেন—এবার তুমি চাপ, আমি উটের রশি টানব। তখন সহিস খলিফার একথা শোনার পর একেবারেই হতবাক, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। সে কিছুতেই উটে চাপবে না। খলিফাও ছাড়বেন না। সহিস বলল—আমি আপনার গোলাম, আপনি আমার প্রভু, শাহানশাহ, আমি উটে চাপতে পারি না। ওটা আমার জন্য চরম বেয়াদবি। খলিফা উত্তর দিলেন—প্রভুর জন্য আদব অপেক্ষা আদেশ বড়। সুতরাং তুমি আমার আদেশ পালন কর। নতুবা আমি একাই যাব, তুমি মদিনা ফিরে যাও। সহিস বাধ্য হলো প্রভুর আদেশ মেনে উটে চাপতে। এইভাবে পালাক্রমে উভয়েই চাপতে থাকলেন।

দুর্ভাগ্যবশত ঠিক জেরুজালেম পৌঁছাবার সময় সহিসের চাপার পালা পড়েছিল। যখন সহিস বা কচোয়ান উটের উপর চেপে, এবং স্বয়ং খলিফা দড়ি টানছিলেন। এই অপরূপ দৃশ্য, এই অকল্পনীয় ঘটনা যখন জেরুজালেমের বড় বড় পাদ্রীগণ স্বপ্নে নয়, দিবালোকে সহস্র মানুষের সম্মুখেই দেখলেন, তখন সকলেরই সম্বিৎ ফিরে গেল। এ কোন্ বীর, কোন্ মহাবীর, কোন্ পুরুষ, কোন্

পুরুষোত্তম, মানবতার কোন্ দ্বীপ, মনুষ্যত্বের কোন্ মশাল; সকলেরই কণ্ঠে যেন সমসুরে বেজে উঠে - হে বীর, তোমার এই বীরত্বের নিকট জেরুজালেম জয় অতীব নগণ্য জন, সমগ্র বিশ্বজয়ও কিছুই না। জেরুজালেম আজ ধন্য হলো তোমার পদ স্পর্শে। সমগ্র মানবজাতির মানবতা ও মনুষ্যকুলের মনুষ্যত্ব আজ যেন তোমার আচরণে নুতনভাবে প্রাণ পেল।

বিশ্ব জোড়া মানবতার রুখে দিয়ে মৃত্যুবান
মরণ মুখী মনুষ্যত্বের সঞ্চারিলে বীরের প্রাণ।

হে মহামানব, তুমি কি অম্বার মণি, না কস্তুরিকা! তোমার সুঘ্রাণ যেন সারা বিশ্বকে সুবাসিত ও সুগন্ধময় করে তুলল। এবার মহামানব খলিফা ওমর সবিনয়ে উত্তর দিলেন---আমি কোন অম্বার মণি বা কস্তুরিকা কোনটাই নই। তবে আমি কিছুদিন একটি গোলাপ গাছের নিচে (মহানবীজীর (দঃ) চরণতলে) মাটি রূপে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।

নাহিরে অম্বার মনি, নহি কস্তুরিকা
গোলাপের মূলে ছিনু, আমিরে মত্তিকা।

ইসলামের জয়, আচরণের জয়:

এইভাবে ইসলাম একদিন বিশ্বকে জয় করেছিল- শক্তিতে ও সম্পদে নয়, কৃপাণে ও কৌশলে নয়, তলোয়ারে ও তর্কে নয়; সে জয় করেছিল- আপনি আচারে ও আচরণে, সে জয় করেছিল মানবতার দীপ জ্বালিয়ে, মনুষ্যত্বের মশাল তুলে ধ'রে। সে দুর্গত মানবতার সেবায় সমাজের দুটো শাখাকেই দুহাতে তুলে ধরেছিল---দরিদ্র মানুষ ও অভাগা রমণীকুল। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই। এ ছিল তার আপোসহীন সংগ্রাম। এই অভূতপূর্ব সংগ্রামেই ইসলাম একদিন জেরুজালেম হতে সারা জগৎকে জয় করেছিল। এ জয়ের দু'টি মাত্র অমোঘ অস্ত্র ছিল---মানবতা ও মনুষ্যত্ব। তাই ইসলামের জয় ছিল---আচার ও আচরণের জয়, আদবের জয়।

আপন আচারে তুমি হও হে তেমন
অন্য হতে পেতে চাও নিজেরে যেমন।
হোক তব ব্যবহার মানব সমাজে
যেরূপ পাইলে তুমি খুশি হও নিজে।
সবাই সবেরে কর নিজেরে আদেশ
ভাল হও, ভাল হবে তোমার স্বদেশ।---হাদিস্
আচারে পেয়েছে আলো জগৎ-ভূমি
মানব-সমাজে নবী সূর্য তুমি।---কোরআন---৩৩: ৪৬

প্রথম জেরুজালেমের মসজেদুল আকসায় গমন করে মিহ্‌রাব্-ই-দাউদের

নিকট গিয়ে পবিত্র কোরআন থেকে হযরত দাউদ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত পাঠ করেন। অতঃপর খ্রীস্টানদের প্রসিদ্ধ গির্জা ও অন্যান্য স্থানগুলো দর্শন করেন। এই সময় মহানবীর মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল খলিফার নিকট অভিযোগ করেন—সামরিক নেতারা এখানে গোস্ত ও সাদা রুটি খান, অথচ দেশে সাধরণ মানুষ সামান্য খাবার পায় না। উত্তরে সামরিক নেতাগণ বলেন, হেজাজে যে মূল্যে লাল রুটি ও খেজুর মেলে, সেই মূল্যেই এখানে মুরগি ও ময়দা মেলে। খলিফা উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন এবং আরো বললেন - সৈনিকরা মাসোহারা ও মালে গনিমাত পাওয়া ব্যতীতও বিনা মূল্যে খাদ্য পাবে। অতঃপর নামাজের সময় আগত। খলিফা হযরত বেলালকে অনুরোধ করেন আজান দেওয়ার জন্য। বেলাল মহানবীর পরলোক গমনের পর আর আজান দেননি। কিন্তু খলিফার একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে আজান দেওয়া মাত্র মহানবীর বিগত দিনের মধুর স্মৃতি সকলকেই একেবারে অভিভূত করে তোলে। স্বয়ং খলিফা পর্যন্ত সকলেই সজোরে ক্রন্দন করে ওঠেন। পরিশেষে খলিফা, বিশপ কারকে জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় নামাজ পড়বেন, বিশপ উত্তর দেন—গির্জাতে। খলিফা না করলেন। বিশপ কারণ জানতে চাইলে, খলিফা বলেন—"আমি যদি একবার এই গির্জাতে নামাজ পড়ি, তাহলে মুসলমানগণ পরবর্তীকালে এটাকে মসজিদ বলে গণ্য করবে, সেটা আমি চাই না।" খলিফা সম্মান দিলেন গির্জাকে ও শিক্ষা দিলেন মুসলিম জাহানকে অপর ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্থানগুলোকে সম্মান দেখাতে, মসজিদে রূপান্তর করতে নয়। এটা ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ কাজ। অতঃপর মসজেদুল আকসা পরিদর্শন কালে খলিফা একটি প্রস্তরখণ্ড দেখতে পেলে বিশপকে জিজ্ঞাসা করেন—'ওটা কি?' উত্তরে বিশপ বলেন- 'সাখ্‌রাহ্'। মুসলমানদের কাবা মসজিদে 'হাজার্-উল-আস্‌ওয়াদ' (কালপাথর) যেমন পবিত্র, ইহুদিদের নিকট 'সাখ্‌রাহ্'ও তেমনি। বিশপ বলেন- এটাই তাদের 'কেবলা', যেটাকে সম্মুখের দিকে রেখে তাঁরা প্রার্থনা করেন। তখন খলিফা ওটাকে খুবই সম্মানের চোখে দেখেন।

সিরিয়া প্রান্তে রোমানদের শেষ চেষ্টা:

আমরা বহুবার উল্লেখ করেছি—মুসলমানগণ কোনদিনই সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। ইসলামের শত্রুগণ যতবারই ইসলামকে আঘাত করার জন্য ও ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে এসেছে, ততবারই তারা ইসলামের সাম্রাজ্যসীমাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এবারও আবার তাই ঘটল। ৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে রোমান খ্রীস্টানরা এমেসা জয় বা পুনরুদ্ধার করার জন্য শেষবারের মতো শেষ চেষ্টা করে। জাজিরাহ ও আর্মেনিয়ার বাসিন্দারা সীজার হিরাক্লিয়াসের নিকট দূত পাঠান আর একবার

আরব মুসলমানদের সাথে পাঞ্জা কষার জন্য। সীজার সুযোগ বুঝে জাজিরাহবাসীদের সুশিক্ষিত তিন লক্ষ সেনার সাথে আপন বিশাল বাহিনীকে যোগদান করতে নির্দেশ দিলেন। খলিফা ওমর বহু পূর্ব হতেই আপন দূরদৃষ্টি বলে আটটি শহরে আটটি সেনানিবাস স্থাপন করেছিলেন, প্রতিটিতে চার হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকত। খলিফা প্রতিটি সেনা শিবিরে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে স্বয়ং দামেস্কে হাজির হলেন। প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ আরম্ভ হল। কয়েক লক্ষ খ্রীস্টান বাহিনী মাত্র কয়েক হাজার মুসলিম বাহিনীর নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এমেসা উদ্ধার করার পরিবর্তে তাঁদের হাতে তুলে দিল নতুন করে জাজিরাহ ও আর্মেনিয়া।

মহামারীর কবলে :

৬৩৯ খ্রীস্টাব্দ, আঠারো হিজরী, ইসলামের এক অতীব দুঃসময়। সিরিয়া, মিশর ও ইরাকের কয়েক স্থানে দেখা দিল চরম মহামারী। আমওয়াস নামক স্থানে মহামারীর তীব্রতা ভীষণ রূপ ধারণ করল। খলিফা সকলের সাথে পরামর্শ করলেন। এবং স্বয়ং মহামারীর স্থানগুলো পরিদর্শন করলেন। সকল সেনানিবাসই প্রায় সৈন্যশূন্য হতে চলল। তিনি সকলকেই স্থান ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কেউই মৃত্যুর ভয়ে স্থান ত্যাগ করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। খলিফা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেই আবু উবাইদাকে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য মদিনায় ডেকে পাঠালে আবু উবাইদা বুঝতে পারলেন—এটা একটা কৌশল মাত্র তাঁকে মদিনাতে নিয়ে যাওয়ার। তখন আবু উবাইদা প্রত্যুত্তরে খলিফাকে জানালেন—যেখানে তাঁর সহকর্মীগণ দিনের পর দিন অবস্থান করে প্রাণত্যাগ করছেন, সেই অসময়ের বন্ধুগণকে তিনি ত্যাগ করে নিরাপদ স্থান মদিনাতে যেতে মোটেই প্রস্তুত নন। তখন নিরুপায় খলিফা তাঁকে অন্য কোন একটি নিকটবর্তী উত্তম স্থানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে সেনাপতি তাঁর অনুরোধ মতো জাবিয়ায় গমন করেন, এবং সেখানেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। তখন আমর বিন আস সকলকেই স্থান ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ জানালে মুয়াজ বাধা দেন। এবং শিবিরে ফিরে একমাত্র বীর পুত্রকে মহামারীতে আক্রান্ত দেখেন। পিতা হযরত ইব্রাহিমের বাণী উচ্চারণ করলেন—"বৎস! এ আল্লাহর দান। তোমার বুকে যেন কোন ভয় না জাগে।" তখন পুত্র ইসমাইলের বাণী উচ্চারণ করে বলেন—"আমাকে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করতে দিন।" কিছুক্ষণের মধ্যে পুত্র এবং পিতাও মহামরণকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন। আমর বিন আস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। অগণিত মুসলিম নক্ষত্র ও পঁচিশ হাজার মুসলিম সেনা এই মহামারীতে অকাতরে প্রাণ দেন। হাজার হাজার বালক-বালিকা অনাথ হল, শত শত রমণী বিধবা

হলেন। আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সকল কিছুকেই সুদক্ষ খলিফা মোকাবিলা করলেন চরম দক্ষতার সাথেই।

সিরিয়ার শেষ স্বাধীন চিহ্ন বিলুপ্ত হল:

ঐ সময় ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত প্যালেস্টাইন প্রদেশের একটি অতি প্রাচীন ও উন্নত শহর ছিল। এর নাম ছিল সীজারিয়ার বা কায়সরীয়ার। বহু ঐতিহাসিকের মতে, এই শহরে তিন শত বড় রাস্তা ছিল। সেনাপতি আমর বিন আস তেরো হিজরীতে ৬৩৫ খ্রীস্টাব্দে শহরটিকে অবরোধ করেন। কিন্তু বহুদিন অবরুদ্ধ থেকেও শহরটি আত্মসমর্পণ করেনি। এদিকে সেনাপতি আবু উবাইদা পরলোক গমন করলে খলিফা ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং নির্দেশ দেন ঐ শহরটিকে অধিকার কবতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইয়াজিদ অসুস্থ হয়ে পড়লে আপন ভ্রাতা মুয়াবিয়াকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করেন। মুসলমানগণ তখনও নগর অধিকার করতে পারেননি। পরিশেষে ইউসুফা নামক এক ইহুদীর গোপন সাহায্য বলে মুসলিম সেনা নগর দখলেব উপায় খুঁজে পেলেন। নগরের গোপন ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথটি জানতে পারলেন। ফলে মুসলিম বাহিনী অবাধে শহবে প্রবেশ করে। তবুও খ্রীস্টান বাহিনী তাঁদের আট হাজার বীর সেনা নিহত না হওয়া পর্যন্ত শহরের দখল ছাড়েননি। এটা ছিল তাঁদের শহর নয়, স্বাধীনতার শেষ রশ্মি। এই রশ্মিটুক নির্বাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র সিরিযা অঞ্চলে ইসলামের শান্তি পতাকা পূর্ণভাবেই উড্ডীয়মান হল। এইভাবে খলিফা ওমরের হাতে সিরিয়া সম্পূর্ণভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

মিশর বিজয়:

সেদিনের মিশর ছিল কনস্টান্টিনোপলের শস্যভাণ্ডর, তার রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া ছিল বাইজান্টাইন নৌশক্তির প্রাণকেন্দ্র এবং উত্তর আফ্রিকার প্রবেশদ্বার, ও নীলনদবাহী শস্যশ্যামলা উপত্যকাভূমি।

সেনাপতি আমর বিন আস তাঁর যৌবনকালেই বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বহুবার মিশর এসেছিলেন। এবং মিশরের নানা দিক তাঁকে ভীষণ ভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। খলিফা ওমর যখন জেরুজালেমে সফররত, তখন আমর বারধার খলিফার নিকট হতে অনুমতি ভিক্ষা করেন মিশর অভিযানের জন্য। শেষ পর্যন্ত খলিফা তিতি-বিরক্ত হয়েই রাজি হলেন এই শর্তে যে, মিশরেব মাটিতে পা ফেলার পূর্বেই যদি আমার পত্র পাও তাহলে মিশর অভিযান বন্ধ করবে। আমর মাত্র বারো হাজার সৈনিক-সহ যখন মিশরের আরিবশ নামক স্থানে উপস্থিত হন, ঠিক হেনকালে ওমরের পত্রটি তাঁর হস্তগত হয়। তখন তিনি পূর্ব শর্তানুযায়ী খলিফার পত্রটিকে সসম্মানে পকেটে ভরে ঐ মহাপথের অনুসরণ

করলেন, যে পথে একদিন পা রেখেছিলেন হযরত ইব্রাহিম, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন ও কামাল পাশা।

ফার্‌মা অধিকার :

ফারমা একটি প্রসিদ্ধ নগর, ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। এই নগরটি আজও ইতিহাসে অমর। কেননা ফারমা তার বক্ষে ধারণ করে রেখেছে বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎশাবিশারদ গ্যালেন বা জালিনুসের অমর সমাধি, সে আজ খ্রীস্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা। ৬৪০ খ্রীস্টাব্দে সেনাপতি আমরের নিকট একমাস আত্মরক্ষা করার পর শহরটি আত্মসমর্পণ করে।

বিখ্যাত ফুস্‌তাত অধিকার :

অতঃপর আমর বিখ্যাত শহর ফুসতাতের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। পথিমধ্যে বাববিস ও অন্যান্য শহরগুলো অধিকার করেন। ফুসতাতের অবস্থান ছিল—নীলনদ ও মাকতম পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে। একটি সবুজ শস্যক্ষেত্রময় উপত্যকা। এখানেই ছিল ব্যাবিলন নামক মনোরম দুর্গটি। রোম সাম্রাজ্যের মিশরীয় রাজপ্রতিনিধি বা ছোটলাট এখানেই বাস করতেন। আমর তাঁর রাজধানী ফুসতাতকেই অবরোধ করলেন। রাজপ্রতিনিধি মাকাকিস বা সাইরাস আমরকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা প্রদান করলে আমর আইন-শামস নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠান। খলিফা প্রবীণ সাহাবী জুবাইর-বিন-আওয়ামের মাধ্যমে ছয় হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। তখন মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা হয় দশ হাজার এবং বিরোধী পক্ষে হয় পঁচিশ হাজার। রোমক বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁদের সেনাপতি থিওডোরাস আলেকজান্দ্রিয়ায় পলায়ন করে আত্মগোপন করেন। তখন নিরুপায় শাসক সাইরাস ব্যবিলন দুর্গে আত্মরক্ষা করেন। সাতমাস অবরুদ্ধ থাকার পর সাইরাস সন্ধি প্রস্তাব দিতে বাধ্য হলে আমর তিনটি প্রস্তাব দেন—(১) ইসলাম গ্রহণ, (২) জিজিয়া প্রদান, (৩) যুদ্ধ। তখন সাইরাস কতিপয় দূতকে মুসলিম সেনাপতির নিকট পাঠালেন—তাঁকে মোটা ধরনের উৎকোচ সহকারে কিনে নেওয়ার জন্য। দূতগণ সেনাপতির সাথে কথোপকথন করার পর সাইরাসকে জানালেন—"আমরা এমন একটি জাতির সাথে মোকাবিলা করছি, যারা জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকেই বেশি ভালবাসে, ধন অপেক্ষা দারিদ্র্যতাকেই বেশি পছন্দ করে, তাদের কোন ছোট-বড় নেই, তাদের কোন দাস-দাসী নাই, তারা সকলেই এক আল্লাহর দাস। ইহলোক অপেক্ষা পরলোকে তারা বেশি প্রলুব্ধ। এমন একটি জাতির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়া একেবারেই অসম্ভব।"

অতঃপর দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর একদিন জুবাইর দুর্গ-প্রাচীরে আরোহণ

করে দুর্গে প্রবেশ করে অসীম সাহসের সাথে দুর্গ-দুয়ার খুলে দিলে বন্যার ন্যায় মুসলিম বাহিনী দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে দুর্গটিকে জয় করেন। খ্রীস্টানগণ জিজিয়া দেওয়ার শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইরাসকে বিশ্বাসঘাতক বলে নির্বাসনদণ্ড দান করেন এবং জানিয়ে দিলেন—"বিশ্বাসঘাতকরা যদি যুদ্ধ করতে না পারে, তাহলে আমার মিশরে অবস্থানরত অসংখ্য রোমক বাহিনী আক্রমণকারীদের সমর-সাধ চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দেবে। এবং তিনি এক বিশাল বাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলা করার নিমিত্ত আলেকজান্দ্রিয়ায পাঠিয়ে দেন। এই ভাবে বিখ্যাত ফুসতাত শহব রোমানদের হস্তচ্যুত হল। সেনাপতি আমব তাঁর দীর্ঘদিনের কামনা পূর্ণ হওয়ায় আল্লাহকে শোকরিয়া জানিয়ে খলিফাকে শুভ সংবাদ প্রেরণ করলেন।

আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার :

সেনাপতি আমর ফুসতাত অঞ্চল অধিকার করার পর ঐ অঞ্চলেই একটি স্থায়ী শিবির স্থাপন করেন, এবং পরবর্তীকালে ঐ শিবিরটিকে কেন্দ্র করেই বিখ্যাত ফুসতাত শহর গড়ে উঠে আমর কর্তৃক। এই বিখ্যাত শিবির হতেই আমর নিকিউ শহর অধিকার করেন এবং বিশাল প্রস্তুতি নিয়ে মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার ও অবরোধ করার নিমিত্ত খলিফার অনুমতি প্রার্থনা করে আরো কিছু সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ করেন। যথাসময়ে মুসলিম সৈন্য যোগদান করায় এখানে সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল সর্বমোট বিশ হাজার।

আলেকজান্দ্রিয়া :

বর্তমান বিশ্বের আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর যেমন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ঠিক অনুরূপভাবেই তদানীন্তন বিশ্বের মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া রূপে, সৌন্দর্যে, সৃষ্টি কলায় ছিল পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য শহর। যার চারিদিকে ছিল মনোরম সুউচ্চ প্রাসাদ, দুর্ভেদ্য প্রাকারবেষ্টিত এক অচিন্ত্যনীয় স্বর্গপুরী, এ ছিল এক দুভের্দ্য দুর্গ। যার একদিকে ছিল আমুদ আল-সাওয়ারী নামক অতীব আকাশচুম্বী প্রাসাদ, যার মধ্যে শোভা বর্ধন করছিল সেরাপিসের মন্দির ও বিখ্যাত গ্রন্থাগার, বিপরীত দিকে বিশ্ববিখ্যাত সেন্টমার্কের গির্জা, এই অপূর্ব গির্জাটি পরলোকগত জুলিয়াস সীজারের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর পত্নী মিশর-রাণী ক্লিওপেট্রা তৈরি করেছিলেন। তিনি আরো পশ্চিম দিকে দুটো রক্তবর্ণ আসওয়ান গ্রানাইট নির্মিত সুচ নির্মাণ করেন। পশ্চাদভূমিতে ছিল ঐতিহাসিক 'ফারস', যা দিবালোকে, সূর্যালোকে ও রাত্রিতে ঐ সূর্যালোকের সঞ্চিত রশ্মিতে চারিদিক আলোকিত করে দিন করে রাখত। তদানীন্তন জগতে এটা ছিল সপ্তমাশ্চর্য বস্তু। এই শহরটিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫০ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য অতন্দ্র

প্রহরীর ন্যায় সদাই প্রস্তুত থাকত। মরুবাসী আরব বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে চিরদিন এই শহরের কথা কাহিনী রূপে বলাবলি করত। যার পেছনে দূর সমুদ্রে বাইজান্টাইন বিশাল নৌশক্তি সিংহবিক্রমে সকল বাধাকে রুখে দিত। সত্যিকারেই সেদিনের আলেকজান্দ্রিয়া ছিল এ বিশ্বের এক স্বপ্নপুরী।

যুদ্ধ ও জয়:

মুসলিম সেনাপতি আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করার পর দশবার চিন্তা করছেন আক্রমণ করার জন্য। কেননা তাঁদের সৈন্যসংখ্যা ছিল কম, অস্ত্র কিছুই ছিল না, জাহাজের নামগন্ধ নেই, আত্মরক্ষা বা আক্রমণেরও বিশেষ কোন যন্ত্রপাতিও নেই। সবার ওপর বিদেশ, চরম বিপদেও কোন সাড়া পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে সাইরাস শহর রক্ষার ভার আবার গ্রহণ করেছেন। খলিফা ওমর মাসের পর মাস প্রতীক্ষার পর অধৈর্য হলেন। তাঁর চিন্তাতে এল—মনোবলের অভাব ঘটেছে। তিনি আমরকে ভর্ৎসনা করে দূত পাঠালেন—"বহুদিন মিশরের আরামপ্রিয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে তোমরা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছ। নচেৎ কাজ সমাধান করতে এত দেরি কেন। আমার পত্র পাওয়া মাত্রই সৈন্যগণকে উদ্বুদ্ধ করো ইসলামের ঈমানের বলে, জেহাদ যাদের জীবনের অতীব প্রিয় বস্তু। আল্লাহ্‌কে মাথায় রেখ, সকল সেনাধ্যক্ষকে সম্মুখে রেখ। অতঃপর জেহাদে অবতীর্ণ হও। আল্লাহ্ তোমাদের জয়ী করবেন।" সেনাপতি আমর মহামান্য খলিফার পত্র পাওয়া মাত্র আর কালবিলম্ব না করেই একযোগে ভীষণভাবে আক্রমণ চালালেন। আক্রমণের প্রচণ্ড বেগ সুখী রোমান সেনারা সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করল। নিরুপায় সাইরাস সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। ৬৪১ খ্রীস্টাব্দের ৮ নভেম্বর এই ঐতিহাসিক সন্ধি সংঘটিত হল। সন্ধির প্রধান শর্ত ছিল—জিজিয়া। প্রতিটি বয়স্ক মানুষের জন্য দুই দিনার ও শস্যক্ষেত্রের নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য আরবে পাঠাতে হবে। এইভাবে বিশ্বের অন্যতম স্বপ্নপুরী আলেকজান্দ্রিয়া আরবদের হস্তগত হল।

এবার সেনাপতি আমর মহামান্য খলিফাকে এই বিজয় গৌরবের কথা জানালেন—"আল্লাহ্ এমন একটি শহর আমাদের হস্তগত করিয়েছেন, যার বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। তবে আপনার অবগতির জন্য আমি এইটুকু মাত্র লিখতে পারি যে, এই শহরে আছে—চার হাজার হামাম খানা (স্নানাগার), চার হাজার বাগানবাড়ি, চারশো রাজকীয় বিলাস ভবন, চল্লিশ হাজার জিজিয়া করদাতা ইহুদি। মুয়াবিয়া-বিন-খুদায়েজ এই সংবাদ মহামানব খলিফার দরবারে নিয়ে হাজির হলে খলিফা তাঁকে আনন্দে আপ্যায়ন করান—কয়েকটি শুকনো খেজুর, এক টুকরো রুটি ও সামান্য জলপাই

তেল দ্বারা। এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে শুকরানা (কৃতজ্ঞতা) নামাজ আদায় করেন।

ফুসতাত ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মিশর ভূমি আরবদের পদানত হল। বিক্ষিপ্ত শহরগুলোও একের পর এক আরব শাসনাধীনে এসে গেল। খারিজাহ বিন হুদায়ফাহ অধিকার করেন—ফায়ুম, আশমুনীন, আখমিম, বাশরুদাত, মুয়াদ প্রভৃতি শহর। এবং ওমর বিন ওহাব কর্তৃক তানিস, দিমিয়াত, তুনা, দামিরাস, শাতা, কাহলা, বানাহ, ও বহির, এবং উতবা বিন আমীর কর্তৃক সমগ্র নিম্ন মিশরভূমি অধিকৃত হয়।

মিথ্যা রটনা:

কোন এক ইসলাম—বিদ্বেষী অন্ধ নির্বোধ ইহুদি পণ্ডিত ইতিহাসের কোন খবরাখবর না রেখেই মহামানব খলিফা ওমরের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা রটনা চালু করেন। রটনাটি হচ্ছে—হযরত ওমরের নির্দেশ বলে আলেকজান্দ্রিয়ার অতি সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত বিশাল গ্রন্থাগারটিকে একেবারেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। হযরত ওমর নাকি তাঁর সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করেন—"ঐ গ্রন্থাগারে যা আছে, তা কি পবিত্র কোরআনে আছে?" সেনাপতি উত্তর দেন—'তা নেই।' তখন হযরত ওমর বলেন—"তাহলে ঐ পুস্তকগুলো পবিত্র কোরাআনের বিরুদ্ধবাদী; সুতরাং ওগুলোকে পুড়িয়ে ফেল।" তখন অন্য একজন সেনাপতি বললেন—"মহামান্য খলিফা, ঐ সমস্ত পুস্তকে যা আছে, তা কোরআনেও আছে।" তখন মহামান্য খলিফা বলেন—"যা কোরআনে আছে, তাই যদি ঐ পুস্তকগুলোতে থাকে, তাহলে ঐ পুস্তকগুলো অনাবশ্যক, ওদের কোন প্রয়োজন নেই, ওগুলোকে সত্বর পুড়িয়ে ফেল।"

ইতিহাস সাক্ষী দেয়—খ্রীস্টপূর্ব ৪৮ অব্দে জুলিয়াস সীজার কর্তৃক ঐ সুবৃহৎ টলেমী গ্রন্থাগারটি ভস্মীভূত হয়। এবং ৩৮৯ খ্রীস্টাব্দে সিজাব থিওডোসিয়াস কর্তৃক আবার এখানকারই দ্বিতীয় সুবৃহৎ কন্যাকা গ্রন্থাগারটি ভস্মীভূত হয়। আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর কোন ঐতিহাসিকই হযরত ওমরকে এ ব্যাপারে দোষী করেননি। কেউ কেউ বলেন—১২৩১ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের আব্দুল লতিফ নামক এক ব্যক্তি এই রটনাটি সৃষ্টি করেন। যাই হোক, রটনাটি একেবারেই নির্জলা মিথ্যা। তাই বিশ্ব ইতিহাসে একজনের দ্বারাও স্বীকৃতি পায়নি।

ইসলামের জয়:

সবশেষে সেনাপতি আমর খলিফার নিকট জানতে চাইলেন বন্দীদের ধর্মমত নিয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ওমর উত্তর দিলেন—"হাজার হাজার বন্দী আছে, সকলকে একত্রিত কর। অতঃপর রোমান পাদ্রীগণকে

আমন্ত্রণ করা হোক ঐ জনসমাবেশে। এবং তাঁদের সম্মুখেই বন্দীদের জিজ্ঞাসা করা হোক, তারা কোন্ ধর্মে থাকতে চায়। এই ব্যাপারে কোন প্রকার লোভ, লালসা, ভয়-ভীতি ইত্যাদি যেন দেখানো না হয়। তাদেরকে তাদের স্বাধীন মতামত নিতে দেওয়া হোক।" সেনাপতি মহামান্য খলিফার নির্দেশ মতো যথাযথ ভাবেই কাজ করলেন। অধিকাংশ বন্দী খলিফার এই উদার ব্যবহারে অতীব মুগ্ধ হয়েই 'ইসলাম' গ্রহণ করেন। খলিফার ব্যবহারে ও যুদ্ধ নীতিতে মিশরের রাজনৈতিক ও সামরিক জয় সামাজিক ও ধর্মীয় জয়ে পরিণত হল। এখানেই ছিল খলিফার মানবতার জয়, মনুষ্যত্বের জয়, মহানবীর জয়, মহান কোরআনের জয়। এইরূপ বহু জয়ে ইসলামকে কোনদিনই সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হয়নি, সেখানে কোন বাহুবল ছিল না। কেবলমাত্র ছিল মানুষকে ভালবাসার জয়, দুর্গত মনুষ্যত্বকে উদ্ধারের জয়, মহান ইসলামের উদারতার জয়।

মানুষে মানুষে নাহি ভেদাভেদ দেখ কোরআনের যুক্তি
বিশ্বজোড়া সৎ মানুষের সবারে দিয়েছে মুক্তি।

চতুর্থ অধ্যায়

পারস্য বিজয় ও ইরানের পূর্বাংশ জয়

কোরআন:

* "তোমাদের উপর সংগ্রাম বিধিবদ্ধ হল। ২:২১৬
যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবে,
তোমরাও আল্লাহর পথে তাদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর,
কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না।
আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।" ২:১৯০

অচিন্ত্যনীয় সাম্রাজ্য:

পৃথিবীর ইতিহাসে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারাশির মধ্যে ইসলামের অভ্যুদয় একটি অন্যতম ঘটনা। মহানবীর আবির্ভাবকে কেন্দ্র কবে ইসলাম শুধু একটি ধর্মের পতাকাকে আরব মরুভূমিতে স্থাপন কবে ক্ষান্ত হয়নি। একটি দ্বীন (ধর্ম বা জীবন-ব্যবস্থা) কিভাবে তাব সমগ্র সমাজকে সুসংবদ্ধ ও সুসংহত করে সমগ্র বিশ্বে একটি অপরাজেয় সামরিক শক্তিব পরিচয় দিতে পাবে, ইসলাম বিশ্ব ইতিহাসে তাব নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত বহন কবে। মহানবী ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে এমনি এক শক্তি-সিন্ধু দান করে গিয়েছিলেন, যাব দ্বারা একদিন সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটাই ইসলামের পতাকা তলে এসে পড়ে। একদিকে এশিয়ার সাইবেরিয়া মরুভূমি হতে চীনেব কাশগড়, ইউরোপের পীবেনিজ পর্বতমালা পর্যন্ত, আফ্রিকার জঙ্গল ব্যতীত সবই, এই ছিল ইসলামের বিশাল সাম্রাজ্য। যা অচিন্ত্যনীয।

একবার ঘুরে দেখ অতীত জগৎ
ইসলামের জয়যাত্রা রাজ্য খেলাফত।
এশিয়া আফ্রিকা হতে ইউরোপ বিজয়
ইসলামের অদ্বিতীয় কৃতী সুনিশ্চয়।
এরাজ্য গড়েনি কোন ছলে-বলে-কলে
ইসলাম গড়িল তার মহামন্ত্র বলে।

হযরত ওমরের সমর অভিযান কেন:

একজন ইংরেজ লেখক বা স্বনামধন্য ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"অন্য কোন পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত হঠাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়।" পারস্য বিজয় হযরত ওমরের চিন্তাপ্রসূত ছিল না। হযরত আবুবকর যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ওমরও

বাধ্য হলেন। হযরত ওমরের জীবনে রাজ্যজয় ও ধর্মপ্রচারের স্পৃহাকে কোনদিনই বড় আকারে দেখা যায়নি। কেননা একবার তিনি নিজেই বললেন—"যুদ্ধের প্রয়োজন শুধু দেশবাসীব নিরাপত্তার জন্য। যখনই কেউ তাঁকে ছোট ভেবে বা ঘৃণাভরে বা ছোট করতে আঘাত দিতে এসেছেন, তখনই তিনি তার প্রতিঘাত দিতে এগিয়ে গেছেন। বেধে গেছে যুদ্ধ, বেড়ে গেছে ইসলামেব সাম্রাজ্য। তদানীন্তন ইসলামের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ ইসলামের অভ্যুত্থান, উত্থান বা উন্নতি কোনটাকেই মেনে নেয়নি। তখন প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিণতিতে বেধেছে যুদ্ধের পর যুদ্ধ।

পারস্য বিজয় ও তার কারণ:

প্রধানত দুটো কারণে পারস্য মুসলমানদের হস্তে এসে যায়। একটি ভৌগোলিক ও অন্যটি রাজনৈতিক। আরবের পূর্বদিকে ইরাক বা প্রাচীন মেসোপটেমিযা ও আমুর দরিয়া বা আকসাস পর্বতমালা নিয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। আবববাসীগণ বহুদিন ধরে ইবাকেব সাথে বাণিজ্য কবে আসছিল। কেননা ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিস নদীদ্বয়ের অববাহিকা অঞ্চলগুলো খুবই উর্বব ও সমৃদ্ধশালী ছিল। ইসলামেব অভ্যুত্থানেব সঙ্গে সঙ্গে পাবস্যবাজ অধীব চিত্তে, হিংসা-বিদ্বেষবশত কাবণে অকারণে, সমযে-অসমযে আববীয মুসলমানদের এই একমাত্র জীবিকার বা বাণিজ্যেব পথটিকে বাববাব বোধ করার চেষ্টা করে তাঁদেব গরিব হতে আরোও গবিব কবে ভাতে ও প্রাণে মারার চেষ্টা করেন। তখন আরবীয় মুসলমানগণ ভীষণ ভাবে নিরুপায হযেই শুধুমাত্র বেঁচে থাকাব ও জীবিকাব তাড়নাতেই যুদ্ধে নামতে বাধ্য হন। আরবদের এই সংগ্রাম কোন সখেব সংগ্রাম ছিল না। কোন আহ্লাদেব আহ্বানও ছিল না। এর পশ্চাতে ধর্মপ্রচার বা সাম্রাজ্য বিস্তাব কোনটাই ছিল না। একমাত্র ছিল ক্ষুধার্ত ছেলেমেযেদের অন্ন সংগ্রহ। কিন্তু পাবস্যবাজেব অভিশাপ একদিন আশীর্বাদে পবিণত হল। জীবিকাব সংগ্রাম সাম্রাজ্য জযে পবিণত হল।

রাজনৈতিক কারণ বলতে প্রধানত একটাই ছিল। নিরাপত্তাব অভাব ও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তখনকাব দিনে বর্তমানেব ইরাক দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগ ইরানের সাথে ও অন্য ভাগটি আববেব সাথে। ইবানস্থ ইরাকের আরবগণ পারস্যরাজের উস্কানিতে অবিরাম আরবস্থ ইরাকেব মুসলমানদের পেছনে লাগল। একটির পর একটি অশান্তি ঘটতেই থাকল। তখন খলিফা বারবার পারস্যরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও যখন কোন ফল পেলেন না, তখন একটি চিরস্থাযী শান্তি-সূত্র খুঁজতে বাধ্য হলেন। এখানেও যুদ্ধ-বাসনা ছিল না, ছিল একমাত্র দেশবাসীর নিরাপত্তা। আমরা এর পূর্বাধ্যায়েও এই রূপই একটি জিনিস লক্ষ্য করছি। মহানবীর জীবিতকালেই পারস্যরাজ

দ্বিতীয় খসরু নবীজীর দূতকে অপমানিত করে তার পত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেন। তখন মহানবী শান্তভাবেই বলেছিলেন—"আমার পত্রকে যে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, একদিন তাঁর রাজ্যকেও আল্লাহর হুকুমে আমারই উম্মতগণ (মুসলমানগণ) ছিঁড়ে ফেলে দেবে।" এর থেকে বোঝা যায়, পারস্যরাজ মুসলমানদের অবস্থান ও উন্নতি কোনটিকেই মেনে নিতে বা সহ্য করতে পারেননি। অন্য এক সময় এই পারস্যরাজের পূর্ণ সহযোগিতা বলে ভণ্ড মহিলা নবী সাজাহ আরব ভূমিতে সরাসরি অভিযান চালাতে সাহস পেয়েছিল। সুতরাং অতীত ও বর্তমানের এই সমস্ত অনিবার্য কারণে যুদ্ধও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

পারস্যের পূর্ব পরিস্থিতি ও পরিবেশ :

মহানবীর ঠিক পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যে একটা সোনালি বা স্বর্ণযুগ এসেছিল। সেইটাই ছিল ঐ পারস্য-সাম্রাজ্যের গৌরবময় শেষ যুগ, তখন সম্রাট ছিলেন—ইতিহাস বিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ সম্রাট নওশেরওয়াঁ। মহানবীর সময় সমকালীন পারস্যরাজ ছিলেন নওশেরওয়াঁর পৌত্র পারভেজ, যিনি মহানবীর দূতকে অপমানিত করে তাঁর পত্রটিকে শত খণ্ড করার নির্দেশ দিযে স্বযং মহানবীকেই বন্দী করার জন্য ফরমান জারী করেন। কিন্তু দুর্ভাগা পারভেজ একথা জানতেন না যে, তিনি আজ তাঁরই প্রাণদণ্ডের ও আপন সাম্রাজ্যের প্রাণদণ্ডের ফরমানটি নিজ হাতেই বিলি করলেন। ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, আল্লাহর কি অমোঘ নির্দেশ, ঐ পৈশাচিক ফরমানটি জারি হওয়ার পূর্বেই উদ্ধত সম্রাট পারভেজ আপন প্রিয় পুত্র দ্বারাই অতীব নারকীয ভাবেই বধ হয়ে নরকের যাত্রী হলেন। তখন সিংহাসন 'খস্রু'কে নিয়ে চলতে লাগল রক্তের লীলাখেলা। ইসলামের মহানবীকে প্রাণদণ্ড দিতে গিযে পারভেজ তাঁর সমগ্র বংশকেই যেন প্রাণদণ্ড দিলেন। এমনি এক পরিণতি ঘটল। সকরুণ পরিণতি। মাত্র সাত বছরের বালক ইয়েজ্‌দগির্দ ব্যতীত কোন পুরুষই ঐ বংশে আর ছিল না। তখন বাধ্য হয়েই ঐ বংশের বুরান্‌দখ্‌ত বা পুরানদুখ্‌ত নাম্নী এক মহিলাকে রাজসিংহাসনে বসান হল, ঐ নাবালক সাবালক না হওয়া পর্যন্ত। এর অবশ্যম্ভাবী ফল সারা রাজ্যে দেখা দিল—চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। সুযোগ বুঝে ইরাকের 'ওয়াইল' গোত্রের দুই সর্দার মুসান্না সায়বানী ও সুয়াইদ আজলী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

আরব পরিস্থিতি :

ঠিক এই সময় আরবের সংক্ষিপ্ত সারকথা বলতে এই—খলিফা আবুবকরের নির্দেশে মহাবীর খালিদ-বিন-ওয়ালিদ ইমামাহ ও অন্যান্য আরব গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে অতিরিক্ত ব্যস্ত। সেনাপতি মুসান্না তখন ইরাকে ব্যস্ত। বিজ্ঞ খলিফা আবুবকর বুঝতে পারলেন একাকী মুসান্নার পক্ষে বিজয় বিলম্বিত

হতে পারে, তাই ওকে ত্বরান্বিত করার জন্য মহাবীর খালিদকে তাঁর সাহায্যার্থে পাঠালেন। ঠিক এই সময়েই রোমানদের সাথে সিরিয়া প্রান্তে মহাবীর খালিদ ব্যতীত ঐ প্রান্তে যোগ্য নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সেনাপতি নেই। তাই তিনি পুনরায় মহাবীর খালিদকে ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়া প্রান্তে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন খালিদ ইরাকের হীরা জয় সমাপ্ত করে ইরাকের জয়কে সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। যাই হোক, খলিফার নির্দেশ পাওয়া মাত্র বীর খালিদ ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়া গমন করেন। খলিফা আবুবকর এরপর মাত্র দুমাস জীবিত ছিলেন। খলিফার জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর এই অজেয় বীর খালিদের, বীরজগতের প্রবাদ পুরুষ খালিদের বীরত্বের দীপশিখাটিও যেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের হাতে নির্বাণলাভ করল বা নিভে গেল। জানি না প্রথম খলিফা আবুবকরের অতীব প্রিয় বীর, মহানবীর দেওয়া উপাধিপ্রাপ্ত 'সাইফুল্লার' জীবন-দীপ নির্বাপিত হওয়ার বহু পূর্বেই তাঁর বীরত্বের দীপটি নিভে যাওয়ায় স্বর্গত খলিফা আবুবকর ও স্বয়ং মহানবীজীর বিদেহী আত্মা কতটা শান্তি পেল! সান্ত্বনা শুধু এইটুকু।

ভাব যারে কালো তুমি সেই তব ভালো
ভাব যারে ভালো তুমি সেই তব কালো।
জানেন মঙ্গলময় তোমরা জাননা
করেন মঙ্গলই শুধু, কেন হে মান না। ২ : ২১৬।

সাকিফ গোত্রের নেতা আবু উবাইদা :

মহানবীর সাহাবী আবু উবাইদা ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের পর মহামারী রোগে ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তখন খেলাফতের আসনে সমাসীন হযরত ওমর। তিনি পারস্য বিজয়ের জন্য সেনাপতি মুসান্নার সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাঁকে রণাঙ্গনে পাঠালেন। পরে আরো সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য পরপর কয়েকদিন আবেগময় কণ্ঠে উত্তেজনাময় ভাষণ দেওয়ার পর বনি সাকিফ গোত্রের নেতা দ্বিতীয় আবু উবাইদা খলিফার আহ্বানে প্রথম সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন খলিফা তাঁকেই সেনাপতি নির্বাচিত করলে উপস্থিত অন্যান্য সাহাবীগণ মৃদু আপত্তি জানালেন যে, এতগুলো সাহাবী থাকতে একজন নতুন মানুষকে কি করে সেনাপতি করা যায়, এবং কি করে মহানবীর বয়স্ক সাহাবীগণ তাঁর নেতৃত্বে কাজ করবেন। তখন ওমর খুবই উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন--আপনারা একদিন যে গুণরাশি অসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা অর্জন করেছিলেন, আজ তা হারিয়ে বসেছেন। আপনারাই বলুন যুদ্ধে যাঁদের আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই, তাঁদের কি সেনাপতি হওয়া সাজে! তখন সকলেই নির্বাক ও কিছুটা লজ্জিত। ওমর তাঁর পূর্ব ঘোষণামতো আবু উবাইদাকেই দশ হাজার সৈন্যসহ নব সেনাপতি রূপে

প্রাক্তন সেনাপতি মুসান্নার সাথে যোগদান করতে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ নির্দেশও দিলেন প্রতিটি কাজে বয়স্ক সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতে ও তাঁদের যথাযোগ্য সাম্মান দিতে।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ পারস্যরাণী বুরানদখ্তও বসে ছিলেন না। তিনি ডাক দিলেন খোরাসানের শাসনকর্তা মহাবীর রুস্তমকে। যিনি একদিকে ছিলেন মহাবীর, আবার অন্যদিক ছিলেন চবম কূটনীতিক। এক দুঁদে রাজনীতিবিশারদ। পারস্যরাণী তাঁকে সার্বভৌম ক্ষমতা দান করে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তাঁকে রাজমুকুটও দান করলেন, সর্বশ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দকে নির্দেশ দিলেন—তাঁর হুকুম পালন করতে বিনা বাক্যে। এমনকি বীর রুস্তমকে উৎসাহিত করার জন্য একথাও প্রচার হয়েছিল যে, রুস্তম আরব বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারলে পারস্যরাণী তাঁকেই স্বামীরূপেও বরণ করবেন।

মহাবীর রুস্তম আদাজল খেয়ে ময়দানে নেমে পড়লেন। সারা দেশের প্রতিটি প্রান্ত হতে বীর সেনাদের সংগ্রহ করলেন। বক্তৃতার মধ্যে লোভ, প্রলোভন, সম্মান, ধর্ম ও জাতীয়-উদ্দীপনা সমস্ত কিছুকেই চরম উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথেই তুলে ধরা হল। সারা দেশে যেন আগুন জ্বলে উঠল। রাণী বুরানদখ্ত অন্য একদল নতুন সেনাবাহিনীও গঠন করলেন, যাদের নেতৃত্ব দিলেন নরসী ও জাপান নামক বীরকে। এদেরকেও রুস্তমের সাহায্যে পাঠান হল। এবার আরম্ভ হল—যুদ্ধেব পর যুদ্ধ।

১। নামারেকের যুদ্ধ :

সেনাপতি মুসান্না ও সেনাপতি আবু উবাইদা নামারেক নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। পারস্যবাহিনীও সেখানে হাজির হল। বেধে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। ইরানীদের বিখ্যাত বীর মরদান শাহ্ নিহত হলেন, বন্দী হলেন জাপান। পরে জাপান মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি পান। প্রথম যুদ্ধে পারস্যবাহিনী শোচনীয় ভাবেই পরাজয় বরণ করল।

অতঃপর সেনাপতি আবু উবাইদা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সাকাতিয়া নামক স্থানে নরসীর নিকট তাঁর বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। সেনাপতি নরসী এই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কবতে বাধ্য হন।

২। জসর বা সেতুর যুদ্ধ :

সেনাধ্যক্ষ বীর রুস্তম পারস্য বাহিনীর পর পর পরাজয়ের কথা শ্রবণ করে আতুর চিত্তে বীর বাহমান শাহকে ডাক দিলেন। এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন চার হাজার সুশিক্ষিত সৈন্যসহ ফোরাতনদীব পূর্ব তীবে মারওয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করতে। মুসলিম বাহিনী ছিল পশ্চিম তীরে। বাহমন শাহ রুস্তমের কূটবুদ্ধি অনুযায়ী মুসলিম বীর আবু উবাইদাকে পূর্বতীরে এসে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন। নচেৎ তিনিই পশ্চিম তীরে যাবেন। আবু

উবাইদা অগ্রপশ্চাত চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নিলেন—ওপারে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য। সেনাপতি মুসান্না বারবার নিষেধ করলেন, একাজ ভাল হবে না। কেননা ওপারের স্থান বিশেষ সুবিধাজনক নয়। অধিকন্তু এটা আরবদের দেশও নয়। তবুও অনভিজ্ঞ নব মুসলিম সেনাপতি দ্বিতীয় আবু উবাইদা কারো কথায় কোনরূপ কর্ণপাত না করেই সেনাবাহিনীকে ফোরাত নদী অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়ে এক মহাবিপদকে ডেকে আনলেন। খলিফা ওমরের উপদেশ বা নির্দেশকেও অমান্য করলেন বয়স্ক সাহাবীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে। নদী পার হয়ে লক্ষ্য করলেন—স্থানটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সৈন্য বিন্যাসের কোন উপায় নেই, অধিকন্তু ওটা ছিল খুবই সমতল ভূমি, যা যুদ্ধের জন্য মোটেই উপযোগী ছিল না।

ফলে ঠিকমতো ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে গেল। বিশাল পারস্যবাহিনী, বিরাট হাতির দল সবকিছু মিলে মুসলিম বাহিনীকে একান্ত ভাবেই অসুবিধায় ফেলল। বহু মুসলিম সেনা হস্তী পদতলে অকারণ পিষ্ট হল। এমনকি আবু উবাইদার ভাগ্যেও তাই ঘটল। পরিশেষে মুসান্না বাকি সেনাদের নিয়ে নদীর এপারে আসার চেষ্টা করলেও বিঘ্ন দেখা দিল। তখন পারস্যবাহিনী সেতুটির যথাসম্ভব ক্ষতি সাধনও করে দিয়েছে। তবুও সেনাপতি মুসান্না নয় হাজার সেনার মধ্যে মাত্র তিন হাজারকে উদ্ধার করে ফোরাতের পশ্চিম কূলে ফিরে এলেন। ইসলামের ইতিহাসে এইরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতি খুবই কম দেখা গেছে মুসলমানদের জন্য। এই যুদ্ধের ফলাফলে বিজ্ঞ খলিফা ওমর অনভিজ্ঞ সেনাপতির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারলেন। আরবের ঘরে ঘরে যে আর্তনাদ ও ক্রন্দনের রোল উঠেছিল, খলিফা ওমর সেজন্য খুবই বিব্রতবোধ করেছিলেন, মহা বিবেকের দংশন খলিফাকে বার বার তাড়িত করছিল—মহাবীর খালিদের পদচ্যুতির জন্য। কেননা মহাবীর খালিদকে পদচ্যুত করায় আবালবৃদ্ধবণিতা নিমিত্ত বহু মানুষ মুখে বলতে সাহস না করলেও অন্তরে তীব্র বেদনাবোধ কবেছিলেন। একটি মানুষেব, তিনি যিনিই হোন, কেবল খেয়ালে ও খুশিতে অগণিত প্রাণ লুটিযে পডবে, এটা কোন সমাজের কোন যুগের কোন মানুষই চান না।

৩। বুয়ায়েবের যুদ্ধ :

একথা নিশ্চিত যে সেতুর যুদ্ধের পরিণতি বা পরাজয় খলিফাকে অত্যধিক আঘাত করেছে, কিন্তু মোটেই উদ্যমবিহীন করতে পারেনি। তিনি অত্যন্ত শক্ত হাতে ব্যাপারটিকে পরিচালনা করতে আরম্ভ করলেন। দেশেব প্রতিটি অঞ্চলে লোক পাঠালেন। ডাক দিলেন ধর্মের নামে, আহ্বান জানালেন জাতির নামে, অনুরোধ করলেন আত্মমর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য। তাঁর ডাক, আহ্বান ও অনুরোধ এক সাথে সফল হয়ে উঠল। সারা দেশ যেন জেগে

উঠল। সাড়া পড়ে গেল প্রতিটি অঞ্চলে। দেশবাসীর নিকট খলিফার আহ্বান ব্যর্থ গেল না। বিশাল এক বাহিনী গড়ে উঠল বিভিন্ন গোত্র হতে।

১। আজাদ গোত্র পতি—মকনাফ্ ইবনে সালিম

২। বানি তাসিম গোত্র—হাসিন-বিন-মবিন

৩। বানু তাই গোত্র—দাতা হাতেম তাই-এর পুত্র আদি

৪। এতদ্ব্যতীত রবব, বানু কিনানাহ, কাসাম, বানু হানজালাহ ও বানু দব্বাহ প্রভৃতি গোত্রগুলো রণ সাজে সজ্জিত হয়ে সমবেত হলেন মদিনা প্রান্তরে।

বুয়ায়েবের যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্টও ছিল—এই যুদ্ধ কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে খ্রীস্টানগণও স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিল। বিখ্যাত নমর ও তগলিব খ্রীস্টান গোত্র সপ্রণোদিত ভাবেই খলিফার নিকট যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জরীর বজলী নামক বিখ্যাত আরব বীরও আপন গোত্রকে নিয়ে যোগদান করেন। এই ভাবে বুয়ায়েবের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে জাতীয় যুদ্ধের মর্যাদা লাভ করে।

পারস্যরাণী বুরানদুখত বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন। এবং আববের দৈনন্দিন সংবাদ সংগ্রহ করে নিজেও বিশাল প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এবার রাণী এমন একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন, যিনি আরবের সকল কিছু জানে ও বুঝে। তিনি ছিলেন মেহরান। মেহরানের অধিনায়কত্বে রাণী তাঁর আপন রাজকীয় বাহিনী থেকে বারো হাজার অশ্বারোহী সেনাকে মেহরানের হাতে অর্পণ করলেন। এতদ্ব্যতীত এক বিশাল বাহিনী মেহরানকে দেওয়া হল।

খলিফার নির্দেশমতো সেনাপতি মুসান্না তাঁর বাহিনীকে নিয়ে কুফার নিকটবর্তী ফোরাত নদীর তীরে শিবির স্থাপন করলেন। মুসান্না তাঁর সেনাবাহিনীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সুদক্ষ সেনানায়কদের হাতে তাদের ভার অর্পণ করলেন। ওদিকে পারস্যবাহিনীর নাযক মেহরান তাঁর বিশাল বাহিনীকে নিয়ে বুয়ায়েব অঞ্চলের ফোরাত নদীর অপর তীরে হাজির হলেন। পরদিন সকালে অতি প্রত্যুষে ফোরাত নদী অতিক্রম করে বাহিনীকে সমরসাজে সজ্জিত করে তুললেন।

উভয়পক্ষ হতে রণদামামা বেজে উঠল। ক্ষণিকের মধ্যে পারস্যের বিশাল বাহিনী মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসলিমগণ "আল্লাহু-আকবর" তকবির ধ্বনিতে অঞ্চল কাঁপিয়ে তুললেন। পারস্যবাহিনী "প্রথম অতীব তীব্রতেজে আক্রমণ চালাল। এই ভীষণ তীব্রতায় মুসলমান বাহিনী যেন প্রথম দিকে টলমল করে উঠল। তখন সেনাপতি মুসান্না বায়ুবেগে শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে তাদের কেন্দ্রবিন্দুতে হাজির হয়ে অত্যন্ত ভয়াবহ তেজের সাথে যুদ্ধ

আরম্ভ করলে মুসলমান বাহিনী তখন শতগুণে শত হুঙ্কার দিয়ে রণভূমি আবার কাঁপিয়ে তুললেন।

এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা আরো একটি নতুন জিনিস লক্ষ্য করি। এখানে ধর্মের কোন ব্যব্ধান ছিল না। জাতপাতের কোন সীমারেখা ছিল না। যখন সেনাপতি মুসান্নার ভাই বীর মাসুদ শত্রু আঘাতে ধরাশায়ী হলেন, ঠিক সেই সময় মুসলিম বাহিনীর আরো একজন খ্রীস্টানবীর আসান-বিন-হিলালও ধরাশায়ী হলেন। সেনাপতি মুসান্না দু'জনকেই একই কবরে পাশাপাশি শুইয়ে দিলেন। জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে কিভাবে দেখা যেতে পারে, ওমরের খেলাফত কালের এ ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কোন সময়ই ধর্মের সীমাবদ্ধ আচাব অনুষ্ঠান মানুষের মূল ও মৌলিক দাবির ও অনুভূতিময় আচরণের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। কেননা প্রকৃত ধর্ম কোন আচার বা অনুষ্ঠানে নেই, আছে মানব-অন্তরে, মানুষের অনুভূতিতে।

আরো অনেক মুসলিম সেনানায়ক শহিদ হলেন। বহু মুসলিম সেনা মারাও গেলেন। কিন্তু মুসান্নার যুদ্ধ তেজে কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের গতি ফিরে গেল। পারস্য বাহিনীর বিখ্যাত সেনানায়ক শাহবাজ ও সেনাপতি মেহবান তাগলিব গোত্রের হাতে প্রাণ হারালেন। এই দুই বীরের মৃত্যুতে পাবস্য বাহিনীতে উৎসাহে একেবারেই ভাটা পড়ল, এদিকে যতটা ভাটা পড়ল, ওদিকে ততটাই জোয়ার দেখা দিল। তখন পারস্য বাহিনী ছত্রভঙ্গের মুখে। তখন বিজ্ঞ সেনাপতি মুসান্না নদীর সেতুপথটি বন্ধ করে দেওয়ায পারস্য বাহিনী একেবারেই নিরুপায হয়ে পড়লেন। যুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত বহু সেনা অকাতবে প্রাণ দিতে বাধ্য হলেন। অসংখ্য পাবস্য সেনা এইভাবে মৃত্যুর দুয়ারে লুটিয়ে পড়ল। ঐতিহাসিকগণ বলেন বহুদিন পরেও বুয়াযেবের প্রান্তরে লক্ষ্য হত মানব-অস্থির ছোট ছোট পাহাড।

এই যুদ্ধের নিট ফল ছিল—আববীয়দের মনোবল শতগুণে বৃদ্ধি পেল, পারস্য বাহিনী যেন চিরতরে ঝিমিযে পডল। এখন হতে আরব সেনাবাহিনী 'খসরু-সিংহাসনের' শেষ দিনগুলো গুনতে আরম্ভ করলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পর মুসলমান বাহিনী সারা ইরাকে (ইবানের অংশ) ছড়িযে পড়লেন। এ যেন তাঁরা আপন দেশে বিচবণ কবছেন। (আজ যেমন উপসাগবীয় যুদ্ধেব পর মার্কিন সেনারা ইরাকে স্বাধীনভাবে দাদাগিরি করে বেড়াচ্ছে।) ঐ সময বাগদাদের নিকট একটি বিবাট মেলা বসেছিল। মুসান্না বহু সৈন্য-সহ মেলা দেখতে সেখানে হাজির হলে মেলাব দোকানদারগণ ভয়ে ঐ অঞ্চলই ত্যাগ করলেন। মুসলিম বাহিনী কয়েকদিন ঐ অঞ্চলে অপেক্ষা করার পরও যখন দেখলেন কোন মালিক বা দোকানদারই আর ফিরল না, তখন তাঁরা মেলাব যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবরগুলো সঙ্গে কবে শিবিরে ফিরলেন।

এই পবাজযেব সংবাদ পাবস্য দববাবে পৌঁছানোব সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিল—বাণীব বিরুদ্ধে। বাণী রুবানদখ্ত সিংহাসন হাবালেন। মাত্র ষোল বছবেব বাজকুমাব ইযেজদ্গির্দ সিংহাসনে আবোহণ কবলেন। তাঁব অভিষেকে সাবা বাজ্যে নব উন্মাদনা ও নব উদ্যম দেখা দিল। নতুন পবিবেশ যেন গডে উঠল। বীবত্বেব দুই মেরুতে দাঁডিযে ছিলেন— দুই বীব রুস্তম ও ফিবোজ। তাঁদেব মধ্যে ছিল চিব শত্রুতা। জাতিব এই সঙ্কটময মুহূর্তে তাঁবা তাঁদেব ব্যক্তিগত বিবোধ ভুলে গেলেন। এক হলেন দেশেব মান সম্মান বক্ষা কবাব জন্য। সাবা দেশে অস্ত্র নির্মাণেব আদেশ দেওযা হল। সমস্ত শক্তিকে একত্রিত কবা হল। উদ্দেশ্য একটিই মাত্র—যাযাবব আববদেব জীবনেব মতো একটি চবম শিক্ষা দেওযা। যা তাবা কোনদিনই ভুলবে না। এইভাবে পাবস্যেব মধ্যে 'মন্ত্রেব সাধন কিংবা শবীব পাতন' প্রতিজ্ঞা সহকাবে সমব প্রস্তুতি চলতে থাকল।

ঐতিহাসিক কাদিসিয়াবেব যুদ্ধ (৬৩৬-৩৮ খ্রী:):

খলিফা ওমবেব নিকট পাবস্যবাজেব পূর্ণ প্রস্তুতিব কথা পৌঁছিযে গেল। তিনি ঐ অঞ্চলে সেনাপতি মুসান্নাকে সমস্ত বাহিনীকে একত্রিত কবে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন। নিজে সমগ্র আববে সমব প্রস্তুতি নেওযাব জন্য শুবাব (পবিষদেব) সভা আহ্বান কবলেন। তিনি এই সভাকে কযেকটি ভাগে বিভক্ত কবেন। যেমন সেনাবিভাগ, বুদ্ধিজীবী বিভাগ, কূটনীতি বিভাগ, কবি ও বক্তা বিভাগ। সকল গোত্রেব সাথে বাববাব পবামর্শ কবলেন— কি কবলে ভাল হয। এবাবও ত্রিশ হাজাব সৈন্য একত্রিত হল। সাদ বিন ওক্কাস তাঁব আপন গোত্রেব নিকট হতে সুসজ্জিত তিন হাজাব বাহিনী সহ খলিফাব সমীপে হাজিব হলেন। অতঃপব হাজ্বামাউত, সদক, খজহজ, কাযেস ও ইলান গোত্রেব নেতাগণ উপস্থিত হলেন প্রত্যেকেই আপন আপন বাহিনী সহ। এখানে ইযামেনেব গোত্রগুলোও এক হাজাব সৈন্য পাঠান, এবং বানু তামিম গোত্র চাব হাজাব ও বানু আসাদ গোত্রও তিন হাজাব সৈন্য সহ উপস্থিত হল।

ইতিমধ্যে খলিফা ওমব মক্কা হতে হজব্রত পালন কবে মদিনায প্রত্যাবর্তন কবেছেন। মদিনাব চাবিপার্শ্বে বহু সেনা দেখে খলিফা খুবই খুশি হলেন। খলিফা নিজেই এই বিশাল বাহিনীব পবিচালনাব ভাব গ্রহণ কবলেন। অতঃপব খলিফা এই বিশাল বহিনীটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত কবে ইবাকেব দিকে যাত্রা কবলেন। সম্মুখ ভাগেব অধিনাযক নিযুক্ত কবলেন তালহাকে, দক্ষিণ দিকেব—জোবাযেব, ও বাম দিকেব আব্দুব বহমান বিন আউফ। সকলেই একমত হলেন মদিনা হতে মাত্র তিন মাইল দূবে সবাব নামক ঝবনাব পাশে সৈন্য শিবিব স্থাপন কবাব জন্য। ওখানে সদলবলে সকলেই হাজিব হওযাব পব খলিফা একটি সামবিক পবিষদ গঠন কবলেন। এই সামবিক

পরিষদই বিবেচনা করবে যুদ্ধের মূল বিষয়গুলো। পরিষদ গভীর ভাবেই চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল খলিফাকে স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করার ভার দেওয়া মোটেই সমীচীন হবে না। যদিও খলিফা যুদ্ধ পরিচালনাতে আগ্রহী ছিলেন। অতঃপর হযরত আলীকে অনুরোধ করা হল যুদ্ধে সর্বাধিনায়কের পদটি অলঙ্কৃত করার জন্য। তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করায় পরিষদ মহানবীর খালাতো ভাই ও বিশিষ্ট সাহাবী সাদ-বিন-ওক্কাসকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন। খলিফা পরিষদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও নিজেই সমস্ত কিছু তদারকি করার জন্য সজাগ থাকলেন। কখন যুদ্ধ আরম্ভ হবে, কিভাবে আরম্ভ হবে, মদিনা থেকে ইরাক পর্যন্ত কোথায় কোথায় যুদ্ধের ছাউনি পড়বে ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নের তিনি ছিলেন একমাত্র উত্তরদাতা।

খলিফার নির্দেশমতো সেনাপতি সাদ প্রথমে সালাবা নামক স্থানে ছাউনি স্থাপন করেন। এখানে প্রতি বছর মেলা বসত এবং পানি সরবরাহের ব্যবস্থা খুবই ভালো ছিল। সেনাপতি মুসান্না আট হাজার সৈন্য-সহ সাদের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য খিকার নামক স্থানে অপেক্ষা করছিলেন। বুয়ায়েবের যুদ্ধে সেনাপতি মুসান্না গুরুতরভাবে আঘাত পেয়েছিলেন। সেই আঘাতেরই ফলে তিনি এখানে মারা যান। মুসলিম বাহিনী এক অসাধাবণ ও অকৃত্রিম সমরবিশারদকে হারাল। এবাব সেনাপতি সাদ সালাবা হতে যাত্রা করে শরফ নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। বর্তমানে তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বমোট ত্রিশ হাজার। এইবার তিনি খলিফার নিকট হতে বিস্তারিত নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। অতঃপর খলিফার নির্দেশমতো তিনি তাঁর বাহিনীকে মোট সাতটি ভাগে বিভক্ত করলেন। এই যুদ্ধে রসদের দায়িত্ব পেয়েছিলেন বিখ্যাত ইরানী সাহাবী সাল্‌মান ফারসী। সবের ওপর এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন বদর যুদ্ধের যোগদানকারী সত্তরজন সাহাবী এবং মক্কা বিজয়ের বহু অংশীদার সাহাবা।

খলিফা সেনাপতি সাদ-বিন-আবি ওক্কাসকে নির্দেশ দিলেন এই যুদ্ধ সংঘটিত হবে কাদিসিয়ার প্রান্তরে। কাদিসিয়ার শহরটি ছিল কুফা শহর হতে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। তার প্রান্তরটি ছিল যুদ্ধের জন্য একান্তভাবেই খুবই উপযোগী। খলিফা বহু পূর্ব হতে এই প্রান্তরটিকে জানতেন। যেখানে ছিল প্রচুর খাল ও বিল, প্রচুর পানির সংযোগ, শস্য-শ্যামলা। সুতরাং এইটাই ছিল আরবদের জন্য চমৎকার নিরাপদ স্থান। এতদ্ব্যতীত খলিফা সেনাপতিকে বর্তমান কাদিসিয়া প্রান্তরের সম্পূর্ণ নকশা তৈরি করে তাঁর নিকট পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। এই যুদ্ধে যত রকম সতর্কতা অবলম্বন করা যায়, খলিফা জ্ঞানতভাবে তার কোনটিই এড়িয়ে যাননি। কেননা খলিফা তাঁর জ্ঞানে ও দিব্যজ্ঞানে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন এই যুদ্ধই পারস্য ও আরবের ভাগ্য নির্ণয় করে দেবে। এটা হবে চূড়ান্ত যুদ্ধ।

সেনাপতি সাদ-বিন-আবি ওক্কাস এবার আর একটি ধাপ অগ্রসর হলেন, কাদিসিয়ারের কাছাকাছি হলেন। ছোট্ট শহরটির নাম ছিল খাদিব। এখানে একটি চমৎকার ঘটনা আকস্মিক ভাবেই ঘটে গেল। যার জন্য মুসলিম সেনারা খুবই অনুপ্রেরণা পেলেন। এই খাদিব শহরটিতে পারস্যের একটি বলিষ্ঠ অস্ত্রাগার ও যুদ্ধের মালখানা ছিল। বিনা আয়াসে এটি মুসলিম সেনাদের হস্তে এসে গেল। পারস্য বাহিনী তখন ব্যাপক, বিরাট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। সেনাপতি সাদ গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেলেন পারস্য বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মহাবীর রুস্তম রাজধানী মাদায়েন ত্যাগ করছেন। এই সংবাদ খলিফার নিকট পাঠান হল। এবার খলিফার নির্দেশ এল সেনাপতি যেন যুদ্ধ আরম্ভ করার পূর্বেই অতি অবশ্যই দূত পাঠিয়ে পারস্যরাজকে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান বা আমন্ত্রণ জানান। সেনাপতি সাদ খলিফার নির্দেশমতো আরব গোত্রের সম্মানিত চোদ্দজন দলপতিকে নুমান-বিন-মকরানের নেতৃত্বে পারস্য রাজের নিকট পাঠালেন।

কাদিসিয়ার থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বাদশাহ্ নওশেরওয়াঁর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী মাদয়ান। তৎকালে এত সুন্দর, এত শোভাময় শহর সারা পৃথিবীতে খুবই কম ছিল। আরব দূতগণ অকুতোভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে রাজধানী মাদায়েনে উপস্থিত হয়ে রাজার দর্শনপ্রার্থী হলেন। রাজা ইয়েজদ্গির্দ অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে আরবীয় দূতগণকে আহ্বান জানালেন। সর্বপ্রথম রাজা দূত-প্রধান নুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে আসার হেতু কি! তখন নুমান উত্তরে বলেন—"ইসলামের মহানবী এই দুনিয়াতে এসেছিলেন—রাজ্য গড়তেও নয়, এবং রাজ্য ভাঙতেও নয়। আল্লাহর পথে ডাক দিতে। তিনি এসেছিলেন মানুষকে পথ দেখাতে, সত্য ও সুন্দরের পথে চলতে, শেখাতে, মৃত্যুপ্রায় মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে, দুর্গত মানবতাকে উদ্ধার করতে। শ্রেণীহীন মানব সমাজ গড়ে তুলতে।" সুতরাং আমরা এসেছি আপনাকে ঐ ইসলামের দাওয়াত দিতে, আপনি যদি ইসলাম কবুল করেন, তাহলে আমরা এখনিই ভাই ভাই, অথবা যদি জিজিয়া দেন, তাহলেও আপনি নিরাপদ, অন্যথায় অস্ত্রই এ বিরোধের মীমাংসা করে দেবে।"

রাজা উত্তর দিলেন—"তোমরা কি করে ভুলে গেলে যে তোমবা ছিলে অতি দরিদ্র ও দীনতম ও ঘৃণ্যতম জাতি। তোমরা অতীতে যখনই সামান্যতম বিদ্রোহ করেছ, তখনই তোমাদের মাথা চূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি তোমরা চাও আমি তোমাদের প্রাপ্য অতীব অকৃপণ ভাবেই মিটিয়ে দেব। সমরসাধ মিটিয়ে দেব।" সম্রাটের এই কঠিন উত্তরে ঐ চোদ্দজনের একজন—মুগিরাহ-বিন-যুরারহ্ ক্ষোভে-অপমানে সিংহের মত গর্জিয়ে উঠলেন। রাজদরবার যেন ক্ষণিকের মধ্যে কেঁপে উঠলো।

অতঃপর মুগিরাহ্ আরবের সহজাত আত্মসম্মান বোধ শক্তি-সহ্ বলতে আরম্ভ করলেন—

"হে সম্রাট! আমার সঙ্গে যে চোদ্দজন ব্যক্তি এখানে এসেছেন, তাঁরা আরবকুলের শিরোমণি, কৌলিন্য তাঁদের রক্তের কণায় কণায় মিশে আছে। আমি আমার ও তাঁদের সকলের পক্ষ হতেই আপনাকে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি অবাধে স্বীকার করি—আমরা ছিলাম ঘৃণ্য, অজ্ঞ, পরস্পব হানাহানি ও কাটাকাটি করতাম। আমবা আমাদের শিশুকন্যাদের হত্যা করতাম। এককথায আমরা আরো অনেক জঘন্যতম কাজ করতাম। আমরা ছিলাম অন্ধকার যুগের অজ্ঞ মানব।

তবে একটি কথা জেনে রাখবেন, সত্য বলা আমাদের স্বভাব-ধর্ম, বীবত্ব আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি, দুঃসাহসিকতা আমাদের অতীব প্রিয়বৃত্তি, দুষমনকে শেষ করতে পৃথিবীতে আমরা অদ্বিতীয় সন্তান, ভয়-ভীতি, লোভ লালসা, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতি ইত্যাদি এই জাতিকে কোনদিনই স্পর্শ কবতে পারে না। মহান আল্লাহ্ পরম করুণাবশত আমাদের এই দুর্বাব ও দুর্জয শক্তিকে সুপথে পবিচালিত করার জন্য আমাদেব মধ্যে সমগ্র মানবমণ্ডলীব জন্য একজন নবী পাঠালেন। প্রথম দিকে আমরা তাঁকে ভুল বুঝেছিলাম, পরে আল্লাহ্ আমাদের বোধশক্তি দিলেন। আমরা তখন তাঁব সঠিক মূল্যাযন করতে শিখলাম। তিনি আমাদেব নির্দেশ দিযে গেছেন—এই ধর্মকে পৃথিবীব ঘরে ঘরে কোণায কোণায পৌঁছিয়ে দিতে হবে। আমবা জীবন মবণ পণ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি তাঁব দেওয়া পবিত্র নির্দেশকে পালন কবাব জন্য। এই প্রতিজ্ঞার অগ্র ও পশ্চাতে কোন বকমেবই কোনরূপ দুবভিসন্ধি নেই। উদ্দেশ্য একটিই মাত্র ইসলাম প্রচাব। আমরা জীবনকে ততটুকুই ভালবাসি, আপনারা মৃত্যুকে যতটুকু ভালবাসেন; আমবা মৃত্যুকে ঐ ভাবেই আলিঙ্গন করি, আপনাবা যেভাবে দুনিযাকে আলিঙ্গন করেন। সুতবাং ইসলাম গ্রহণ করে আমাদেব প্রাণেব ভাইযে পবিণত হন, কিংবা জিজিয়া দিযে নিবাপদ থাকুন, অথবা অস্ত্র ধাবণ করে এ সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসা করুন।"

উত্তবে সম্রাট ইয়েজদ্গির্দ ক্রোধে অগ্নিবৎ হয়ে বলে উঠলেন—"আজ যদি রাজনীতিতে দূত-হত্যা বৈধ হতো, তাহলে তোমাদেব কেউই আব ফিবে যেত না। অতঃপর সম্রাট এক ঝুড়ি মাটি আনতে নির্দেশ দিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাদেব মধ্যে মানে মর্যাদায শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে! আসিম বিন ওমর বুঝতে পারলেন যে, বিপদ প্রথম তাঁব ঘাড়েই চাপবে। তাই তিনি আর কালবিলম্ব না কবেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তব দিলেন—'সে ব্যক্তি আমি।' তখন সম্রাট তাঁর পরিষদবর্গকে তাঁর মাথাতেই ঐ মাটিব ঝুড়িটি চাপিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। সম্রাট বোঝাবার চেষ্টা কবলেন—তোমবা জানোযাব

বা গাধার দল, তাই ভারবাহী গাধার মতোই বাড়ি ফিরে যাও। আসিম ও অন্যান্য সকলেই কালবিলম্ব না করেই অতীব দ্রুততার সাথে আপন শিবিরে ফিরে এসে ঐ মাটির ঝুড়িটি সেনাপতি সাদকে উপহার দিয়ে বললেন—'মুবারক বাদ! আল্লাহ্ আপনাকে ঐ দেশের মাটি দান করেছেন, শত্রুপক্ষ বা সম্রাট স্বেচ্ছায় নিজের দেশ আপনাকে সমর্পণ করেছেন। আপনি আল্লাহব দরবারে শোকরিয়া করুন। জয় আমাদের অনিবার্য।'

সেনাপতি সাদ খলিফাব মূল উদ্দেশ্য খুব ভালভাবেই জানতেন। খলিফারও আন্তরিক ইচ্ছা ছিল—রক্তহীন সমাধান, রক্তক্ষযী সংগ্রাম সবসমযই এডিযে চলা। তাই তিনি আবার শেষ বারের মতো শেষ চেষ্টা করলেন—পারস্য-সেনাপতি রুস্তমের নিকট রাবী-বিন-আমীর নামক একজন দূতকে প্রেবণ কবে। যাতে সংগ্রাম এড়ানো যায়। সেনাপতি রুস্তম দূত রাবীকে জিজ্ঞাসা করেন—'তোমাদের মূল উদ্দেশ্য কি!' রাবী উত্তরে বলেন—এ কথার জবাব আমাদের মহান নবীজী দিয়ে গেছেন—'সৃষ্টির পরিবর্তে স্রষ্টাব উপাসনা হোক, এই পৃথিবীতে সাম্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠুক। এইটিই ছিল মহানবীর একান্ত ইচ্ছা, ব্রত ও বাসনা':

মনের কোণে দেখেছি তোমার দুইটি ছিল আরাধনা
সাম্যের বুকে সমাজ গড়া প্রতিপালকের বন্দনা।
ধরাব বুকে কোবআন প্রচার পবিত্র তোমাব পেশা
মানব জাতিব উত্থান ছিল একটি তোমাব নেশা।
বিশ্ববুকে তোমার ব্রত বিশ্বপিতার বন্দনা
সেই পিতাবই সন্তান সবে এক অভিন্ন ভাই জানা।

কোবআন — ১.১-৭, ২.১১৮. ২৮০. ৩'১৩০,১৪৪. ৮৮:২১. ২২।

সেনাপতি রুস্তম সব শুনে উত্তব দিলেন-- সম্রাটেব সাথে পবামর্শ করেই মীমাংসা কবা যাবে।

অতঃপর সেনাপতি সাদ-বিন আবি ওয়াক্কাস আবাব সেনাপতি রুস্তম দববাবে মুগিরাহকে পাঠালেন, যাতে বক্তক্ষযী সংগ্রাম এডান যায। মুগিবাহ এবাব রুস্তমের পাশে বসেই আলোচনা শুরু কবলেন। তখন রুস্তমেব সভাসদবা এই দৃশ্য দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়েই মুগিবাহকে আসনচ্যুত কবতে উদ্যত হলে মুগিরাহ বিনয়েব সাথে উত্তর দিলেন - 'আমি তোমাদেব অতিথি, সুতবাং অতিথির যোগ্য মর্যাদা আমি পেতে চাই। আপনাবা জেনে বাখুন, আমাদেব মধ্যে এমন কোন নীতি নেই, যেখানে একজন মানুষ দেবতা, বাকি সব দাস। আমাদের নীতি আল্লাহ্ একমাত্র দেবতা, বাকি সব মানুষই তাঁবই দাস। আপনারা জেনে রাখুন, 'মানুষ একজনেরই মাত্র দাস, সেটা আল্লাহব

দাস, মানুষ কোনদিনই দ্বিতীয় বার অন্য কারো দাস বলে পরিগণিত হতে পারে না। তাই ইসলামে দাসপ্রথা একেবারেই নিষিদ্ধ। ইসলাম বলে—সকল মানুষই আল্লাহর দাস, সকল মানুষই সমান। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। কোরআন বলে—

যখনই নিবিড় প্রাণে মানুষেরে ছুঁই
দেখি না মানবশিশু এক ভিন্ন দুই।
ইসলামের মূলমন্ত্র করিলে মন্থন
এক-ই পিতার পুণ্যে মোরা ভাই বোন।
কোরআন হাদিস মূলে শিক্ষা যেটি পাই
এক-ই মায়ের কোলে মোরা ভাই ভাই।

কোবআন: ২:১১৩, ৩:১১০, ৪:১, ৭.. ৯, ১১:১১৮, ২১:৯২।

আরব দূতের এইরূপ তেজোদৃপ্ত ভাষণে রুস্তমের সভাসদদের মধ্যে নানা গুঞ্জণ আরম্ভ হয়ে গেল। তাঁরা গোপনে বলাবলি করতে থাকলেন—'এ জাতিকে পরাজিত করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার হবে না।' সেনাপতি রুস্তম তাঁব সকল দুর্বলতাকে চাপা দিয়ে পারস্য-সম্রাটের বিশাল শক্তি ও বিশাল সাম্রাজ্যের কথা তাঁকে দাদাগিরি চালে শুনিয়ে দিলেন। এবং পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন, এখনও যদি তাঁরা মানে মানে ফিরে যায়, তাহলে পারস্যরাজ ও তিনি তাঁদের বেয়াদবিকে ক্ষমা করে দেবেন এইবারের মতো। তখন মুগিরাহ আপন কোমরের ঝুলন্ত বিশাল তরবারিতে হাত রেখেই উত্তর দিলেন—আপনারা যদি ইসলাম কিংবা জিজিয়া স্বীকার না করেন, তাহলে এই তররাবিই এর মীমাংসা করে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে রুস্তম ক্রোধে অন্ধ হয়ে উত্তর দিলেন—'আমি আগামীকালই সমগ্র আরবকে ধ্বংস ও ধূলিসাৎ করব'। এবার বেজে উঠল যুদ্ধ দামামা।

যুদ্ধ আরম্ভ:

পারস্য সেনাপতি রুস্তম ইতিহাস বিখ্যাত একজন অসাধারণ বীর সন্তান। অসাধারণ সমরবিদ, অসাধারণ কূটনীতিবিদ। এককথায় তিনি ছিলেন এক মহা শক্তিধর-ব্যক্তিত্ব। পারস্যরাজের আশা ও ভরসার একান্ত আশ্রয়স্থল। তেজদৃপ্ত কণ্ঠে সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত হওয়ার কঠোর নির্দেশ দিলেন। সমগ্র সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের সুবিধার জন্য তেরোটি ভাগে বিভক্ত করারও আদেশ দিলেন। অন্যান্য সেনানায়কগণ বিদ্যুৎ বেগে আদেশ পালন করতে থাকলেন। কেন্দ্রীয় মূল ব্যূহের পশ্চাতে রাখা হল অজস্র রণনিপুণ হস্তীপাল, সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ গজারোহী বাহিনী, তার পশ্চাতে সুশিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনী। ডানে ও বামে ছিল বিশালাকার হস্তীসমূহের পর্বতমালা। রাজধানী মাদায়েন

হতে যুদ্ধপ্রাঙ্গণ কাদিসিয়া পর্যন্ত সমস্ত রাস্তার মাঝে মাঝে ছিল সৈন্য শিবির, অসংখ্য দূত, গুপ্তচর, অতি দ্রুতগামী বার্তাবাহক। সকল কিছুই যেন আয়নার মতো পরিষ্কার, কোথাও কোন খুঁত নেই। সাহস-শক্তি-সমৃদ্ধি-সমরায়োজন সকল কিছুই যেন একেবারেই নিখুঁত। মহিলা ও অন্যান্য সাহায্যকারী ব্যতীতই সৈন্যসংখ্যা ছিল ১,২০,০০০। এককথায় পারস্যরাজের সবকিছুই ছিল অগণিত-অপরিসীম। মনোবলও কম ছিল না। তাঁদের অতিরিক্ত অন্ধ মনোবলও তাঁদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল। কোরআন বলে—"সীমালঙ্ঘন করো না, আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" ৫:৮৭, ৭:৫৫ ১১:৪৪। যখন সেনাপতি রুস্তম বললেন আগামীকালই আমি আরবকে ধ্বংস করে দেব। তখনই পার্শ্ববর্তী একজন সাধারণ সেনা বললেন—'নিশ্চয়ই, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে।' তখন রুস্তম আবেগ ও উত্তেজনায়, গর্বে ও অহঙ্কারে উত্তর দিলেন—'ঈশ্বর ইচ্ছা করুন বা নাই করুন, আমার ইচ্ছাতেই সবকিছু সমাধা হবে।' সোনপতি ভুলে গিয়েছিলেন—'ঈশ্বর সর্বোপরি, সর্বশক্তিমান।' ৩:১৮৯। 'পৃথিবীতে গর্বভরে চলো না, অহঙ্কারীর পতন অনিবার্য।' ৪:৩৬, ৭:১৪৬, ১৭:৩৭, ২৮:৭৬, ৩০:১১০, ৩১:১৮, ৩৯:৭২।

মুসলিম সেনাপতি দিবারাত্রি পরিশ্রম করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি খালিদ বিন আরফতাহকে সৈন্য পরিচালনার ভার দিলেন। এবং তিনি এমন একটি উচ্চগৃহে আশ্রয় নিলেন; যেখান হতে যুদ্ধের সমস্ত কিছু লক্ষ্য করা যায়। ঐ সুউচ্চ গৃহটি হতেই তিনি যুদ্ধের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকলেন। আরব প্রথানুযায়ী সৈনিকগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওযা মাত্র আরবের বিখ্যাত কবি ও বক্তাগণ সৈনিকগণকে সুললিত কণ্ঠে-ছন্দে তাঁদের যুদ্ধ উন্মাদনা জাগিয়ে তুললেন। অন্যদিকে বেজে উঠল যুদ্ধ দামামা। অতঃপর যুদ্ধের শেষ শব্দ উচ্চারিত হল, তকবির ধ্বনি—'আল্লাহু আকবাব।' সঙ্গে সঙ্গে বণভূমি যেন কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

যুদ্ধের প্রথম দিন:

চতুর রুস্তম আরবদের একটি দুর্বল দিক লক্ষ্য করে প্রথমেই সেই দিকটিকেই সজোরে এগিয়ে দিলেন। আরবদের কোন হস্তী ছিল না। তাই পারস্য সেনাপতি সর্বপ্রথম হাতির দলটিকেই মুসলিম সেনাদের অগ্রভাগে পাঠিয়ে দিলেন। আরবদের ছিল অশ্ব। অশ্বগুলো বিশালকায় হাতিগুলোকে দেখেই পিছু হটতে আরম্ভ করে। আরবের বিখ্যাত অশ্বারোহী দল বাহিলাহ পারস্য হস্তীগুলোর সম্মুখীন হয়ে বেশ কিছুটা যেন হতভম্ভ হয়েই আপানদের তেজের তীব্রতাকে হারিয়ে ফেললে সেনাপতি সাদ আসাদ গোত্রের পদাতিক নেতাকে নির্দেশ দেন তারা যেন ওদের হস্তীগুলোকে তীরবৃষ্টির সম্মুখীন করে। একদিকে আসাদ গোত্রের অসাধারণ পদাতিক ও অন্যদিকে বানু বংশের তীরন্দাজরা অত্যন্ত তীব্র আক্রমণের

সাহায্যে হস্তীদলকে একেবারেই রণাঙ্গন ছাড়িয়ে দিল। সেনাপতি সাদের সিদ্ধান্তই ছিল—তাঁরা পারস্য-হস্তীযূথকে বিখ্যাত আরবীয় তীরন্দাজ দ্বারা আঘাত করবেন। আরবের কৌশল সফল হল। তীরন্দাজদের বিরুদ্ধে হাতি ঘোড়া কোনটাই এগোতে পারে না, যদি তীরন্দাজ দল পারদর্শী হয়। প্রকারান্তে যুদ্ধের প্রথমদিনেই পারস্যের রণকৌশল ব্যর্থ হল।

যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করার সময় সেনাপতি সাদের পাশে ছিলেন তাঁর পত্নী সালমা। যখন হাতির সাথে ঘোড়ার মুখোমুখি সমরে আরবীয় ঘোড়াগুলো কিঞ্চিৎ পিছু হটছে, তখন পত্নী সালমা আবেগ কণ্ঠে বলে উঠলেন—'হায়, আজ যদি বীর খালিদ্ উবায়দা ও মুসান্না থাকত! সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি পত্নীর গালে এক চড় দিয়ে বললেন—'চুপ! এখানে মুসান্না থাকলে আর কিই বা করতে পারত।' সঙ্গে সঙ্গে আরব-বীরাঙ্গনা স্বামীর গালে নয় বিবেকে তিন চড় চড়িয়ে দিয়ে বললেন—'হায় খোদা, কাপুরুষদেরও আত্মমর্যাদা জ্ঞান থাকে!' বীরাঙ্গনা সালমা ছিলেন—পরলোকগত বীর সেনাপতি মুসান্নার বিধবা পত্নী। পরে সাদ্‌কে বিবাহ করেন।

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন :

খলিফা ওমর বিখ্যাত কাদিসিয়ারের যুদ্ধের জন্য সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি সেনাপতি আবু উবাইদাকে সিরিয়া প্রান্ত হতে তাঁর সেনাবাহিনীকে কাদিসিয়ারে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। খলিফার নির্দেশমতো দু'হাজার বিখ্যাত আরবী সেনা যুদ্ধের প্রথম দিনে যোগদান করতে না পারলেও দ্বিতীয় দিনে যথাসময়েই যোগদান করল। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, এই বাহিনীটিতে ছিলেন বীর জগতের প্রবাদ পুরুষ কাকা বিন আমরু। কাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে এতটুকুও সময় নষ্ট না করেই আপন সৈনিকদের নিয়ে শ্রেণীবিন্যাস আরম্ভ করেন। কাকার উপস্থিতিই পাবস্য বাহিনীর মনোবলকে যথেষ্ট আঘাত করে। বীর কাকা রণাঙ্গনে নামা মাত্রই পারস্যের কাপুরুষদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে তাঁদের আত্মমর্যাদায় প্রথম আঘাত হানেন। কাকার বারবার অমিত আহ্বানে পারস্য বাহিনী হতে বাহমন শাহ কাকার বিরুদ্ধে ময়দানে নামলেন—'মল্লযুদ্ধে'। বাহমনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই কাকা চিৎকার করে বলে উঠলেন—"সুবহান্-আল্লাহ্, কি অপূর্ব সুযোগ, এই কাপুরুষই সেতুর যুদ্ধে নিরস্ত্র নিরুপায় সেনাপতি আবু উবাইদাকে হত্যা করে বীরের ধর্মে আঘাত হেনেছিলেন। ঐ কাপুরুষকে আমি আজ আর ময়দান হতে সশরীরে ফিরতে দেব না। মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার নিমিষের মধ্যেই তিনি বাহমনকে ওপারে পার করে দিলেন। যখন অনেকে ভাবতেই পারেনি যে, এখনও ঠিকমতো মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। অতঃপর কয়েকজন পারস্য বীরই মল্লযুদ্ধে নেমে পড়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন বীরের সাথেই যুদ্ধ ঠিকমত আরম্ভ হয়নি।

বীর কাকাকে দেখা মাত্র প্রত্যেকেরই চোখে বাঘ-ছানি পড়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য সূচনাটি ছিল বড়ই সুন্দর।

মল্লযুদ্ধের পরিণতি উভয় পক্ষেই দারুণ প্রভাব বিস্তার করল। মুসলমানগণ দ্বিগুণ শক্তি লাভ করলেন। অন্যদিকে, পারস্যবাহিনী মল্লযুদ্ধে পর পর কয়েকজন বীরকে হারিয়ে একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়ে। কোন যুদ্ধে কোনদিনই সংখ্যা শক্তি জোগায় না, বরং সৈনিকদের মনোবলই শক্তি জোগায়। পারস্যবাহিনী মল্লযুদ্ধে এই মনোবলকে হারিয়ে ফেলেছিল। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধটিকে দুই-জন বীরই প্রকারান্তে পার করে দিলেন। প্রথম জন বীরবর কাকা, এবং দ্বিতীয় জন বীরবর মহজন।

বুদ্ধিমতি সালমা ও খানসা :

মহজনের একটু পানাভ্যাস দোষ ছিল। তাই সেনাপতি সাদ তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে না দিয়ে বন্দী করে রেখেছিলেন। বীর মহজন বন্দী অবস্থা হতেই যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করে কখন বিষধর সর্পের ন্যায় তীব্রভাবে ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন, কখন সিংহের অমিত বিক্রমে গর্জন করতে থাকেন। তাঁকে এই অবস্থাতে দেখে সাদের পত্নী সালমা জিজ্ঞাসা কবলেন—কি হয়েছে। তখন মহজন সব কথা খুলে বলে আরজ করলেন—আমাকে ছেড়ে দিন, এবং সেনাপতি সাদের ঐ বল্‌কা অশ্বটিকে দিন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চাই। কিন্তু সালমা অস্বীকার কবায় তিনি মনেব দুঃখে একটি কবিতা আবৃতি করতে থাকলে, বীরাঙ্গনা সালমা আর নিজেকে স্থির রাখতে না পেরেই ঐ বীর বন্দীকে মুক্তি দেন। মহজন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই যেন যুদ্ধের মোড় ফিরে গেল। পারস্য বাহিনী বারবার চিন্তা করতে থাকল—এই মহাবীর কে, কোথায় ছিলেন। বীর মহজনের আক্রমণের পদ্ধতিটিও ছিল একেবারেই নতুন। সেনাপতি সাদও বারবার চিন্তা করছেন—এতো মহজনের যুদ্ধ, কিন্তু সে তো বন্দীগারে। দিবাবসানে যুদ্ধ বন্ধ হল। সকলেই আপন আপন শিবিরে ফিরলেন। মহজনও আপন বন্দীগারে ফিবে এসেই আবার নিজ হাতে শিকল পরলেন, তখন সালমা স্বামী সাদকে সকল কিছু ব্যক্ত করলে সেনাপতি সাদ আনন্দে অভিভূত হয়ে বুদ্ধিমতি স্ত্রীকে ধন্যবাদ-সহ অভিনন্দন জানালেন, এবং বন্দী মহাবীর মহজনকে আলিঙ্গন-সহ মুক্ত করলেন।

আরো একজন আরবীয় বীরাঙ্গনা এদিনের যুদ্ধের গতিপরিবর্তনে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। তাঁর নাম খানসা। তিনি একদিকে ছিলেন বীরাঙ্গনা, অন্যদিকে ছিলেন বিখ্যাত কবি। তিনি তাঁর চারজন বীর পুত্রকে নিয়ে এদিনের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। বীরমাতা দিনের শেষে চার পুত্রের একজনকেও আর কোলে ফিরে পাননি। আরব বীরের ইতিহাসে, বীরাঙ্গনার ইতিহাসে আজও সালমা খানসার নাম চির অম্লান।

কোন কালে একা করোনিক জয়—পুরুষের তরবারি
শক্তি দিয়েছে সাহস দিয়েছে—বিজয় লক্ষ্মী নারী।

—নজরুল

এদিনের যুদ্ধের হতাহত ছিল—রোমানদের দশ হাজার এবং মুসলমানদের দুই হাজার।

যুদ্ধের তৃতীয় দিন :

বিশাল পারস্য বাহিনী যুদ্ধের তৃতীয় দিনে যেন একটি বাস্তব জিনিসকে চিন্তা করতে বাধ্য হল। তারা বুঝতে পারল, যদিও তাদের সৈন্য সংখ্যা আরবদের অপেক্ষা অনেক বেশি, তবুও ঐ বেশি সংখ্যক সৈন্য দ্বারা ঐ কম সংখ্যককে আর জয় করা যাবে না। তখন তারা চিন্তা করল একমাত্র হস্তীযূথ দ্বারাই ওদেরকে পরাস্ত করা যেতে পারে। এই চিন্তা-সহ তারা তাদের সমস্ত হস্তীগুলোকে সারিবদ্ধভাবে রণাঙ্গনে দাঁড় করাল। যে দুটো হাতি সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত ছিল—আবইয়াদ ও আজরাব, তাদেরকে সমস্ত হাতির সম্মুখ ভাগে দেওয়া হল, যাতে অন্যান্যগুলো ওদের ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে। এই দিনে খলিফা ওমরের নির্দেশমতো সিরিয়া হতে আরো সাতশো সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা যুদ্ধে যোগদান করে মুসলিম মহলে নতুন সাহস ও নব উদ্দীপনা দেখা দিল। এই সাতশো জনের অধিনায়ক হিশাম সকলকে তাঁদের বীরত্বের কথা আবার একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন—আজ তোমাদের বীরত্ব সত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোক। ওদের হস্তীগুলোকে তোমরা স্থবির পাহাড় ও পবর্তে পরিণত করো। আল্লাহ্ তোমাদের জয়ী করুন। তোমরা চেষ্টা করো।

কোরআন — ১৩:১১, ৫৩: ৩, ৮৯: ৫৩।

সেনাপতি সাদ বারবার চিন্তা করতে থাকলেন—কি করে ওদের হস্তীগুলোকে অকর্মণ্য করা যায়। তখন দুজন পারসিক মুসলমান সালাম ও দু'খান সেনাপতিকে পরামর্শ দিলেন—পারস্যের ঐ দুটো শিক্ষিত হস্তীর চোখ ও শূঁড় নষ্ট করতে পারলে আর কোন ভয় নেই। পারস্যের সমস্ত হস্তীযূথ ঐ দুটো হস্তীকেই একমাত্র অনুসরণ করল। ঐ দুটোকে বাদ দিলে পারস্যের কোন হাতিরই আর কোন মূল্য নেই। অতঃপর সেনাপতি সাদ কাকা, হাম্মাল ও রাবিলকে ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে হিশাম তাঁর সুশিক্ষিত অশ্বারোহী দ্বারা ঐ হস্তী দুটোকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন, এবং বাকি সকলেই তীর ও বর্শা দ্বারা ঐ সরদার হস্তী দুটোকে অচল করার চেষ্টা করবেন। যেমন কথা তেমনি কাজ, বীর কাকা তাঁর সঙ্গীদের সাহায্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্দার হাতি আবইয়াদকে অন্ধ করে তার শূঁড় কর্তন করে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আজরাবও কয়েদ হয়ে পড়ে রাবিল ও হাম্মালের হাতে। অন্ধ ও

শূঁড় বিহীন সর্দার হস্তীদ্বয়ের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে অন্যান্য সকল হস্তীযূথ ক্ষণিকের মধ্যেই সমরভূমি ত্যাগ করে। এই খানেই হস্তী পশু যুদ্ধ শেষ হল।

আরম্ভ হল সহস্র সহস্র মানুষের যুদ্ধ। আরম্ভ হল আহতদের ক্রন্দন, ও মুমূর্ষুদের আর্তনাদ। শত শত বর্শা ও সহস্র সহস্র তররাবির ভীষণ শব্দে আকাশ-পাতাল যেন কেঁপে উঠতে থাকল। উভয়পক্ষেই দাঁড়িয়ে গেল অশ্বারোহী, বর্শাধারী, তীরন্দাজ ও পদাতিক প্রভৃতি সৈনিকগণ। কোথাও যুদ্ধের রণহুঙ্কার, কোথাও দামামা, কোথাও তকবির ধ্বনি যুদ্ধক্ষেত্রকে এক ভয়াবহ রূপ দান করেছে। সারাদিন যুদ্ধ চলল, কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন সঠিক নমুনা তখনও যুদ্ধ-বুকে ফুটে ওঠেনি। তখনও কেউই জানে না বিজয়-রবি কোন দিগন্তে উদিত হবে। ৩১ : ৫৪, ৫৯ : ১৮।

দিনের অবসান হল। রাত্রি আগত, কিন্তু যুদ্ধের কোন বিরাম নেই। এবার রণকুশল বীর কাকা চিন্তা করলেন—যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণয়ে অন্য পথ অবলম্বন করতে হবে। তিনি অতি সত্বর ওহোদ যুদ্ধে মহাবীর খালিদের পথ অনুসরণ করে একদল তেজস্বী সেনাকে সঙ্গে নিয়ে অতি অতর্কিতে অন্য পথে পারস্য সেনাপতি বীর রুস্তমকেই সরাসরি আক্রমণ করলেন, যেখান হতে রুস্তম স্বর্ণ সিংহাসনে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। সেনাপতি রুস্তম চিন্তাই করতে পারেননি যে, এরূপ অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে পারে। তাঁকে রক্ষা করার জন্য ফিরজান ও হরমুজান নামক জনৈক দুই বীর যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হলেন, তখন সেনাপতি রুস্তম নিরুপায় হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু প্রাণে বাঁচার পথ নেই, তাই পশ্চাদদিকে একটি ছোট নদীতে ঝাঁপ দেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হিলাল নামক এক মুসলিম সেনাপতি তাঁর পশ্চাদধাবন করে তাঁকে নদীগর্ভেই ধরে ফেলেন এবং তীরে তুলে হত্যা করেন। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে হিলাল বিদ্যুৎগতিতে মূল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে ঘোষণা করেন—তিনিই এ সিংহাসনের মালিক। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ যেন তার প্রাণ হারাল। কিছুক্ষণ নিষ্প্রাণ যুদ্ধ চলতে থাকল। চকিতের মধ্যে পারস্য বাহিনীতে বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তখনও কিছু পারসিক বীর শাহবীয়ার, ইবনুল হারবদ্, শানম, খসরু, আহওয়াজল, ফরখান প্রমুখ খ্যাতনামা বীরগণ ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু শেষাবধি সকলেই প্রাণ দিলেন। একমাত্র হরমুজান, আহওয়াদ ও ফেরান কোনক্রমে পলায়নপূর্বক জীবনে রক্ষা পান। এই যুদ্ধে পরিশেষে দেখা গেল ছ' হাজার মুসলিম সেনা শহিদ হন, এবং লক্ষেরও বেশি পারসিক সেনা নিহত হন।

পারস্য বাহিনীর পরাজয় হতো, কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা এত অধিক হতো

না, যদি তাঁরা সেনাপতি রুস্তমের সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ পেয়েও নিষ্প্রাণ দেহে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও শোভা বর্ধনের জন্য অহেতুক মৃত্যুর জন্য দাঁড়িয়ে না থাকতেন। অতীব দুর্ভাগ্য সেনাপতি রুস্তম নিছক একজন সেনাপতিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহাবীর, মহা কূটনৈতিক, তবুও আপন প্রাণরক্ষার জন্যই পশ্চাতের দরজা দিয়ে পলায়ন করলেন। তাঁর প্রাণের এতই ভয় ছিল। এত বড় ভীতু সেনাপতি দ্বাবা এত বড যুদ্ধ পরিচালিত হতে পারে না। তিনদিন মাত্র পূর্বে তিনিই বলেছিলেন—"ঈশ্বব সিদ্ধান্ত নিন আর নাই নিন, তাতে কি এসে যায, আমিই সিদ্ধান্ত নেবো।" এখন বুঝতে পারলেন—সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঠিক মালিকানা কার! ৩:২৫। সেনাপতি রুস্তমের ঐ ঔদ্ধত্যপূর্ণ অশালীন কথা শুনে মুসলিম সেনাপতি উত্তরে কি চমৎকার কথাই না বলেছিলেন—"কোন মানুষই জানে না, আগামীকাল সকালে সে কি করবে, কোন মানুষই জানে না—কখন কোথায় কিভাবে মৃত্যু বরণ করবে।" কোরআন —৩১:৩৪। সেনাপতি সাদ বাববাব যুদ্ধক্ষেত্রে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—তোমরা চিন্তা করো না, তোমবা শিথিল হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী, তোমবাই সমুন্নত, যদি তোমরা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসী হও। ৩:১৩৯, ২০:৬৮।

কাদিসিয়ারের যুদ্ধের দিনক্ষণ :

এই ঐতিহাসিক যুদ্ধটি তিনদিন এক বাত্রি স্থাযী হয। এব সঠিক দিনক্ষণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবনে খালদূনের মতে, ১৪ হিজরীতে অর্থাৎ ৬২২+১৪=৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে, আবুল ফবাদেব মতে, ১৫ হিজবীতে, আবার কেউ কেউ বলেন ১৬ হিজরীতে। এই যুদ্ধেব পূর্বে বেশ কযেকটি নামকবা যুদ্ধ পার হয়ে গেছে। সুতবাং আমাদেব ধাবণা ঐগুলোব সাথে সঙ্গতি বাখতে গেলে বিখ্যাত কাদিসিযাবেব যুদ্ধ ১৫ হিজবীতেই সংঘটিত হয।

ফলাফল :

বিশ্বশক্তি পদানত : তদানীন্তন বিশ্বে দুটো বৃহৎ শক্তি পৃথিবীতে ছিল। একটি রোমান শক্তি, অন্যটি পাবস্য শক্তি। কাদিসিয়াবেব যুদ্ধেব ফলে একটি বৃহৎ শক্তি পাবস্য আজ আববীয় মুসলমানদেব হস্তগত হল। কাদিসিযারের যুদ্ধ এদিক দিয়ে মুসলমানদের একটি চূড়ান্ত ফলদান করল। আজ বিশ্বশক্তি তাঁদের হাতের মুঠোতে বিদ্যমান। গতকালের অজ্ঞাত অখ্যাত আরব মরুচারীব দল আজ বহির্বিশ্বে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের দাবিদার হল। বিশ্বের ইতিহাসে খুব কম যুদ্ধই সংঘটিত হযেছে, যা একটি জাতিকে একদিনে বিশ্বশক্তিব সম্মান দান করতে পেবেছে। আজ আরব সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করল বিশ্বমানবেব প্রাঙ্গণে। একদিনের নিঃস্ব আরব আজ বিশ্বকে জয় করল। মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী আজ আরবীয়দের জীবনে ষোলকলায় পূর্ণ হল। পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম্যকে

আজ আরব মনেপ্রাণে বুঝতে শিখল। তারা কোথায় ছিল, কোথায় এল, কোথায় বসল। শিক্ষা-দীক্ষায়, মানে-সম্মানে, ধনে-জনে, ইতিহাসে-ঐতিহ্যে আজ তাদের তুলনা নেই। আজ তারা তুলনাবিহীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভাবনীয়। আজ তারা বিশ্বের গতিনির্দেশক, আজ তারা সভ্যতার চূড়ামণি। এ সবের মূলে—একজন নিঃস্ব-নিরক্ষর মানব—মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)। তাঁর জয়যাত্রাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন আর একজন মহামানব ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)।

তিনদিন: আরবগণ এই যুদ্ধের প্রথম দিনটিকে 'ইয়ামুল আরমাছ' বলে অভিহিত করে। এর অর্থ বিশৃঙ্খলা। এই দিন আরববাহিনী বিশাল পারস্য বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল করে দুর্বল করে দেয়। দ্বিতীয় দিনটিকে 'ইয়ামুল আগওয়াছ' অর্থাৎ সাহায্যের দিন বলে অভিহিত করে। কেননা এই দিন সিরিয়া হতে মহাবীর কাকার নেতৃত্বে একদল সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী সাদকে সাহায্য করে, যাদের সাহায্য এই বিজয়ে সীমাহীন গুরুত্ব বহন করে। তৃতীয় দিনটিকে 'ইয়ামুল উম্মাস্' দুর্দশার দিন বা 'লাইলাতুলহীরা' বা দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই দিন পারস্য বাহিনী সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। মহাবীর রুস্তম প্রাণ হারান। বাহমন ছিলেন রুস্তমেব দক্ষিণ হস্ত, কাকা ছিলেন সাদের দক্ষিণ হস্ত। এই কাকার হস্তেই বাহমন প্রাণ হারান। এইদিনই পারস্যেব স্বাধীন গৌরব রবি অস্তমিত হয়।

কারো কারো মতে, যুদ্ধ তিনদিন পরও চলেছিল। কেউ কেউ বলেন চতুর্থ দিনেও পারস্য হস্তীকুল প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু আরবের অব্যর্থ তীরন্দাজগণ তাদের আক্রমণকে একেবাবেই পর্যুদস্ত করে তুলেছিলেন। পরিশেষে হস্তীকুলও হার স্বীকার করে রণভূমি ত্যাগ করে। হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগেও পারস্যেব তাবুগুলো নদীগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় পারস্য বাহিনী একেবারেই দিগভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। যেমনটি ঘটেছিল মহানবীর জীবিতকালেই খন্দকের যুদ্ধে (৬২৭ খ্রীঃ)। সেদিনও প্রকৃতি যেন বাদ সেধেছিল আবু সুফিয়ানের জন্য। ঝড় ও বৃষ্টির অভাবনীয় প্রচণ্ড বেগ, যা কোনদিনই তারা চিন্তাও করেনি। কোরআন: ৩৩:৯,১০-১৫,২৫, ১২:২১।

একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ:

কাদিসিয়ারের যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। যদি আরবগণ ঐদিন এই যুদ্ধে হেরে যেতেন, তাহলে আরব জাতির অস্তিত্ব দুনিয়ার বুকে থাকত কিনা, সে কথা খুবই সন্দেহের ছিল। স্বয়ং সম্রাট হুকুম দিয়েছিলেন—এদের চিহ্নমাত্র রাখা যাবে না, এদেরকে পৃথিবীর বুক হতে বিদায় দিতে হবে। স্বয়ং সেনাপতি রুস্তম হুঙ্কার ছেড়েছিলেন—ঐ অসভ্য বর্বর আরব জাতিকে আগামীকালই আমি পারস্যের মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো। সুতরাং যুদ্ধে

আরবদের পরাজয় ঘটলে তাদের আর কোন দ্বিতীয় পথ ছিল না এই বিশ্বে টিকে থাকার ও বেঁচে থাকার। এই কারণেই আরবগণ যুদ্ধ করেছিলেন আপন অস্তিত্বের জন্য, ইসলামের জন্য, যেখানে মান-সম্মান-ধন-দৌলত কিছুরই প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল না। এককথায় আরবদের ছিল জীবনের জন্য জীবন-মরণ পণ, আর পারস্য বাহিনীর ছিল মান-সম্মানের প্রশ্ন। জীবনের প্রশ্নে ও জীবনের মান-সম্মানের প্রশ্নে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মানুষের-প্রাণহীন মান-সম্মানের প্রশ্ন যেমন চিরদিনই বিধ্বস্ত হয়, ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের প্রাণের সাড়া অস্তিত্বের প্রশ্নও মানুষকে করে বিজয়ী, জাতিকে করে উন্নত-সমুন্নত, গৌরবান্বিত। আরব সেদিনের সেই প্রাণপ্রতিজ্ঞ উন্নত-সমুন্নত ও গৌরবান্বিত জাতি।

বার্তাবাহক আমিলাহ :

সমগ্র আরব দেহগত ভাবে সেদিন ছিল আরবে, কিন্তু তাদের মন-প্রাণ, দেহ-হৃদয়, চোখ-কান সবই ছিল পারস্যের কাদিসিয়ারের যুদ্ধ প্রাঙ্গণে। স্বয়ং খলিফা প্রতিদিন প্রভাতে মদিনার বাইরে আসতেন, যদি কোন সংবাদ পাওয়া যায়, যদি কোন সংবাদ এসে যায়। শত-শত নর-নারী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন কাদিসিয়ারের সংবাদের জন্য। সেনাপতি সাদ যুদ্ধজয়ের পরই কালবিলম্ব না করেই বিশেষ দূতের দ্বারা বিজয় সংবাদ পাঠালেন মহামান্য খলিফার সমীপে। বার্তাবাহক যখন দ্রুতগামী উটে মদিনার প্রাঙ্গণে হাজির, তখন খলিফাও সেখানে হাজির। খলিফা ওমর অতি দ্রুততার সাথে বার্তাবাহকের নিকট গিয়ে অতীব ব্যাকুল স্বরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—কাদিসিয়ারের সংবাদ কি! বার্তাবাহক শুধু অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—'ইসলামের জয় হয়েছে।' এই বলেই বার্তাবাহক অতি দ্রুততার সাথে উট চালালেন মহামান্য খলিফাকে সত্বর শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করতে। মহামান্য খলিফাও দ্রুতগামী উটের সাথে অতি দ্রুত ছুটে যাচ্ছেন, এবং মনের আবেগ থেকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করছেন।

শহরের কাছাকাছি এলে বহু মানুষ মহামান্য খলিফাকে দেখা মাত্রই 'আমিরুল মোমেনিন' বলে সম্বোধন করলে বার্তাবাহক সাদ বিন আমিলাহ হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তখন বার্তাবাহক ভয়ে-সঙ্কোচে, লজ্জায় আড়ষ্টপ্রায়, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। অত্যন্ত বিনীতভাবে মহান খলিফাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি আপনাকে চিনতাম না, কেন আপনি পরিচয় না দিয়ে আমাকে এতখানি ম্লান করলেন। আল্লাহ্ আপনার ওপর কৃপাবর্ষণ করুন। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" সঙ্গে সঙ্গে মহামান্য খলিফা উত্তর দিলেন—"তুমি উটের পিঠে আরোহী রূপেই খলিফার বাসাতে অবতরণ করবে। কেন আমি তোমাকে মাঝপথে নামাবো। আমরা সবাই সমান।" ৪ : ১, ৭ : ১৮৯। সঙ্গে সঙ্গে

বার্তাবাহক সাদ সেনাপতি সাদের পত্রটি বিশাল জনসমাবেশে পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। এবং সাধারণসভা ডেকে আল্লাহ্‌র নিকট শোকর গুজারী করে একটি বক্তৃতা দিলেন।

খলিফার ভাষণ :

"হে আমার প্রিয় ভাইগণ! আমি কোন শাহানশাহ নই। আমি কোন মানুষের গোলামও নই। আমি এক আল্লাহ্‌র দীনাতিদীন অতি নগণ্য গোলাম। আমার মনে এক কণাও ইচ্ছা নেই যে তোমাদেরকে আমার গোলাম করি, আমার দরজায় কোন প্রহরী রাখি। আমার ওপর তোমরা মহান খেলাফতের মহৎ দায়িত্ব অর্পণ করেছ। আমার পবিত্র দায়িত্ব তোমাদের জীবন, ধন-মান-সম্মান রক্ষা করা। তোমাদের আহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। তোমাদের নিরাপত্তা ও শান্তিতে নিদ্রা যাওয়ার ব্যবস্থাটুকু করা। যখন আমি তোমাদের জন্য এইগুলো করতে পারব তখন আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো, ভাগ্যবান ও গৌরবান্বিত মনে করবো। যখন আমার উদ্দেশ্য হবে—তোমাদেরকে আমার মুখাপেক্ষী কবা (অর্থাৎ নিজেকে শাহানশাহ করার, মহানবীর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকে হত্যা করাব), তখনই আমি নিজেকেই সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ও ঘৃণিত করে তুলবো। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হোক, কথা অপেক্ষা কাজের দ্বারা তোমাদের শিক্ষা দেওয়া। তোমরা সকলেই জান—আল্লাহ্‌র শোকরিয়ার কোন শেষ নেই, তিনি আমাদের মতো দ্বীনহীন জাতিকে পারস্যের মতো বিশ্বশক্তির ওপব বিজয়ী করলেন। আল্লাহ্ কত পবিত্র, কত মহান। তোমরা সকলেই জানো আজ যদি আমরা অত্যাচারী পারস্য সম্রাটের নিকট হেরে যেতাম, তাহলে আগামীদিনে তারা আরবদের কোন অস্তিত্বই রাখত না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, সমস্ত শোকরিয়া আল্লাহ্‌র জন্যই।" ১:১, ৩৭:১৮২।

খলিফার শান্তি নির্দেশ :

সেনাপতি সাদ বিন ওয়াক্কাস খলিফার নির্দেশ প্রার্থনা করলেন যে, যারা আরবের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিল পারস্য বাহিনীতে, তারা আজ পলাতক। কিন্তু যার অনিচ্ছাকৃত ভাবে চাপে পড়ে যোগদান করেছিল, তারা আজ অনুতপ্ত ও আমাদের আশ্রয়প্রার্থী। এই দ্বিতীয় দল সম্পর্কে খলিফার মতামত চাইলেন। খলিফা সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ সভা ডেকে সকলের মতামত নিয়ে জানিয়ে দিলেন—"যারা ক্ষমাপ্রার্থী, যারা আশ্রয়প্রার্থী, তাদেরকে বিনা শর্তে আশ্রয় দেওয়া হোক। তাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করুক আর নাই করুক। সকলকেই ভাই বলে গ্রহণ করা হোক।" সেনাপতি খলিফার নির্দেশ পালন করে বিজিত পারস্য দেশে সহ-অবস্থান ও সহিষ্ণুতার এক স্বর্গীয রাজ্য গড়ে তুললেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ইরাকের পশ্চিমাংশ (পারস্য) জয়

কোরআনঃ

* "যুদ্ধেব অনুমতি দেওয়া হল তাদের,
যারা আক্রান্ত হয়েছে।
কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।
আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম।" ২২:৩৯

বাবল দুর্গ অধিকার:

ইরাকের পূর্বাংশ জয়ের পর ইরাকের পশ্চিমাংশে জয়ের সূচনা হল। কাদিসিয়ারের যুদ্ধে পারস্যের পলাতক সেনাবাহিনী বাবল নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং সেখানে তারা ফিরুজানের নেতৃত্বে শক্তি সঞ্চয় করে পূনর্বার মুসলিম বাহিনীকে সম্মুখ সমরে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সেনাপতি সাদ ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে বাবলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। পথিমধ্যে বারস নামক স্থানে পারস্য সেনাপতি বাশিরী সাদকে বাধা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে বাবল দুর্গে পলায়ন করে আশ্রয় নেয়। বাবলের জনসাধারণ বাবলের শাসককুলের ব্যবহারে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না, তাই বাবল ও বাবলের সর্দার আরব সেনাপতি সাদের আগমনকে সহজ করার জন্য কয়েকটা সেতু নির্মাণ করে তাঁদের স্বাগত জানান। সেনাপতি সাদ অতি সহজেই সেনাবাহিনী-সহ বাবলে হাজির হলেন। বাবলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হল। যুদ্ধ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হল। কেননা পারস্য সেনাবাহিনী এর বহু পূর্বেই কাদিসিয়ার প্রাঙ্গণে তাঁদের যে তেজ ও শক্তি সবকিছুই সেখানে মুসলিম সেনাবাহিনীর নিকট বন্ধক দিয়ে এসেছিলেন। বলতে গেলে বাবল বিনা যুদ্ধেই জয় হল।

দুর্গ অধিকার (হযরত ইব্রাহিমের স্মৃতিধনা):

অতঃপর পারস্য সেনাবাহিনী কুফা নামক স্থানে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানকার সেনানায়ক শাহরিয়ার সকলকে একত্রিত করে মুসলিম বাহিনীব সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। এই সংবাদ সেনাপতি সাদের কর্ণগোচর হলে তিনি বাবলে ছাউনি ফেলে সেনানায়ক জুহরাহকে নির্দেশ দিলেন কুফা অভিযানের জন্য। জুহরাহ কুফাতে উপস্থিত হলে শাহরিয়ার আরবী বীরকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানান। তখন মুসলিম সেনানায়ক জুহরাহ তাঁর একজন গোলাম নাবিলকে মল্লযুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে পারস্য সেনানায়কে বোঝাতে চেষ্টা করেন—'আমার একজন গোলামই তোমার জন্য যথেষ্ট। মল্লযুদ্ধে

গোলাম শাহরিয়ারকে পরাজিত ও নিহত করে সগৌরবে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন শাহরিয়ারের স্বর্ণমুকুট ও স্বর্ণখচিত বহু মূল্যবান পরিচ্ছদ সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি আল্লাহকে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দ্বিধাহীন চিত্তে গোলাম নাবিলকে ঐ পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দেন। এবং সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন—ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, মানুষের ভাগ্য কত চঞ্চল, জগৎ কত মায়াময়। ১৮:২৩, ২৪, ১৯:৩৫, ৮১:২৯।

এই কুফার কথা মনে পড়লে সমগ্র মুসলিম জাহানের রক্তে শিহরণ জাগে। কত বিখ্যাত ঐতিহাসিক চোখ কপালে তুলে ফেলেন। কত দূর অতীতের স্মৃতি মনের কোণে পুঞ্জীভূত হযে ওঠে। কত অত্যাচারী শাসকের অত্যাচারের কথা ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে ওঠে। তখন বাদশাহ নমরুদের রাজত্বকাল, নবীবর হযরত ইব্রাহিমের সময। নমরুদ এই কুফা নামক স্থানেই নবীবরকে বন্দী করেছিলেন। সেই বন্দীখানা বা জিন্দাখানা এখনও ইতিহাসের স্মৃতি হিসাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। সেনাপতি সাদ এখানে হাজির হয়েই নবীবর হযরত ইব্রাহিমের উদ্দেশে সালাম জানান।

বাহ্‌রাহ্‌শের অধিকার :

কুফার অনতিদূরে এই শহরটি অবস্থিত। এখানে পারস্যরাজের একদল রাজকীয় অশ্বারোহী ছিল। এর কিছু দূরে সম্রাটের একটি সিংহ থাকত। সেনাপতি সাদ সেখানে সেনাবাহিনী নিয়ে হাজির হলে সিংহটি সেনাবাহিনীর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন সেনাপতি সাদের ভ্রাতুষ্পুত্র হিশাম তরবারির এক কোপেই তার শরীরকে মস্তক হতে বিচ্ছিন্ন করে দেন। তখন এই অঞ্চলের নগরপাল বা শহরজাদ অঞ্চলের সাধারণ লোকের জন্য প্রাণভিক্ষা চেয়ে নেন। অঞ্চলের সকল মানুষই জিজিয়া কর দিয়ে শান্তিতে বসবাস মেনে নিলেন। কিন্তু শহরের মালিক শহরজাদ দু'মাস কাল শহরটিকে আপন হাতে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে পরিশেষে প্রাণ হারান। শেষাবধি সেনাপতি জুহরাহ জীবনকে বিপন্ন করেই শহরে প্রবেশ করলে পারস্য সেনাবাহিনীর পলায়ন হেতু শহরটি মুসলমানদের হস্তগত হল।

কেহ কেহ বলেন—প্রকৃত ঘটনা, সম্রাটের সিংহটি ছিল অত্যন্ত সবল, সতেজ ও সুশিক্ষিত। শহরের মালিক মুসলিম বাহিনীকে আহ্বান জানাল—ঐ সিংহটিকে একাকী পরাস্ত করতে। কেন না সকলেই জানত, তা অসম্ভব। এই অবস্থাতে সেনাপতি সাদের ভাইপো বীর হিশাম তরবারি হস্তে আগিয়ে এলেন। সারা শহরে হৈ—হৈ রব পড়ে গেল। সকলেই জানত যে সিংহটি দূর হতে এক লাফে শিকারীর উপর পড়া মাত্রই তাকে শত ছিন্ন করে দেয়। সকলেরই ঐরূপ আশা। মহান আল্লাহকে স্মরণ করে বীর হিশাম দাঁড়িয়ে গেলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে একটি মল্ল যুদ্ধ ঘটতে চলল, যা কোন

দিনই ঘটে নি, এবং ঘটবেওনা। একদিকে মানুষ, অন্যদিকে সিংহ, একদিকে ঈমান, অন্যদিকে বেঈমান। যথাসময়ে সবল সুশিক্ষিত সিংহরাজ ঝাঁপ দিল—বিরাট গর্জনসহ। বিদ্যুৎ বেগে বীর হিশামের তরবারি ঝলসিয়ে উঠল—এক অব্যর্থ আঘাতে। পলকের মধ্যে মানুষ দেখতে পেল—সিংহের মাথা একদিকে, এবং ধড় অন্যদিকে।

দাম্ভিকতার চূড়ে বসে বুঝিল ইরান
কতশক্তি ধরে এই পবিত্র কোরআন।

৩: ১৩৯, ৪: ১০৪, ২০: ৬৮।

বিনা যুদ্ধে মাদায়েন দখল (৬৩৭ খ্রী:):

ইতিহাসের চাকা বন্ধ হল না। এ যেন জয়ের জোয়ার। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ কোন অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায় না। নদী যেমন তার আপন গতিতে জোয়ার-ভাটা খেলে। আরব ও পারস্যের জীবন-নদীতে যেন তেমনি কোন এক জয় ও পরাজয়ের জোয়ার-ভাটা আরম্ভ হয়েছিল। এই জয়ের জোয়ারের টানেই পারস্যের শ্রেষ্ঠতম সুন্দর শহর বা স্বয়ং রাজধানী মাদায়েনও এসে গেল আরব জয়ের তালিকায়। এখানে আসতে কোন বিরোধ বাধল না। কোন সংগ্রাম ঘটল না। কোন সেনাপতি বণ-দামামা বাজালো না। কোন তীরন্দাজ তার তুণ হতে একটি তীরও নিক্ষেপ করল না। কোন বর্শাধারী তার কোন লক্ষ্য ভেদও করল না। কোন অশ্বাবোহী তার নিপুণ অশ্বকে কোন রণইঙ্গিতও দিল না। এমনকি কোন নকীব একটি বারও তকবির ধ্বনিও দিল না। মহান আল্লাহর কি মহান ইঙ্গিত, কি অমোঘ নির্দেশ, নীরবে নিঃশব্দে বিশ্বশক্তির কর্ণধার সুবিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের শোভাতে-সৌন্দর্যে, শক্তিতে-শ্রীবৃদ্ধিতে, তদানীন্তন বিশ্বের ধনভাণ্ডার-স্বর্ণভাণ্ডার, হীরক ভাণ্ডার অতুলনীয় মনোরম শহর রাজধানী মাদায়েন শহর অজ্ঞাত অখ্যাত মরুচারী বেদুঈন আরবদের হাতে অর্পিত হল, সমর্পিত হল অতীব নীরবে, অতীব নিঃশব্দে। একটি মাছিও শুনল না, একটি মশাও জানল না। তখন সেনাপতি সাদবিন আবি ওয়াক্কাস অতীব কৃতজ্ঞতার সাথে অশ্রুসজল নয়নে পবিত্র কোরআনের ঐ আয়াতটি পাঠ করেছিলেন—"হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্, তুমি যাকে খুশি রাজত্ব দান কর, এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দন কর, ও যাকে ইচ্ছা লঞ্ছনা প্রদান কর, ... নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়োপরি সর্বশক্তিমান।" কোরআন: ৩:২৬।১৩৯।

উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত বিক্ষুব্ধ দজলা নদী শহর বাহরাহশের ও রাজধানী মাদায়েনের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। ৫৫০ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ নওশেরওয়াঁ এই শহরটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে প্রতিটি শাসনকর্তার সুনজরে থাকায় শহরটি দিনের পর দিন অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সেনাপতি সাদ

দজলা তীরে দেখেন পারস্য সেনাবাহিনী নদীর সমস্ত সেতুগুলোই নষ্ট করে দিয়েছে। সেনাপতি হতোদ্যম না হয়ে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন নদী অতিক্রম করার জন্য। সেনাবাহিনী একত্রে এক সঙ্গে নদীগর্ভে ঝাঁপ দেওয়ায় নদী তরঙ্গ যেন কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ না হলেও স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় সৈন্যগণ অতি অনায়াসেই নদী পার হয়ে তীরে উঠলেন। তখন পারস্যের সাধারণ মানুষ এদেরকে এই দুঃসাহসিক কাজ এইভাবে করতে দেখে তাঁদেরকে মানুষ না ভেবে জীনই ভাবল। এবং প্রাণভয়ে যে যেখানে পারলো কেটে পড়ল। একমাত্র সিপাহসালার খারজাদ একদল সৈন্য নিয়ে বাধা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তার বাধাটা শুকনো তৃণ-সম নদী-জোয়ারে ভেসে গেল।

নদীপার হয়েও আরবীয় সেনাবাহিনী লক্ষ্য করল—নদীতীরেই পৃথিবীর এক স্বর্গপুরী-স্বর্ণপুরী রাজধানী মাদায়েন অবস্থান করছে। দূর অতীতের কোন এক 'কিস্‌রা'—পারস্য সম্রাট ইরাকের এই অংশটিকে জয় করে নিয়ে ইরানের অন্তর্ভুক্ত করেন। এবং সালুফিজার সম্মুখে দতসিকানে তাঁদের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করেন। তখনকার দিনে এই শহরটির সম্পদ ও সৌন্দর্যের যেন কোন শেষ ছিল না। দুই বৃহৎ শক্তির দুটো রাজধানী ছিল। রোমানদের রোম বা কনস্টান্টিনোপল এবং পারস্যোব মাদাযেন। কিন্তু সকল দিক থেকেই মাদায়েন বিশ্বের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল, রোম তা পারেনি। তদানীন্তন বিশ্বে মাদায়েনের অধিবাসী হওয়াটাও চরম ভাগ্যের কথা ছিল। ইচ্ছা করলেই ঐ স্বর্গপুরীটির নাগরিকত্ব পাওয়া যেত না। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তবে ঐ শহরটির অধিবাসী নির্বাচন করা হতো। আজও বিশ্বে এরূপ কোন বিশেষ শহর নেই। এই শহরটিকে রোমানগণ বহুবার চেষ্টা করেছিলেন অধিকার করতে বা লুণ্ঠন করতে, কিন্তু সক্ষম হননি। মাদায়েনের শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদটি জ্যোৎস্না রাতে কি যে অপূর্ব রূপ ধারণ করতো, তা বর্ণনাতীত। এককথায় বলা যায়—মাদায়েন ছিল সে যুগের সপ্তাশ্চর্য তাজমহল।

এই মাদায়েন শহর হতেই সম্রাট ইয়েজদ্‌গির্দ কাদিসিয়ারের যুদ্ধ পরিচালনা করার পর যখন পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণ করেন, তখন তিনি প্রকারান্তে জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলেন। চরম শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন অখ্যাত মরুবাসী আরবদের। কিন্তু প্রকৃতি যেন বাদ সাধল। তাই সম্রাটকে একদিন চোখের জলে প্রিয়তমা সম্রাজ্ঞীদের, শাহজাদা ও শাহাজাদীদের বহু মূল্যবান মণি-মাণিক্য সহ নিরাপদ স্থান হলওয়ানে পাঠিয়ে দিতে হল। স্বয়ং সম্রাটের এই হাল লক্ষ্য করে শহরের অন্যান্য আমীর-উমরাহ্‌গণও মাদায়েন ত্যাগ করলেন। শেষদিন পর্যন্ত সম্রাট তাঁর কিছু শ্রেষ্ঠ বাহিনীকে নিয়ে মাদায়েনে অপেক্ষায় ছিলেন যদি রক্ষা করা যায়। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস আরব বাহিনী সরাসরি নদী পার হয়ে এপারে পৌঁছানো মাত্রই সম্রাট তাঁর শেষ আশা

পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। বাধ্য হলেন অতীব প্রিয় মাদায়েন ত্যাগ করতে। এ যেন তাঁর নিকট আত্মহত্যা অপেক্ষাও অনেক বেশি গুরুতর হল।

সেনাপতি সাদ বিনা যুদ্ধে পারস্যের রাজধানী মাদায়েন প্রবেশ করলেন। যুদ্ধ করা তো বহু দূরের কথা, রাস্তা-ঘাটে কথা বলার মতো একটিও মানুষ খুঁজে পেলেন না। কোথাও শোকাচ্ছন্ন, কোথাও শ্রীভ্রষ্ট, কোথাও নির্বাক নীরব স্তম্ভগুলো কালের সাক্ষীরূপে কেবলমাত্র দণ্ডায়মান। তাঁরা যেন নীরব কণ্ঠে সেনাপতি সাদকে স্বাগতম ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। সা'দ সকল কিছুকে দেখে অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন—"তারা ফেলে গেছে কত বাগিচা, কত ফোয়ারা, কত বিহার ভূমি, কত কুঞ্জকানন, কত প্রস্রবণ, কত ঝরনা, কত ধনাগার। যেগুলো তারা ভোগ করত। এ কত বড় বিধান। তাদের আপন রাজধানী তাদের আশ্রয় দিল না। আসমান-জমিন তাদের জন্য কোন শোক বা দুঃখ প্রকাশ করল না।" ৩: ২৬, ১৩৯।

সেনাপতি সা'দ মহান আল্লাহকে স্মরণ করে পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে প্রবেশ করে প্রথম সেখানে মিম্বর স্থাপন করে আজান দিতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর সেই অপূর্ব বালাখানাটিকে আল্লাহর মসজিদে রূপান্তরিত করে আট রাকাত নফল বা শোকরানা নামাজ পড়লেন। আমরা এখানে লক্ষ্য করছি সেনাপতি সা'দ একজন নিখুঁত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও রাজপ্রাসাদে ইরানের ঐতিহ্যবাহী যত রকমের কারুকার্য, নকশা, চিত্রাদি ছিল, তার কোনটিকেই নষ্ট করতে আদেশ দিলেন না। সেনাবাহিনীকে কেবলমাত্র নির্দেশ দিলেন----তাঁরা যেন তাঁদের পরিবার-পরিজনবর্গকে এখানে এনে জনশূন্য মাদায়েন শহরকে আবার প্রাণবন্ত করে তোলেন। এবং শহরের পরিত্যাক্ত বাড়ি-ঘরগুলোকে তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

শাহী বালাখানার সম্পদ :

সম্রাট ইয়াজদ্গির্দ তাঁর শাহী বালাখানা হতে বিদায় নেওয়ার পূর্বে শাহীমহলের সকলকে জানিয়ে দিলেন যে যত পারো, মূল্যবান বস্তুগুলো হলওয়ানে নিয়ে যাও। শাহী পরিবার যখন হলওয়ানে স্থানান্তরিত হল, তখন শাহী মহলের অফুরন্ত ধনসম্পদ তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিল। সম্রাট একাকী শেষ রক্ষার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যখন দেখলেন শেষ রক্ষাও হল না, তখন তিনি রাজকর্মচারীবৃন্দকে নির্দেশ দিলেন তাঁদের মহামূল্য সম্পদগুলোকে শত্রুর কবলে রেখে যাওয়া অপেক্ষা নষ্ট করাটা অনেক গুণেই শ্রেয়। তখন রাজকর্মচারীবৃন্দ যে যত পারল আত্মসাৎ করল, এবং বাকিগুলোকে ধ্বংস করল। অতঃপর সম্রাট একই নির্দেশ দিলেন শহরবাসীবৃন্দকে। তারাও একই পথ অবলম্বন করল। এই অবস্থার পরও যখন সেনাপতি সা'দ শাহী বালাখানাটিকে নির্জনে নীরবে আপন মনে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তখন তাঁর বিস্ময়ের কোন অবধি

ছিল না। কোথাও সারি সারি স্বর্ণমুদ্রার সিন্দুক, কোথাও হীরা-মণি-মাণিক্যের নির্দিষ্ট কক্ষ, কোথাও রাজ-রাণীদের রাজপরিবারের দুর্লভ অলঙ্কারের স্তূপীকৃত কক্ষ। কোথাও হীরা-মণি-মাণিক্য খচিত বহু মূল্যবান পোশাকের পাহাড়, কোথাও যুদ্ধক্ষেত্রের নানা অস্ত্র, যেগুলোর উপাদান কেবলমাত্র সোনা-রূপা ও হীরা ইত্যাদি। কোথাও নিখুঁত স্বর্ণের বড় বড় হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি, যাদের চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হীরা ও মুক্ত, মণি-মাণিক্য খচিত। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণের মূর্তি, খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য আসবাব পত্র। থালা-বাসন-হাড়ি-পেতল জাতীয় যাবতীয় তৈজসপত্রগুলো ছিল সোনা, হীবা, মণি ও জহরতেব। সবার উর্ধ্বে সেখানে একটি গালিচা ছিল, যার নাম 'বাহার' বা বসন্ত। এই গালিচাটি এমনিভাবে তৈরি ছিল, খুলে দিলেই মনে হতো বসন্ত এসে গেছে। গালিচার মধ্যে কোথাও সোনার বৃক্ষ, কোথাও রং-বেরংয়ের হীবা-মুক্ত-চুনি-পান্নার শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত। আরব ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র এই গালিচাটির মূল্য নির্ণয় করতে হিমশিম খেয়ে গেছেন। তাঁরা সেদিনের বাজার দর অনুপাতে তার মূল্য নির্ধাবণ করেছিলেন—ন্যূনতম নয় লক্ষ কোটি দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা।

সেনাপতি সাদের নির্দেশমতো সমস্ত জিনিসগুলোকে একত্রিত কবা হলে দেখা গেল এই পৃথিবীব ধন-সম্পদেব একটি পাহাড় সৃষ্টি হল। ইসলামেব মালে-গনিমতের যুদ্ধনীতি অনুযায়ী পাঁচ ভাগের এক ভাগ পেত কেন্দ্রীয় সবকাব ও চার ভাগ পেতেন সেনাবাহিনী। সেইমতো এক-পঞ্চমাংশ মদিনাতে পাঠানো হল। বাকি চাব অংশ সৈনিকদের মধ্যে বিতবিত হল। সর্বমোট ষাট হাজার সেনা ছিলেন। প্রত্যেক সেনা কেবলমাত্র স্বণমুদ্রার অংশ পেলেন বাবো হাজার করে। অর্থাৎ শাহী বালাখানাতে সবকিছু নিয়ে যাওযাব পবও বাহাত্তর কোটি কেবল স্বর্ণমুদ্রাই ছিল। এতদ্ব্যতীত সৈন্যগণ অন্যান্য জিনিসেব সমান অংশ পেলেন। এখানেই বোঝা গেল প্রকৃতি কেন পারস্য সম্রাটের বাদ সেধেছিল।

সেনাপতি সাদ একখানি পত্র-সহ সমস্ত ধন-বত্নের এক-পঞ্চমাংশ মহামান্য খলিফার নিকট মদিনায় প্রেরণ করলে খলিফা তা দেখে অবাক বিস্ময় বোধ করলেন দুটি কারণে, প্রথম কাবণটি ছিল—এত বিশাল ধনবত্ন, দ্বিতীয় কারণটি ছিল—তাঁর আপন সৈনিকদের চরিত্রবল। তারা ইচ্ছা করলে ঐ ধনরাশি তারা আত্মসাৎ করতে পারত। কিন্তু করেনি আপন চরিত্রের জন্য, যে চরিত্রবলে তাঁরা জয় করেছিলেন পারস্যকে। খলিফা ওমর, দূরদর্শী ওমর, ধার্মিক ওমর এই প্রভূত ধনরত্ন দেখে সবাই যখন আনন্দে আত্মহারা, তখন কিন্তু তিনি শিশুর ন্যায় ক্রন্দনরত। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে খলিফা বলেন—"এই ধনরত্নই পারস্যকে ধ্বংস করল। আমি আমার জাতির ধ্বংসের বীজও এর মধ্যেই লক্ষ্য করছি।" এককথায় সকলেই অনুধাবন করল—দূরদর্শী খলিফার সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তাধারা। ৬৩: ৯, ৬৯: ২৮।

খলিফা বিশাল সভার আয়োজন করলেন। মুক্ত প্রান্তরে সমস্ত ধনরাশিকে একত্রিত করলেন। সকলেই নয়ন ভরে তৃপ্তির সাথে দেখল। অতঃপর খলিফা সারাকা ও মুহাল্লাম নামক দুই সাধারণ যুবককে ডাক দিলেন। এবং তাদের শরীরে পারস্য সম্রাটের মণিমুক্তা খচিত পোশাক পরিয়ে দিয়ে সমবেত জনতাকে বললেন—"এবার তোমরা মহান আল্লাহর মহিমা, কুদরত ও কৌশল দেখ। তোমরা কোনদিনই কি কেউই স্বপ্নেও ভেবেছিলে পারস্য রাজাধিরাজের মূল্যবান পোশাক আরবের দু'জন সাধারণ যুবকের শরীরে শোভা বর্ধন করবে।"

অসম্ভবও সম্ভব হল কুদ্রত্ তাঁর জগৎময়
দেখ শুধু তাঁর শাণ্ এলাহী কত বড় তিনি মহিমাময়।

অতঃপর ঊর্ধ্বাকাশে মাথা তুলে সজল নয়নে আল্লাহকে শতবার ধন্যবাদ দিয়ে জানালেন—"হে মহান আল্লাহ্! এত সব ধনরত্ন তুমি তোমার রসুলকে দাওনি, কেননা তিনি ছিলেন আমা অপেক্ষা শতগুণে তোমার পরম প্রিয় বন্ধু। এমনকি আবুবকরকেও দাওনি, তিনিও ছিলেন আমা অপেক্ষা তোমার প্রিয়জন। কিন্তু এখন তুমি আমাকে দিলে কোন্ পরীক্ষার পরীক্ষা নিতে? হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে শক্তি দাও, তোমার প্রিয় রসূলের পথে পা ফেলতে।"

পরক্ষণেই তিনি সমস্ত সম্পদ জীবিত ও শহিদ মদিনাবাসীদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। তখন একটি বস্তুকে নিয়ে সমস্যা উঠল—'গালিচা'। ওমর সকলের মতামত চাইলেন। হযরত আলী মত দিলেন, হে খলিফা, যে বস্তুর মধ্যে আপনি আপনার জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছেন, যে বস্তু একটি জাতিকে ধ্বংস করল, তাকে সযত্নে রাখার এমনকি যুক্তি আছে। যদি কারো নিকট তাকে গচ্ছিত রাখা হয়, কোনদিন হয়তো তারও চরিত্রকে নষ্ট করবে লোভে ও প্রলোভনের তাড়নায়। সুতরাং ঐ বিষবৃক্ষের অস্তিত্বটাকে বিনাশ করুন, ওকে টুকরো টুকরো করে সকলের মধ্যে বিলিযে দিয়ে।" বহু মতামতের পর খলিফা আলীর মতামতকে গ্রহণ করে ওটাকে সকলের মধ্যেই বিতরণ করে দিলেন। আলির ভাগে যে টুকরোটি পড়েছিল, তার মূল্য নিরুপণ হয়েছিল—বিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা। আমরা লক্ষ্য করলাম—বিখ্যাত ইযারমুকের যুদ্ধ পারস্যের 'ভিতকে' নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং ঐতিহাসিক কাদিসিয়ারের যুদ্ধ পারস্যের 'মাজা' ভেঙে দিয়েছিল, এবং রাজধানী মাদায়েন দখল তার মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল।

তোমার অসীম দান তুমি যদি দাও
বিশ্ব বিরোধী হোক ব্যর্থ হবে তাও।
তুমি যদি দাও মোরে ধন-সম্পদ
তোমার বিভবে নাই বাধা ও বিপদ।

আপনারে ভুলি যেন চেয়ে তব পানে
কৃতার্থ কর গো আল্লাহ্ তব দেওয়া দানে।—

কোরআন: ৩৪: ৩৭, ৩৯: ৪৯, ৫৩: ৯, ৬৯: ২৮, ৭১: ২১, ৯২: ১১, ১০০:৮, ১০২: ১, ১০৪: ৩, ১১১: ২, ৪১: ৪৯।

জালুলার যুদ্ধ :

পারস্যের হৃদয়-স্বরূপ রাজধানী মাদায়েন হস্তচ্যুত হওয়ার পর পারস্য-রাজ যেন কিছুটা বাস্তব-জ্ঞান বিবর্জিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যেন পরবর্তী যুদ্ধগুলো কেবলমাত্র যুদ্ধের জন্যই করছিলেন। বারবার একই ফল। বারংবার একই সংবাদ—পরাজয় আর পরাজয়। তবুও তিনি যেন পাগলের প্রায় যুদ্ধ-নেশাতে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। হওয়ারই কথা। কি করে কোন মুখে তিনি বিশ্বশক্তির একজন কর্ণধার হয়ে অজ্ঞাত মরু-বেদুঈনের নিকট আত্মসমর্পণ করবেন। এটাই তাঁর নিকট অতীব অবাস্তব চিন্তা ছিল। তাই যুদ্ধ তাঁর বাতিকে পরিণত হয়েছিল। মাদায়েনের পর যত যুদ্ধ হয়েছিল, সবগুলোকেই এককথায় বাতিকগ্রস্ত যুদ্ধ বলা যায়।

জালুলা শহরটি বর্তমান বাগদাদের নিকট অবস্থান করছিল। মাদায়েনের পতনের পর পারস্য সম্রাট রুস্তমের ভাই খারজাদকে নতুন বাহিনীর সেনানায়ক নিযুক্ত করে আরবদের মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন। খারজাদ অত্যন্ত নিপুণ ভাবেই শহরটির চারিদিকে পরিখা খনন করে তার অন্যান্য পথসমূহের ওপর 'গোকুর' নামক বহুমুখী কাঁটাবিশিষ্ট লোহা ছড়িয়ে দিলেন, যেন কোন শত্রুবাহিনী সহজে প্রবেশ করতে না পারে। সেনাপতি সাদ খলিফা ওমরকে সমস্ত কিছু অবগত করার পর খলিফা বারো হাজার সৈন্য-সহ হাশিম-বিন-উতবাকে জালুলা দখল করতে অনুমতি দেন। সেনাপতি সাদ আরো কয়েকজন বীর কাকা, মুসীর, আমর বিন মালিক, আমর বিন মাররাহ প্রমুখ সেনানায়কেও হাশিমকে সাহায্যের জন্য পাঠালেন। সেনাপতি হাশিম ৬৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দে জালুলা অবরোধ করলেন। কয়েক মাস পর্যন্ত এই অবরোধ চলতে থাকে। শহরের ভেতরে ভাল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত ছিল। পারসিকগণ বারবার হঠাৎ মুসলমানদের অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ চালাতেও থাকে। এইভাবে তারা সর্বমোট আশিবার আক্রমণ করে, যাতে মুসলিম বাহিনী পারস্যভূমি বা জালুলা ত্যাগ করে।

পরিশেষে একদিন পারসিকগণ জীবন-মরণ পণ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ সেদিন প্রকৃতি আবার বাদ সাধল। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্রচণ্ড বৃষ্টি পরিখা ভরে দিল। মুসলিম বাহিনীর জন্য সাঁতার কেটে পরিখা পার হওয়াটা অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠল। সর্বশেষে পারসিকগণকে আবার নিয়তির সেই অমোঘ নির্দেশ পরাজয়কেই আলিঙ্গন করতে হল। এই যুদ্ধ দেখা গেল প্রায় এক লক্ষ পারসিক সেনা নিহত ও সেই অনুপাতে মুসলিমদের মৃত্যু সংখ্যা অতীব

নগণ্য। মুসলমানগণ জালুলার যুদ্ধে এক বিশাল ধনভাণ্ডার লাভ করেন, যেখানে মজুত ছিল—নগদ তিন কোটি দিনারেরও বেশি।

সেনাপতি সাদ আল্লাহর দরবারে শত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে খলিফাকে জিয়াদের মারফত এই শুভ সংবাদ প্রদান করেন। জিয়াদ মালে গনিমতের পঞ্চমাংশ-সহ মদিনাতে খলিফার সমীপে হাজির হন। খলিফা সমস্ত মদিনা-বাসীকে আহ্বান জানালেন একত্রিত হওয়ার জন্য। সমবেত জনগণের সম্মুখে খলিফার অনুমতি-সহ জিয়াদ এক আকর্ষণীয় ভাষণ দান করেন। খলিফা তাঁর ভাষণে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি জিয়াদকে প্রকৃত বাগ্মী বলে আখ্যায়িত করেন। তখন রাত্রি সমাগত, মসজিদের আঙিনায় স্তূপীকৃত ধন। খলিফা আব্দুর রহমান বিন আউফ ও আব্দুল্লাহ বিন আকরাম-কে সারারাত্রি প্রহরী নিযুক্ত করেন। এদিনেও খলিফা মালে গনিমত অবলোকন করে অশ্রু সম্বরণ করতে পারেননি। এদিনেও খলিফা মন্তব্য করেছিলেন—ধন-দৌলত সঞ্চিত হলে—তার সাথে আরো কিছু সঞ্চিত হয়, যা পরবর্তীকালে একটি মানুষকে, একটি পরিবারকে ও একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

হুলওয়ান দুর্গে বসে পারস্য সম্রাট যখন এই দুঃসংবাদ শুনলেন, তখন তাঁর অবস্থা বর্ণনা করা অপেক্ষা চিন্তা করাই শ্রেয়। তিনি শুধু চিন্তা করলেন, এই হুলওয়ান দুর্গও আর বেশিক্ষণ তাঁদের স্থান দেবে না। আরবদেরকেই এবার আহ্বান জানাবে। তাই তিনি মনের দুঃখে, ভগ্ন হৃদয়ে স্ত্রী-পুত্র পরিজনবর্গকে সঙ্গে নিয়ে বড় সাধের দুর্গ হুলওয়ানকে ত্যাগ করে রায় অভিমুখে যাত্রা করলেন। অতীব দুশ্চিন্তার সাথে খসরু-শানমকে পরিত্যক্ত দুর্গের ভার দিলেন। ২: ২৫৫, ২০: ১১০।

হুলওয়ান দুর্গ অধিকার:

তখন সেনাপতি সাদ সগৌরবে সশরীরে জালুলায় অবস্থান করছেন। তিনি মহাবীর কাকাকে নির্দেশ দিলেন অনতিবিলম্বে হুলওয়ান দুর্গ দখল করার জন্য। কাকা হুলওয়ানের নিকটবর্তী কসব-শিরীন পর্যন্ত পৌঁছলে খসরু-শানম তাঁকে বাধা দেওয়ার একটি ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এককথায় বলতে গেলে পারসিকগণ এখানে কোন যুদ্ধেরই অবতারণা না করে আত্মসমর্পণ করেন শান্তির জন্য। সেনানায়ক শান্তি প্রস্তাব মেনে নিয়ে সেখানে শান্তি স্থাপন করলেন। হুলওয়ান অধিকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইরাক-আরবের যে সীমান্তরেখা ছিল, তা আরবের ভূমিতে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পারস্য ও ইরাকের বাকি পূর্বাংশ জয়

কোরআন :

*"তোমরা হাল্‌কা ও গুরুতর অভিযানে বের হও,
এবং তোমাদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর।
এই-ই তোমাদের জন্য কল্যাণ কর,
যদি তোমরা জানতে ।" ৯:৪১

তারকিক দুর্গ অবরোধ ও অধিকার (৬৩৮ খ্রীঃ) :

যখন বিশাল পারস্যরাজের ছোট-বড় রাজ্যগুলো আরবদের হাতে ফাল্গুনের পাতা-পড়া হয়ে পড়তে লাগল, তখন একদিনের সুসভ্য পারস্যবাসীদের অজ্ঞাত, অসভ্য আরবদের সম্পর্কে সম্বিৎ ফিরে এল। সারা পারস্য দেশে সাড়া পড়ে গেল। সকলেই আজ সজাগ ও সচেতন। সকলেই আজ চিন্তিত কি করে দুর্বার আরবকে রুখে দেওয়া যায়। কি করে অজ্ঞ আরবকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যায়।

আরব সীমান্তে অবস্থিত জাজিরার শাসনকর্তা কিছু শক্তি সংগ্রহ কবে আরবদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এই সংবাদ মহামান্য খলিফার কর্ণগোচর হওয়ামাত্রই তিনি আব্দুল্লাহ্‌ বিন-আস-মুতামকে প্রেরণ করেন। খলিফা অবস্থার গুরুত্ব অবলোকন করে আরো কয়েকজনকে সাহায্যের জন্য পাঠালেন—রাবি-বিন-আল-আক্কাস, হারিস বিন হাসান, ফারাত-বিন- হাযান, ও হানি-বিন-কায়েম প্রমুখ ব্যক্তিগণ। আব্দুল্লাহ্‌ সর্বপ্রথম মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্যসহ তারকিক দুর্গ অবরোধ করেন। একমাস অবরোধ কবার পর, কম করে কুড়িবার সংঘর্ষ বাধে এবং শেষাবধি দুর্গটি মুসলমানদেব করতলগত হয়।

জাজিরাহ অধিকার :

জাজিরার তারকিক দুর্গ পতনের পর সেনাপতি সা'দ পাঁচ হাজার সৈন্য সহ্‌ আয়াজ বিন গানামাকে পাঠান জাজিরাহ দখল করতে। আয়াজ সর্ব প্রথম রিহা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন, একদিন এটি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। জাজিরার শাসক প্রথমদিকে বাধার সৃষ্টি করলেও অতি সহজেই আরবদের সাথে একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে শান্তি স্থাপন করেন। অতঃপর আয়াজ কিছুদিনের মধ্যেই ঐ অঞ্চলে হারান, বিকাহ ও অন্যান্য স্থানগুলো অধিকার করেন।

আহওয়াজ অবরোধ ও অধিকার:

৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে মুগিরাহ বিন সুবাহ বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। বসরার নিকটেই ছিল খুজিস্তান। খুজিস্তানের পারসিক শাসনকর্তা মুগিরার জন্য বড়ই বিপদজ্জনক হয়ে উঠলে তিনি হরমুজ নামক শহরের বিখ্যাত আহওয়াজ দুর্গ আক্রমণ করেন। আহওয়াজের শাসনকর্তা শালিয়ানা সামান্য অর্থের বিনিময়ে শান্তি প্রস্তাব দিলে সেনাপতি মুগিরাহ তাঁর শান্তি প্রস্তাব মেনে নেন। কিছুদিনের মধ্যে আবু মুসা আসারী নতুন শাসনকর্তা রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই আহওয়াজের শাসনকর্তা কর বন্ধ করে যথারীতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবু মুসা অত্যন্ত রাগান্বিত ভাবেই আহওয়াজ অবরোধ করেন, এবং দশ হাজার পারস্য সেনাকে বন্দী করেন। পরে খলিফার হস্তক্ষেপে বন্দীগণ মুক্তি পায়, এবং আহওয়াজ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

মনাজির দুর্গ অবরোধ ও অধিকার:

সেনাপতি আবু মুসা মুহাজির বিন জিয়াদকে মনাজির শহর অবরোধ করতে নির্দেশ দেন। সেনাপতির নির্দেশক্রমে মুহাজির মনাজির শহর অবরোধ করলে শহরবাসীরা মুহাজিরকে সন্ধি ও শান্তি প্রস্তাব দেন, এবং মুহাজির তাদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে শান্তি স্থাপন করতে গেলে তারা চরম বিশ্বাসঘাতকতার সাথে মুহাজিরকে একাকী পেয়ে বন্দী করে এবং অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই তাঁকে জঘন্যভাবেই হত্যা করে। সেনাপতি আবু মুসা এই ভয়াবহ দুঃসংবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা শোনামাত্রই মুহাজিরের ছোট ভাই রাবিকে মনাজির দখলের নির্দেশ দিয়ে নিজে শুস অঞ্চলের দিকে ধাবিত হন। রাবি কয়েকদিনের মধ্যেই মনাজিরকে একেবারেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে শহরবাসীকে অতি চরম শিক্ষা দান করেন। তবে কোন শিশু ও নারীর ওপর হাত পড়েনি। কিছু দিনের জন্য সকলকেই ক্রীতদাসে পরিণত করেছিলেন।

শুস অধিকার:

আবু মুসা শুস অবরোধ করলে সেখানকার শাসনকর্তা সন্ধির প্রস্তাব দিলে আবু মুসা সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিয়ে সেখানকার শান্তি স্থাপন করেন। কিন্তু শুসের শাসনকর্তা অতি সত্বর সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করলে আবু মুসা তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, কিন্তু শহর বা অঞ্চলের মানুষ মুসার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে বার্ষিক আট লক্ষ দিরহাম কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতিসহ আবার শান্তি প্রস্তাবে সন্ধি স্থাপন করেন।

রাজধানী শুস্তারের বালাখানা ও সেনানিবাস অধিকার:

খুজিস্তানের রাজধানী শুসতার সেদিনের এক আকর্ষণীয় শহর। এখানকার বালাখানা ও সেনানিবাস পারস্যের অতীত ঐতিহ্যের প্রতীক ছিল। পারসিক বীর হরমুযান এই প্রাচীন সেনানিবাসটির সংস্করণ করেন। চারিদিকে পরিখা

খনন করেন। সারা দেশ পরিভ্রমণ করে বহু সৈন্যও সংগ্রহ করেন। এর একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—অসভ্য আরব জাতিকে একটি ভাল শিক্ষা দেওয়া। আবু মুসা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মহামান্য খলিফাকে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানান। অতঃপর কুফা হতে নুমান বিন মাকরান এক হাজার সৈন্য, এবং পরে স্বয়ং কুফার শাসক আমসার আরো বেশি সংখ্যক সৈন্য নিয়ে হাজির হন। জালুলা হতে জরীর বেহলীও কিছু সৈন্য-সহ উপস্থিত হন।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। উভয় পক্ষ হতে বীরবিক্রমে যুদ্ধ চলতে থাকে, কিন্তু কোন পক্ষের কোন জয়ের লক্ষণ ফুটে উঠল না। বীর বারা বিন মালিক একদল সৈন্য-সহ দুর্গের দ্বারদেশে ছুটে যান। স্বয়ং হরমুযানের সাথে যুদ্ধে বীর বারা শহিদ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজ্জাত বিন সাত্তার বারার পতাকা হাতে নিয়ে তিনিও অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হলেন। সেনাপতি হরমুজান দুর্গ মধ্য হতেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে শত্রু পক্ষের এক হাজার সৈন্য নিহত ও ছয় শ'ত বন্দী হয়েছে। কিন্তু জয়-পরাজয় তখনও বোঝা যাচ্ছে না।

অতঃপর রণকুশল বীর সেনাপতি আবু মুসা চিন্তা করলেন—যুদ্ধের ধাবা পরিবর্তন করতে। হেনকালে একজন বন্দী সেনাপতির নিকট প্রস্তাব রাখে, তাকে প্রাণভিক্ষা দিলে সে দুর্গের গুপ্তপথ দেখিয়ে দেবে। সেনাপতি মুসা তার প্রস্তাব মেনে নিলে বন্দী সৈনিক আশরাশ নামক একজন আরবী সেনাকে ভৃত্যের ছদ্মবেশে নগরের প্রবেশের ভূগর্ভস্থ গুপ্তপথটি দেখিয়ে দেয়। চতুর সেনানায়ক আশরাশ সমস্ত কিছুকে ভালভাবে দেখে নিযে সেনাপতি মুসার নিকট ফিরে এসে প্রস্তাব দেন যে, তাঁকে দুই শত বীব সেনা দিয়ে সাহায্য করলে তিনি নগর অধিকারের দায়িত্ব নিতে পারেন। সেনাপতি মুসা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁকে দুইশত বীর সেনা দিয়ে সাহায্য করেন। যখন হরমুজান তাঁর সভাসদদের নিয়ে পানাহারে মশগুল ঠিক সেই সময় আশরাশ অতীব অতর্কিতে গুপ্তপথে রওনা হয়ে শাস্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে দুর্গের দ্বার খুলে দেন। আবু মুসা বিশাল বাহিনী-সহ দুর্গের বাইরে প্রতীক্ষায় ছিলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্রই সুযোগের সদ্ব্যবহারও করলেন। বিরাট বাহিনী অপ্রস্তুত ও হতভম্ব শহরবাসীদের ও পানোমত্ত সেনাদের অতি অনায়াসেই কবজা করে ফেললেন।

বন্দী হরমুযান :

তখন হরমুজান হতবাক, হতাশ ও হতভম্ব। একবার মাত্র মুখ দিয়ে বের হল—'আমাকে হত্যা করতে এলে আমার তূণে এখনও একশ তীর আছে। আমিও একশোজনকে হত্যা করবো।' সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে একটি প্রস্তাবও দিলেন যে, তাঁকে সশরীরে অক্ষত অবস্থায় খলিফার নিকট

প্রেরণ করা হোক, তিনি যা বিচার করে দেবেন, তাই হবে। সেনাপতি মুসা খলিফার নামোচ্চারণ করাতে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে তাঁকে আনাস বিন মালিকের সঙ্গে বন্দী অবস্থায় খলিফার নিকট পাঠান হল। হরমুজান সেনাপতি মুসার নিকট একটি আবেদন রাখলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর কিছু পারিষদও যাবেন, এবং তিনি যখন মদিনায় প্রবেশ করবেন, তখন তাকে তাঁর রাজকীয় পোশাকটি যেন পরতে অনুমতি দেওয়া হয়। সেনাপতি আবু মুসা সম্মত হলেন। অতঃপর হরমুজান মদিনার নিকটবর্তী হয়ে মহামূল্যবান শাহী পোশাক পরিধান করলেন, মাথায় চাপালেন 'আজিন' নামক মণিমুক্তা খচিত অপূর্ব তাজ, কটিতে ঝুলিয়ে নিলেন স্বর্ণের তরবারি শূন্য খাপ। এবার কাছাকাছি হলে জিজ্ঞাসা করলেন—খলিফার বালাখানাটি কোথায়। মনে মনে করছিলেন—যে ব্যক্তিটির অঙ্গুলি নির্দেশে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য ভূমিসাৎ হতে পারে, যাঁর একটি মাত্র হুকুমে বিরাট রোমান সাম্রাজ্য ধূলিসাতের পথে নামতে পারে, সেই ব্যক্তির বালাখানা কেমন হবে, তা ধারণাতীত। কিন্তু যখন হরমুজানকে মসজিদের খোলা চত্বরে ধূলিশয্যায় শায়িত মহামান্য ওমরকে দেখিয়ে দেওয়া হল, তখন হরমুজান বলে উঠলেন—"তামাম দুনিয়ার তামাম ধনসম্পদ দিয়েও কোন বালাখানা তৈরি করলেও, আমি তাকে দেখে এর চেয়ে বেশি অবাক হতাম না।"

খলিফা ওমর হরমুজানকে ঐ পোশাকে দেখে জ্বলে উঠলেন। কেননা খলিফা জানতেন এই হরমুজান বহুবার আরব সেনাপতিকে ধোকা দিয়ে পার পেয়েছে, এই হরমুজান ক'দিন আগেই শুসতারের যুদ্ধে দু'জন মুসলিম বীরকে হত্যা করে। সুতরাং খলিফা মানসিক ভাবেই প্রস্তুত ছিলেন—তাঁর প্রাণদণ্ড দিতে। কিন্তু খলিফা তাঁকে কিছু বলার সুযোগ দিলেন। চতুর হরমুজান ওটা বুঝতে পেরেই খলিফাকে বললেন—'হে ওমর, যতদিন আল্লাহ্ আমাদের সাথে ছিলেন, ততদিন আপনারা আমাদের দাস ছিলেন। এখন আল্লাহ্ আপনাদের সাথে, তাই আমরা এখন আপনাদের গোলাম।' অতঃপর হবমুজান পানি প্রার্থনা করলেন। তাঁকে পানি দেওয়া হল। তিনি পানি পাত্রটি হাতে নিয়ে খলিফাকে আরজ করলেন—যতক্ষণ পানি পান না করি বা শেষ করি ততক্ষণ যেন তাঁকে হত্যা করা না হয়। খলিফা প্রার্থনা মঞ্জুর কবা মাত্র, হরমুজান তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—আমি পানিই পান করব না, এবং আপনি কথা দিয়েছেন—পান না করা পর্যন্ত আমাকে হত্যা করবেন না। অতঃপর হরমুজান কালবিলম্ব না করে সজোরে 'কলেমা শাহাদত' পাঠ করে ইসলাম কবুল করেন। খলিফা সন্তুষ্ট হলেন। ক্ষমা করলেন। মদিনাতে বসবাস করার অনুমতিও দিলেন। বৃত্তিও নিদ্ধারিত করে দিলেন। পরবর্তী সময়ে হরমুজান অধিকাংশ সময়ই খলিফার নিকট কাটাতেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়—যার শেষ

ভাল তার সব ভাল। হরমুজানের শেষ ভাল হল না। এই হরমুজানই হযরত ওমর হত্যার মূলহোতা ছিলেন। তাঁর মনে প্রথম হতে দুরভিসন্ধি ছিল। তিনি ছিলেন কপট মুসলমান। হযরত ওমর মানুষের কপটতা বুঝতে প্রবাদ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু এখানে আপন ঘাতকের নিকট ব্যর্থ হলেন। অদৃষ্ট এমনি বস্তু। ৩১ : ৩৪। যখন খলিফা ওমর শহিদ হন, তখন এই হত্যাকাণ্ডের সাথে হরমুযানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে ওমরের পুত্র ওবাইদুল্লাহ তাঁকে নিহত করেন।

জন্দিসাবুর অবরোধ ও অধিকার:

জন্দিসাবুর শুসতায়ের কিছু দূরেই অবস্থান করছিল। শহরটিকে অবরোধ করা হল। কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ করল না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল শহরবাসীরা শহরের দরজা খুলে রেখে আপন মনে যে যেখানে খুশি যাতায়াত করছে। সেনাপতি আবু মুসা এর ভেদ অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন শহরবাসীগণ একজন মুসলিম গোলামের সাথে জিজিয়া দেওয়ার শর্তে সন্ধি করে অবাধে যাতায়াত করছে। তখন সেনাপতি মুসা মহামান্য খলিফার নিকট এ মীমাংসা জানতে চাইলেন, তিনি এ অবস্থায় কি করবেন। তখন খলিফা ওমর সেনাপতিকে জানিয়ে দিলেন—"একজন স্বাধীন মুসলমান যেমন মুসলমান, তেমনি একজন গোলাম মুসলমানও একজন মুসলমান। সুতরাং একজন মুসলমান যখন তাদের সাথে নির্দিষ্ট একটি প্রস্তাবে সন্ধি করেছে, তখন অন্য কোন মুসলমান সেই প্রস্তাবটিকে আর খণ্ডন করতে পারে না। অতএব তুমি ঐ সন্ধি মেনে নাও।" এইভাবে একদিন নবী-নন্দিনী জয়নাব তাঁর অমুসলমান স্বামীর জন্য জামিন নিয়েছিলেন। মহানবী (দ:) এটা মেনে নিয়েছিলেন। এইভাবে জন্দিসাবুর মুসলমানদের হস্তগত হল।

ঐতিহাসিক নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ এবং ফলাফল (৬৪২ খ্রীঃ):

নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, দেশের যিনি সম্রাট, শাহানশাহ, দেশ আজ তাঁকে শান্তিতে স্বস্তিতে কোথাও একবেলা স্থান দিতে পারছে না। বাঘ যেমন হরিণকে তাড়া করে, শৃগাল যেমন ছাগলকে তাড়া করে, তেমনি কে যেন তাঁকে তাঁরই দেশে স্থান হতে স্থানান্তরে সদাই তাড়া করছেন। সম্রাট ইয়েজদ্গির্দ তাঁর প্রাণের রাজধানী মাদায়েন হতে বিতাড়িত হয়ে গেলেন হুলাওয়ানে, সেখান হতে গেলেন রায়ে, আবার সেখান হতে গেলেন কুমে, আবার ইস্পাহানে, কখন কিরমানে, এবং সর্বশেষ মার্ভে। কি আশ্চর্য, সম্রাটের কি দুর্দশা, এই জন্যই মানুষ হয়ত কখনও হাতি, কখনও মশা। একেই বলে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। সম্রাট মার্ভে এসে মনে করলেন এখানে একটু শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। তাই আপন আত্মীয়-স্বজন ও বেশ কিছু লোক-লস্করকে সঙ্গে নিয়ে মার্ভে একটি স্থায়ী আস্তানা গাঁড়ার চেষ্টা

করে ওখানে অগ্নিদেবতার জন্য একটি মন্দিরও তৈরি করলেন। কিন্তু মনের দিক থেকে একেবারেই যেন ভেঙে পড়লেন, যখন শুনলেন খুজিস্তান আরবদের দখলে চলে গেছে, এবং স্বয়ং সেনাপতি হরমুজান বন্দী হয়ে মদিনাতে প্রেরিত হয়েছেন।

সম্রাট যেন বারবার বন্দী সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠছেন, কখনও পুত্রহারা জননীর ন্যায় শোকে আকুল হয়ে উঠছেন। কি করে তিনি তিন হাজার বছরের বিশাল ঐতিহ্যকে বানে ভাসিয়ে দেবেন। কি করে তিনি এই দুঃখ, এই অপমান, এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করবেন। তিনি প্রথম প্রথম ভেবেছিলেন আরবদের আক্রমণ সাময়িক, এ ঝড় থেমে যাবে। কিন্তু খুজিস্তান যখন হস্তচ্যুত হল, আরো অনেক কিছু হস্তচ্যুত হল, তখন যেন সমগ্র পারস্যের সম্বিৎ ফিরে এল। এখন পারস্যের প্রতিটি প্রদেশ—তাবারিস্তান, জুর্জান, দামাওন্দ, রায়, ইস্পাহান, হামাদান এবং খোরাসন প্রভৃতি প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একযোগে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন কি করে অসভ্য অজ্ঞাত অখ্যাত আরবকে ঠেকানো যায়।

সম্রাট ইয়েজদ্গির্দ বুঝতে পারলেন—এই একটা বিরাট সুযোগ দেশবাসীকে একত্রিত করার। সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে দূত মারফত অনুপ্রাণিত, উত্তেজিত ও আবেগময় করলেন। সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে একমত হলেন, যেমন করেই হোক আরবদেব একটা সমুচিত শিক্ষা দিতেই হবে। সকল বাহিনী কুম শহরে একত্রিত হল, কেননা কুম শহরে ছিল সম্রাটের বিশাল অস্ত্রশালা। এই অস্ত্রশালাতে আরো হাজারো রকমের অস্ত্রের আদেশ দেওয়া হল। এই কারখানাতে তখনকাব দিনের বহু আধুনিক সমরাস্ত্র প্রস্তুত হল। সর্বশেষে দেড় লক্ষের এক বিশাল সেনাবাহিনীও তৈরি হল। সম্রাট হরমুজের পুত্র মরদান শাহকে এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন—অবিলম্বে নিহাওয়ান্দে যাত্রা করে অসভ্য আরবদের মোকাবিলা করে তাদের সমুচিত শিক্ষা-সহ একেবারেই বিধ্বংস করতে।

কুফার শাসনকর্তা আম্মার বিন ইয়াসির এই সংবাদ মহামান্য খলিফাব কর্ণগোচর করলে খলিফা সঙ্গে সঙ্গে মদিনার মসজিদে নববীতে একটি সাধারণ সভা ডেকে সকলকে জানিয়ে দিলেন কি ঘটতে চলল। সমবেত জনতা হতে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ বললেন—"হে খলিফা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আপনাকে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিতে পরিণত করেছে, আপনি এখন আমাদের যা নির্দেশ দেবেন, আমরা তাই করব।" হযবত ওসমান পরামর্শ দিলেন—"সিরিয়া ইয়েমেন বসরা ও অন্যান্য স্থানে যত সৈন্য আছে, সকলকেই নির্দেশ দেওয়া হোক অবিলম্বে ইরাকে এসে মূল বাহিনীতে যোগদান করতে, এবং আপনি স্বয়ং মদিনাবাসীদের নিয়ে ইরাকের পথে যাত্রা করুন। সকলেই সম্মিলিত

হোক আপনার পতাকার নিচে।" সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। একমাত্র হযরত আলী নীরব থাকলেন। খলিফা আলীর পরামর্শ চাইলে, আলী বলেন—"সকলেই যে যেখানে আছেন, তাঁরা তাঁদের সেনাবাহিনী হতে এক-তৃতীয়াংশ সেনা ইরাকে পাঠান। এবং আপনি মদিনাতেই অবস্থান করুন। কেননা সকলেই যদি সমস্ত সৈন্য পাঠিয়ে দেন, তাহলে ঐ সমস্ত অঞ্চলে বড় শত্রু রোমানদের পক্ষ হতে কোন ছোট বড় বিপদ দেখা দিলে কে তা মোকাবিলা করবে। তখন সমগ্র আরব জাহান বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে। এবং আপনি মদিনাতেই অবস্থান করুন, কেননা এখানেও কোন কিছু ঘটলে, আন্দোলন জাগলে, আপনি হবেন একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, যিনি অতি সহজে আয়ত্তে আনতে পারবেন। অধিকন্তু আপনি না থাকলে—আন্দোলন সহজেই দানা বাঁধতে পারে, এবং আপনি থাকলে কোন আন্দোলনই দানা বাঁধতে সাহস পাবে না।" খলিফা সর্বসম্মতিক্রমেই আলীর জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ঐ সভাতেই খলিফার ওপর ভার পড়ল সেনাপতি নির্বাচন করার। খলিফা নুমান-বিন-মাকরানকে সেনাপতি নিযুক্ত করে ত্রিশ হাজার সৈন্য-সহ নিহাওয়ান্দের দিকে যাত্রার নির্দেশ দিলে সেনাপতি নুমান বহু প্রবীণ সাহাবী সহ নিহাওয়ান্দের পথে যাত্রা করে গুপ্তচরের সংবাদমতো নিহাওয়ান্দেব সমরস্থল হতে নয় মাইল দূরে ইস্পাহানে শিবির স্থাপন করে এখান হতেই পাবসিকগণের নিহাওয়ান্দের পথ অবরোধ করেন।

পারস্য সেনাপতি মরদান শাহ সন্ধি-আলোচনার জন্য দূত প্রেরণ করলেন মুসলিম শিবিরে। সেনাপতি নুমান ইসলামের বিধানমতে কোনরূপ আপত্তি না জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব মেনে নিয়ে অভিজ্ঞ সেনানায়ক মুগিরা বিন শুবাহকে পারস্য শিবিরে পাঠিয়ে দেন শান্তি আলোচনার জন্য । তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে পোশাকে পারস্য শিবিবে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করেন—সেনাপতি মরদান শাহ অত্যন্ত রাজকীয় জাঁকজমক-সহ স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তাঁর সারা শরীরে যে মণিমুক্তা খচিত পোশাক শোভা বর্ধন করছে, তা একটি ছোটখাটো দেশকে বিক্রি করে দিলেও হবে না। ঠিক সমভাবেই সুসজ্জিত তাঁর পারিষদবর্গ। সকলেরই মাথায় স্বর্ণমুকুট। হাত থেকে পা পর্যন্ত সবারই সোনার জরি, পেছনের সারিতে সারি সারি দেহরক্ষীর দল—সমভাবেই সুসজ্জিত। সকলেরই হাতে অত্যন্ত ঝলকদাব তরবারি। মুগিরাহ বিন শুবাহ যখন এক পক্ষের হয়ে অন্য পক্ষের নিকট পৌঁছলেন, তখন তাঁকে ঐ দববারে একজন ভৃত্য ব্যতীত বলার উপায় নেই। এবার মরদান শাহ মুরুব্বীয়ানা চালে কথা আরম্ভ করলেন—"হে অসভ্য আরববাসী, যদি কোন ঘৃণ্য অসভ্য জাতি অন্য কাউকে আক্রমণ করে, তারা একমাত্র অসভ্য আরব। তুমি আমার অবস্থা ও তোমার অবস্থা লক্ষ্য করছ, আমি এক নিমিষেই তোমাকে খতম

করে দিতে পারি, কিন্তু তোমার মতো একজন অসভ্যকে হত্যা করে আমার দরবারকে কলঙ্কিত করতে চাই না। তোমরা যদি এখনই দ্বিনা বাক্যে আমাদের রাজ্যসীমা ছেড়ে চলে যাও, তাহলে আমি তোমাদের অনুগ্রহবশত ক্ষমা করে দেব।" তখন মুগিরা বললেন—"এই আপনাদের শান্তি বা সন্ধি প্রস্তাব, তাহলে আপনদের যুদ্ধ বা অশান্তি প্রস্তাবটি কেমন? আমরা অসভ্য হতে পারি, কিন্তু আরব কোনদিনই কোন ছলনার কোলে আশ্রয় নেয় না, যা মুখে বলে, তাই করে। যা বলে না, তা করে না। যা করে না, তা বলেও না। আমাদের পবিত্র কোরআন আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। ৬১:২। আপনাদের পক্ষ হতে তখনই সত্য বলা হতো, যদি আপনারা আমাদের সেনাপতিকে বলতেন—'আপনি আমার দরবারে একটি মানুষ পাঠিয়ে দিন, তিনি আমাদের শানশওকত দেখে যাবেন ও দু'চারটি ধমক খেয়ে যাবেন, এবং একটি রণহুঙ্কার কাঁধে করে আপনার জন্য বহন করে নিয়ে যাবেন। আমি কি কোন মিথ্যা বললাম!' এবার আমার কথা শুনুন—'আমরা অসভ্য ছিলাম, একথা কোনদিনই অস্বীকার করি না, বা করব না। কিন্তু এখন আপনাদেরও আমরা সভ্যতা কাকে বলে, সেটা শেখাতে বদ্ধপরিকর। আপনাদের এই যে ধনরাশির পাহাড়, এতো জনসাধারণের সম্পদ, গরিবের ধন, একে আমরা যতক্ষণ সেই গরিবদের মধ্যে বন্টন না কবতে পারছি, ততক্ষণ এই দেশত্যাগ করার কোন অভিপ্রায়ই আমাদের নেই।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মুগিরাহ দরবার ত্যাগ করলেন।

এবার উভয় পক্ষ হতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। পারস্য সেনাপতি নিজেদের এলাকার সম্মুখভাগে বহুদূর পর্যন্ত লোহার গখরু কাঁটা ছড়িযে রাখল। যাতে করে আরব বাহিনী তাদেব শিবিবের ধাবে কাছে ঘেঁষতে না পারে। পারস্য বাহিনী নিজদের ইচ্ছামতো সুবিধামতো যখন তখন হালকা আক্রমণ চালাতে থাকে। কিন্তু মুসলিম সেনা সহসা উত্তর দানে সকলকেই বিরত রাখেন। অতঃপর মুসলিম সেনাপতি নুমান যুদ্ধ কৌশল নিলেন—যেমন করেই হোক পারস্য বাহিনীকে ওদের দেওয়া লোহার গখরু কাঁটা হতে বহুদূর পর্যন্ত বাইরে আনতে হবে। যার জন্য তাঁকেও কম মাশুল দিতে হল না। তিনি একটি ছোট বাহিনী গঠন করে যুদ্ধে পাঠালেন, এমন একটি বাহিনী যাদেরকে দেখে পারস্য বাহিনী আনন্দে আহ্লাদে আটখানা হবে, উৎসাহে সদাই ধাওয়া করবে। পরিণতি ঠিক তাই হল, ছোট মুসলিম বাহিনীকে সামনে পেয়ে পারস্য বাহিনী ধাওয়া করল, অনেককে হত্যাও করল, এবং ভাবল মুসলিম বাহিনী শেষ প্রায়। অতঃপর বিশাল পারস্য বাহিনী বিপুল উৎসাহে মুসলিম শিবির দখল করতে অগ্রসর হল। সেনাপতি নুমানের নির্দেশ মত মুসলিম বাহিনী পিছু হাঁটতে হাঁটতে তাদের এমন

একটি স্থানে নিয়ে এল, যেখান হতে পারস্য বাহিনীর আর ফিরে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

অতঃপর আরম্ভ হল—প্রকৃত যুদ্ধ দ্বিপ্রহরের পর। নুমান অপেক্ষা করছিলেন ঐ সময়টার জন্যই। এই সময়টিতে স্বয়ং মহানবী নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। এই ক্ষণে অজেয় বীর মহাবীর খালিদও যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। প্রথম দিকে নিজেদের সাধারণ সৈন্য দ্বারা শত্রুপক্ষের বীর সেনাদের ক্লান্ত করে তুলতেন। এখানেও ঠিক সেইটাই হল। দ্বিপ্রহরের পর হতে যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের স্রোত বইতে থাকল। সহসা সেনাপতি নুমানের অশ্বটি অসর্তক মুহূর্তে একটি অসমতল স্থানে হোঁচট খেলে সেনাপতি দারুণ ভাবে আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আপন ভ্রাতা নুয়ায়েম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন; যখন পারস্য বাহিনীর হতাহত সংখ্যা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে, যখন পারস্য বাহিনী বিনা যুদ্ধে বিনা আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র আপন শিবিরে ফেরার তাগিদে প্রাণপণে পশ্চাদ্ধাবন করছে। নিয়তির কি নিষ্ঠুর লীলা, আপন হাতে গড়া গখরু কাঁটার সীমানা, যখন পারস্য বাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে একেবারেই ঐ সীমানাতে হাজির, তখন তারা একেবারেই অসহায় বোধ করল, ঐ কাঁটা অতিক্রম করে শিবিরে ফিরে যাওয়া তাদের জন্য আর মোটেই সম্ভব হল না। অকাতরে নীরবে সেই স্থানেই তাদের প্রাণ দিতে হল। এইভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিভীষিকাময় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, কম করে ত্রিশ হাজার পারস্য 'সেনা এই যুদ্ধে প্রাণ হারাল। এই তুলনায় মুসলিমদের শহিদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। সন্ধ্যার পূর্বেই মুসলিমদের পক্ষ হতে বিজয় সূচক দামামা বেজে উঠল।

সেনাপতি নুমাম তখনও জীবিত। তিনিই বিজয় তকবিরের নির্দেশ দেন। এবং তিনি দূত মারফত খলিফাকে শুভ সংবাদ দান করেন। যখন বুঝতে পারলেন জীবন-সন্ধ্যা আগতপ্রায়, তখন নিজ হতেই হুজাইফা-বিন-ইয়ামানকে স্থায়ী সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর মুসলিম সেনাপতি নুমান পরম তৃপ্তিতে শাহাদতের গৌরবলাভ করে জান্নাতবাসী হন।

সেনাপতি হুজাইফা সগৌরবে নিহাওয়ান্দে প্রবেশ করেন। তখন সেখানকার পুরোহিত একটি বড় বাক্স এনে সেনাপতির সম্মুখে হাজির করেন। বাক্সটি পরিপূর্ণ ছিল—সম্রাট কিসরার মণি-মুক্তাতে। হুজাইফা মালে গনিমাত, যুদ্ধলব্ধ ধনের এক-পঞ্চমাংশ বিজয়বার্তা-সহ খলিফার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। খলিফা ওমর দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ কোন সংবাদ না পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সুসংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি আল্লাহর নিকট নিবিড়ভাবে প্রার্থনা করলেন। এবং সেনাপতি নুমানের শাহাদতের সংবাদ শুনে শিশুর ন্যায় কেঁদে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন অন্যান্য সকলেরই কথা। খলিফা সকলেরই

জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোয়া জানালেন। কাসেদ বা বার্তাবাহক যখন মণি-মুক্তার বাক্সটি খলিফাকে প্রদান করলেন, তখন খলিফা বললেন—'ওটাকে আমার সম্মুখ হতে সরিয়ে নাও, ওটা হুজাইফাকে দিয়ে বলো—সকল সেনার মধ্যে বণ্টন করে দিতে।' সেনাপতি হুজাইফা ওগুলো বিক্রি করে তখন পাঁচ কোটি দিরহাম সংগ্রহ করেছিলেন।

এই যুদ্ধে অনেক বন্দীও এসেছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ফিরোজ, ডাক নাম লু-লু। এই দুরাচার ফিরোজ, যাকে একদিন খলিফা পরম দয়াবশত জীবন ভিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই-ই একদিন অতর্কিতে খলিফাকে হত্যা করে। এই যুদ্ধকে মহামান্য খলিফা বিজয়ের বিজয় নামে অভিহিত করেছিলেন।

যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল:

এই যুদ্ধে পারস্য সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর মুসলমানগণ ইস্তাখার, পারসিপালিশ, ইস্পাহান, ফারস্, কিরমান, তাবারিস্তান, আজারবাইজান, সিস্তান, খোরাসান, মাকরান প্রভৃতি দেশ জুড়ে প্রধান অঞ্চলগুলোকে দখল করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে পারস্য সম্রাট ইস্পাহান হতে গোপনে ফরগনায় পলায়নকালে আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারান। এই পারস্য বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম একদিন মধ্য এশিয়া পর্যন্ত তার সাম্য ও শান্তির পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়। বর্তমানের ইরাকের কুফা ও বসরা হতে এই সমস্ত ঐতিহাসিক বিজয় একদিন সূচিত হয়েছিল। তাই এই যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অসীম।

এই যুদ্ধের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য পূর্বে সুদূর খোরাসান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। পারস্য সম্রাট বারবার বিশাল সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে কিন্তু নানা কারণে তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। রাজনৈতিক অরাজকতা, আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি, সম্রাটের ও পারিষদবর্গের সীমাহীন লোমহর্ষক অমিতব্যয়িতা, মন্ত্রীদের স্বার্থপরতা, সৈনিকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নানা কারণে সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা, যা পারস্য সম্রাটের পরাজয় অনিবার্য করে তুলেছিল। সবার ঊর্ধ্বে সত্য, জনসাধারণ ও গরিব মানুষ অত্যাচারে অবিচারে সবসময়ই যেন গগনভেদী আর্তনাদ করছিল। যে জিনিষ আল্লার আরশ্‌কে স্পর্শ করে।

অপর দিকে নবধর্মে দীক্ষিত মুসলিম সেনাবাহিনী মহান খলিফা ওমরের সুমহান নেতৃত্বে আখ্‌লাকে ও আদবে আচরণে ও আদর্শে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে পারস্যবাহিনীর তুলনায় অতীব নগণ্য সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও (পারস্য সেনা ১,৫০,০০০ এবং মুসলিম সেনা মাত্র ৩০,০০০) জয়ের গৌরব অর্জন করেন। এই যুদ্ধের ফলে মুসলমানগণ আশাতীতভাবে ইরাক ও ইরানের মতো উর্বর দুটো বিশাল ভূখণ্ডের প্রভূত্বের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেন, সেমোটিক

ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের তৌহিদবাদ বা একত্ববাদ আর্য ধর্ম অর্থাৎ পারশিক অগ্নি পূজার ওপর বিজয়ী হল। ইরাক ও ইরান বহুদিন হতে দূর অতীতের সভ্যতার যে পিলসুজ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রণকৌশলে, আচারে-বিচারে, শাসনে-প্রশাসনে, রীতিতে-নীতিতে, শিল্পে-সাহিত্যে, সভ্যতাতে-সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, দর্শনে-দর্পণে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে সেগুলোর ওপর আরবীয় মুসলমানগণ সম্যক জ্ঞান লাভ করে সমুন্নত সাম্যভিত্তিক জীবনের পথকে প্রশস্ত করে তোলেন।

হামাদান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে তারা পারস্য রাণীদের অগ্নি মন্দিরগুলোতে রক্ষিত বিপুল ধন-রত্ন লাভ করলেন। কিন্তু এই সমস্ত বিরাট বিজয়ের ও ধন-রত্ন লাভের কুফল হতে মুসলমানগণও পরবর্তীকালে নিষ্কৃতিলাভ করেনি। তাই বিরাট পারস্য বিজয় মুসলমানদের অবিমৃষ্য সুফল দান করতেও পারেনি। জাতীয় জীবনের যে সমস্ত দুর্বলতার কারণে একদিন দেড় লক্ষ পারস্যবাহিনী মাত্র ত্রিশ হাজার মুসলিম বাহিনীর নিকট কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, পরবর্তীকালে ঐ সমস্ত দুর্বলতাই একদিন আরব-রক্তেও অনুপ্রবেশ করে তাদেরও ছন্নছাড়া করে ছেড়েছিল।

আরবের সেই নিখুঁত ঈমান, অবিচল উদ্যম, সরল জীবন, সততার অনুসরণ, মানব-প্রেম, দরিদ্রকে ভালবাসা, মনুষ্যত্বের জয়গান, মানবতার পূজারী-মন সবকিছুই যেন ধীরে ধীরে মরু-সাহারায় বিলীন হল। সংগ্রামী আরব, সংযমী আরব, আত্মসচেতন আরব, আত্মনির্ভরশীল আরব, মিতব্যয়ী আরব, দুর্বার আরব একদিন অনৈস্লামিক, উচ্ছৃঙ্খল ও চরম বিলাসিতার জীবনে গা ভাসিয়ে দিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তীকাল (৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ) ও তারও পরবর্তী কাল (৭৫০-১২৫৮ খ্রীঃ) তারই জ্বলন্ত প্রমাণ ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায় আজও বহন করছে। পারস্য বিজয়ে বিশেষ করে জালুলা ও মাদায়েন হতে বিপুল যুদ্ধলব্ধ ধন খলিফার নিকট হাজির হলে খলিফা ওমর অন্যান্যদের মতো আনন্দে আত্মহারা বা আতিশয্য প্রকাশ না করেই ক্রন্দনরত অবস্থায় বলে উঠেছিলেন—"এই সমস্ত যুদ্ধলব্ধ ধনের মধ্যে আমি আমার জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ধ্বংসের বীজ দেখতে পাচ্ছি।" আপন জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এত বড় কঠিন সত্য কোন সম্রাট তাঁর জাতির জন্য উচ্চারণ করেছিলেন কিনা, তা আজও কোন ঐতিহাসিকের জানা নাই। মহাকালের গর্ভে অদূর ভবিষ্যতেই তা প্রমাণিত হল। পারস্য বিজয়ের আরো একটি বড় কুফল আমরা লক্ষ্য করি, বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানগণ প্রধানত দুটো ভাগে বিভক্ত—সুন্নি ও শিয়া। এর উৎপত্তি পারস্য হতেই। পারস্যই শিয়া সম্প্রদায়ের জন্মভূমি। সুতরাং পারস্য বিজয়, পরবর্তীকালে মুসলিম সম্প্রদায়কে দুটো ভাগে বিভক্ত করল। অখণ্ড মুসলিম জগৎকে খণ্ডিত করল। যে কোন

জাতীয় জীবনে অখণ্ডতা যেমন আশীর্বাদ, খণ্ডতা তেমন অভিশাপ। অতএব পারস্য বিজয় মুসলমানদের জন্য নিছক আশীর্বাদ আনতে পারেনি, সঙ্গে এনেছিল কিছুটা অভিশাপও। বর্তমানের আরব দুনিয়া অতীতের পারস্য হতে কম কি। তা না হলে সামান্য ইহুদিদের থাপ্পড় খাবে কেন। নিজঘর সামলাতে আমেরিকাকে ডাক দেবে কেন। আজ তারা বীরের জাতি, কিন্তু একান্ত কাপুরুষ।

আমি এ সমাজ বুকে কাপুরুষ হলে
আমরা বীরের জাতি কি ফল বলে।
মানব সমাজ লাগি বড় পরিতাপ
বংশ-কুলের দাবি জাতের প্রলাপ।—হাদিস।

মানব সমাজের পতনের মূল কারণগুলো: কোরআন:

প্রতারণা: ৬১:২,৩।

মিথ্যা: ৭৭:১৪, ১৫, ১৯, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৫, ৪৭!

মদ: ২:২১৯, ৪:৪৩, ৫:৯০, ৯১।

সুদ: ২:২৩, ২৭৫, ৩:১৩০, ৯:৬৪, ৭৬, ১২৪, ১২৭, ১১:১৩, ২৪:১, ৩০:৩৯, ৪৭:২০।

ব্যভিচার: ৪:১৫, ১৯, ১৭:৩২, ২৩:৫, ২৪:২, ৩৩:৩০।

সৎশীল: ৩৭:৮০, ১১০, ১২১, ১৩১, ৭৭:৪৪।

অসৎশীল: ৭৭:১৫, ১৯, ২৪, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৫, ৪৭, ৪৯।।

অত্যাচার: ২:১২৪, ২৭৯, ১১:১৮।

অমিতব্যয়: ৭:৩১, ১৭:২৭, ২৯।

অহংকার: ৪:৩৬, ৭:১৪৬, ১৭:৩৭, ২৮:৭৬, ৩০:১১০, ৩১:১৮, ৩৯:৭২।

অকৃতজ্ঞতা: ৩৪:১৭, ১০০:৬।

সপ্তম অধ্যায়

পরিশিষ্ট
হযরত ওমরের শাহাদত বরণ

কোরআন :

* "আল্লার পথে যারা নিহত হয়,
তাদের মৃত বলো না।
তারা জীবিত,
কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।"

—২ : ১৫৪

*"যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে
তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করুক,
এবং কেউ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করলে,
সে মরুক অথবা বাঁচুক,
আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করবো।"

—৪ : ৭৪।

খলিফা ওমরের শাহাদত বরণ

"কোন মানুষই জানে না—আগামীকাল সকালে সে কি করবে। কোন মানুষই জানে না—কখন কোথায় কিভাবে সে মৃত্যু বরণ করবে।"

কোরআন, সূরা লোকমান ৩১ : ৩৪।

এই একটি মাত্র ছোট্ট বাক্য দ্বারা পবিত্র কোরআন জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের জ্ঞানের দৌড় কতখানি তা নির্ণয় করে দিয়েছে। মানুষ তার জন্মের পূর্বে জানতো না, সে কখন কোথায় যাচ্ছে। আবার মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তেও জানে না, সে কখন কোথায় যাচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে এই কয়েকটা মাত্র গোনা দিনে তার যত ধড়ফড়ানি। সারা বিশ্বের বিশ্ব-রহস্য জানা, সে খুবই বড় বস্তু। সামান্য নিজেদের সম্পর্কেই মানুষ তার সামান্যতমও জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান নিয়ে মানুষের গর্ব করার কোন কিছুই নেই। তাই পবিত্র কোরআন আবার বলে—"হে প্রভু, আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমদের কোন জ্ঞানই নেই।" ২ : ৩২।

লুটিয়ে পড়ে জীবনতরী
জীবন নদীর জানে না কেউ,
এপার হতে ওপারে নিচ্ছে
কখন সে-যে কেমন ঢেউ।
তুমিই সে যে পবিত্র ধন
সূক্ষ্মজ্ঞানী-সর্বজ্ঞানী,
তোমার দেওয়া জ্ঞান ব্যতীত
আমরা কিছু নাহি জানি। ২০ : ১১০

বিশ্বের দুই বিশাল শক্তির অধিকারী ইরান ও রোমকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার পর খলিফা ওমর আপন রাজ্য প্রশাসনের নানা দিক নিয়ে যখন দিবারাত্রি ব্যস্ত, তখন সকলেরই অজ্ঞাতে এগিয়ে এল মহান খলিফার জীবন-সন্ধ্যা। মহানবীর তিরোধানের পর ইসলামের ইতিহাসে এত বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আর ঘটেনি। খলিফার জন্ম ৫৮১ খ্রীস্টাব্দে। ইসলামের ইতিহাসে ৬৪৪ খ্রীস্টাব্দ, তেসরা নভেম্বর, তেইশ হিজরী ২৬ জিলহজ, বুধবার মহাদিনটি এগিয়ে এল। যে মানুষটির অঙ্গুলি নির্দেশে বিশাল দুই রাজশক্তি টলায়মান হয়ে উঠেছিল, তিনি আজ মারাত্মক ভাবেই হত একজন ক্রীতদাসের হাতে।

নাহাওন্দের যুদ্ধের পর বহু বন্দীই মদিনাতে উপস্থিত হয়। জাতিতে পারসিক, ধর্মে অগ্নিপূজক ফিরোজ, ডাকনাম লুলু, খলিফার নিকট প্রাণভিক্ষা নিয়ে ক্রীতদাস রূপে রয়ে গেল—মুগিরাহ বিন শুবহার নিকট। যিনি একদিন বিধর্মী ফিরোজকে করুণাবশত প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন, আজ সেই চরম অকৃতজ্ঞ মানুষটির হাতে তিনি প্রাণ হারালেন। জগৎ লিপিবদ্ধ করল অকৃতজ্ঞতার চরম ইতিহাস। ৩৪ : ১৭, ১০০ : ৬

খলিফা ওমর তাঁর চিরাচরিত স্বভাববশত প্রশাসনের নানাদিক স্বচক্ষে অবলোকন করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। একদিন বাজার পরিদর্শন করতে বেরিয়েছেন, এমন সময় পথিমধ্যে ঐ কুখ্যাত ক্রীতদাস ফিরোজ তাঁকে একটি নালিশ জানায় তার মালিক মুগিরার বিরুদ্ধে। ফিরোজ নালিশ জানাল—তার মালিক তার নিকট হতে বেশি কর আদায় করছে। এবার খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কত কর দিতে হয়। তখন ফিরোজ বলে, দুই দিরহাম। এবার খলিফা জিজ্ঞাসা করেন—সে কি কাজ করে। তখন ফিরোজ জানায়, সে ছুঁতোরের ও কামারের কাজ করে, এবং মাঝে মাঝে হাওয়ায়-চলা কলও তৈরি করে। তখন খলিফা বলেন—তার আয় অপেক্ষা কর বেশি নয়। এবং তাকে আরো বলেন—সে পারলে খলিফাকে একটি কলও তৈরি করে দিক। তখন আবু লুলু চোখ-মুখ লাল করে উত্তর দেয়, "আপনাকে এমন একটি কল তৈরি করে দেবো, যার কথা দুনিয়া কোনদিনই ভুলবে না।" অতঃপর সে দ্রুত চলে গেল। খলিফা অন্যান্য মানুষদের বললেন—'ও আমাকে শাসিয়ে গেল।'

সেদিন ছিল বুধবার ভোর। দিনের আলো তখনো ফুটে ওঠে নি। তখনও প্রায় অন্ধকার। অতি নিকটে না গেলে মানুষ চেনা যায় না। খলিফা মসজিদের দিকে আপন মনে নামাজের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। কোথাও কোনরূপ ছন্দপতন নেই। সকলেই সমবেত হচ্ছেন মসজিদে। খলিফা নামাজ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হলেন, যথানিয়মে নামাজ আরম্ভ হল। সকলেই নামাজে মগ্ন খলিফা সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআন পাঠ আরম্ভ করেছেন। হঠাৎ যেন বিষাদের বাঁশি বেজে উঠল। কোথাও যেন ক্ষণিকের মধ্যেই মুসলিম জাহানের অতি বীভৎসময় ছন্দপতন ঘটে গেল। অতীব অতর্কিতে খলিফার শরীরে অত্যন্ত বিষাক্ত ছুরি দ্বারা পর পর ছয়বার মর্মান্তিক আঘাত। মহামান্য খলিফা লুটিয়ে পড়লেন, চিৎকার করে বললেন—"ধর ঐ কুকুরটাকে, আমাকে খুন করে ফেলল।"

দুরাচার ফিরোজ রাত্রির অন্ধকারে মসজিদে লুকিয়েছিল—কেবলমাত্র খলিফাকে বধ করার জন্য। নিজে ছিল কর্মকার, পছন্দমতো একটি বিষাক্ত ছুরি তৈরি করেছিল। যার দুদিকে ছিল তীক্ষ্ণ ফলা। দুরাচার আবু লুলু খলিফাকে প্রাণান্তক আঘাত করেই দ্রুত পলায়নের চেষ্টা করলে বহুলোক তাকে ধাওয়া করে, যাদের মধ্যে বারো জন মারাত্মক ভাবেই আঘাত পায়, এমনকি ছয় জন মারাও যায়। অবশেষে তার মাথার ওপর কয়েকজন একটি লম্বা চাদর ছুড়ে দিয়ে তার পথ অবরোধ করলে বিশ্ব-পাপী সঙ্গে সঙ্গে আপন বিষাক্ত ছুরি দ্বারা আত্মহত্যা করে।

মহামান্য খলিফা আহত অবস্থাতেই বয়স্ক সাহাবী আব্দুর রহমান-বিন-আউফকে নামাজ পরিচালনা করার জন্য ইঙ্গিত দিলেন। আব্দুর রহমান দুটো ছোট্ট সূরা (আসর-১০৩, ও কাউসার-১০৮) দ্বারা অতি সত্বর নামাজ সমাধা করে আহত খলিফাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। খলিফা অচৈতন্য অবস্থা থেকে চৈতন্য ফিরে এলে প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন—কে তাঁর আততায়ী? যখন জানতে পারলেন আবু লুলু বা অগ্নিউপাসক ফিরোজ, তখন আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন যে, কোন মুসলিম বা কোন আরব তাঁকে খুন করেনি। সঙ্গে সঙ্গে দুজন দেশবিখ্যাত চিকিৎসককে ডাকা হল। একজন আনসারী ও অন্য জন বানু মাবিয়া বংশের প্রখ্যাত চিকিৎসক। খলিফাকে প্রথম কিছুটা ফলের রস খেতে দেওয়া হল, কিন্তু নাভীর নিচে ক্ষত এতখানি গভীর হয়েছিল যে ফলের রস ঐ ক্ষতস্থান বয়ে বের হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আবার কিছুটা দুধ খেতে দিলে ঐ একই পরিণতি দেখা গেলে চিকিৎসকদ্বয় একেবারেই হতাশ হয়ে খলিফাকে তাঁর চরম পরিণতির কথা সকরুণ স্বরে অবগত করালে খলিফা সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে উত্তর দেন যে—"আমাকে আল্লাহ ডাক দিয়েছেন, আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত। তোমরা আমার

জন্য ক্রন্দন করো না, অতিরিক্ত ক্রন্দন মৃতের ওপর আজাব আনে।” সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কিছুক্ষণের জন্য মাতন করে উঠলেন। কেননা সকলেই বুঝতে পারলেন মহামান্য খলিফা চিরবিদায়ের পথে।

তখন সমগ্র মদিনাবাসী ভেঙে পড়েছে। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সকলেই হতবাক, সবার মনে একটি প্রশ্ন কেন মহামান্য অতীব ন্যায়পরায়ণ খলিফার ওপর এই আক্রমণ। এর পেছনে কে আছে? নিশ্চয়ই এই হত্যা একজন দাসের চিন্তাপ্রসূত নয়, দাস এই জঘণ্যতম কাজে পরিচালিত হয়েছে মাত্র। যার পশ্চাতে আছে কোন বড় মাথা। আমরা সকলেই জানি যখন পারস্যের এক একটি রাজ্য বা প্রদেশ মুসলমানদের হাতে ফাল্গুনের পাতা পড়া হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, তখন পারস্যের পারসিক অগ্নি-উপাসকগণ কোনভাবেই মুসলমানদের সুনজরে দেখেনি। যারা মুসলমানদের সকল দিক থেকেই সমূলে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিল, তারা ছিল পারসিক, ইহুদি ও খ্রীস্টান। এদের সম্মিলিত শক্তিও যখন মুসলমানদের ঠেকাতে পারল না, তখন তারা মুসলিম বিদ্বেষে, হিংসায় জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এবং এই বিদ্বেষবহ্নি ও হিংসার আগুন তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেল, যা আজও নির্বাণ লাভ করেনি। একথা স্বয়ং খলিফারও অবিদিত ছিল না, তাই তিনি আঘাত পাওয়ার পর ক্ষোভ-ভরে বলেছিলেন—“আমি তোমাদের বারবার নিষেধ করেছিলাম—কোন বেদুঈনকে আমার সম্মুখে আসতে দিও না।”

তখনও মদিনাতে কিছু অমুসলিম ছিল। যারা কোন প্রকারেই মুসলমানদের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল কামনা করত না। এই সমস্ত মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল—হরমুজান ও জুফিনাহ। হরমুজান ছিল পরাজিত বন্দী সেনাপতি, পরে মুসলমান, জুফিনাহ ছিল হিরাবাসী খ্রীস্টান, সাদ-বিন-আবি ওক্কায়াসের দুই ভাই। তিনি মদিনায় শিক্ষকতা করতেন। ঐ দুজনেরই আচরণ ছিল সন্দেহ যুক্ত। বয়স্ক সাহাবী আব্দুর রহমান-বিন-আউফ বলেন—‘গতকাল এই ছুরিটি আমি হরমুজান ও জুফিনার নিকট দেখেছি, এবং তাদের জিজ্ঞাসা করি—এই ছুরি দ্বারা কি হবে, তখন তারা বলে গোশত্ কাটা হবে।’ ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকরের পুত্র আব্দুর রহমান বলেন—‘আমি গতকাল আবু লুলুর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং লক্ষ্য করলাম সে হরমুজান ও জুফিনার সাথে একান্তে কি যেন বলাবলি করছে। আমাকে দেখে হঠাৎ দ্রুত পালাবার চেষ্টা করলে তার নিকট হতে একটি ছুরি পড়ে যায়, ছুরিটির দুদিকে ফলা ও মাঝখানে বাঁট দেখলাম, এই ছুরিটিই গতকালের সেই ছুরি।’ এবার জিনিসটি সকলেরই নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন খলিফা ওমরের পুত্র আব্দুল্লাহ ঐ দুই দুরাচার হরমুজান ও জুফিনাহকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মহানবীর সমাধির পাশে দুটি স্থান ছিল। একটি স্থানে ইসলামের প্রথম

খলিফা আবুবকরকে সমাহিত করা হয়, এবং অন্য স্থানটি খালি ছিল। মহানবীর স্ত্রী বিবি আয়েশার ইচ্ছা ছিল—তিনি ঐ স্থানটিতে সমাহিতা হবেন। যখন খলিফা ওমর নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন তিনি এখন ওপারের যাত্রী, তখন তিনি পুত্র আব্দুল্লাহর দ্বারা বিবি আয়েশাকে অনুরোধ জানালেন—ঐ স্থানটির জন্য। বিবি আয়েশা ক্রন্দনরত অবস্থায় আব্দুল্লাহকে জানালেন—'আমার ইচ্ছা ছিল ঐ স্থানটিতে আমিই সমাহিতা হবো। কিন্তু আজ পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করল ঐ স্থানটিকে ওমরের জন্য ছেড়ে দিতে। আমি ঐ স্থানটি হতে আমার দাবি তুলে নিলাম কেবলমাত্র ওমরের জন্য।' আব্দুল্লাহ ঘরে ফিরে পিতাকে বিবি আয়েশার কথা জানালে তিনি খুশি হলেন, এবং বললেন—'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা আল্লাহ্ পূরণ করলেন। আমি পরলোক গমন করলে আমার লাশ বিবি আয়েশার গৃহে নিয়ে যাবে, এবং আবার তাঁর নিকট অনুমতি নেবে, কেননা তখন আমি আর খলিফা থাকবো না।' খলিফার নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছিল।

মহানবীর তিরোধানের পর খেলাফতকে কেন্দ্র করে অসামান্য সমস্যা মাথাচাড়া দিয়েছিল। ইসলামের তরী যখন ডুবুডুবু, সকলেই যখন বিচলিত, বিব্রত, সকলেই যখন গোষ্ঠী চিন্তায় মগ্নপ্রায়, তখন একমাত্র ওমরই ঐ জাতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করেছিলেন। আজ মদিনা ওমরবিহীন, আজ আরব ওমরবিহীন। কে আজ জাতির এই মহাক্ষণে সাড়া দেবে। কে হবে আজ কাণ্ডারী। সকলেই আজ মহাচিন্তায় পড়লেন। সকলেই খলিফা ওমরকে সানুনয় অনুরোধ করলেন—'আপনি থাকতে থাকতে আপনার পছন্দমতো একটি মানুষের নাম করে যান, যাঁকে আমরা খলিফা রূপে বরণ করতে পারবো।' খলিফা তাঁর জীবিতকালে বহুবার এই প্রশ্ন নিয়ে আপন মনে চিন্তা করতেন, কাকে তাঁর পর খলিফার আসনে বসানো যায়। কিন্তু কোন সময়ই তিনি খুব একটা উপযুক্ত মানুষ খুঁজে পেতেন না। যেমন একদিন দ্বিধাহীন চিত্তে আবুবকরের নাম ঘোষণা করেছিলেন, তেমনটি আজ আর নেই। তাই তিনি অন্তিম শয়নে ছয় জনের নাম ঘোষণা করলেন এবং বললেন—তাঁব নিকট ছয়জন অপেক্ষা আর কোন যোগ্য ব্যক্তির নাম জানা নেই। সুতরাং এই ছয়জনের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তিনিই খলিফা নির্বাচিত হবেন। এই ছয়জন ছিলেন—১। সাদ বিন ওক্কাস, ২। আব্দুর রহমান-বিন-আউফ, ৩। আলী বিন আবু তালিব, ৪। ওসমান বিন আফফান, ৫। জুবায়ের-বিন-আওয়াস, ৬। তালহা বিন আব্দুল্লাহ।

অন্তিম শয়নে অন্তিম বাণী:

'আমার পর যিনি খলিফা নির্বাচিত হবেন—তিনি যেন পাঁচ শ্রেণীর মানুষেব দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন থাকেন—

১। মুহাজেরীন, ২। আনসার, ৩। বেদুঈন, ৪। প্রবাসী আরবগণ, ৫। জিম্মি অর্থাৎ—খ্রীস্টান, ইহুদি, অগ্নিউপাসক ও অন্যান্য বিধর্মীগণ।

বিধর্মীদের সম্পর্কে ওমর অত্যন্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যান। আগামী দিনের খলিফা যেন বিধর্মীদের জীবন-মাল-সম্পদ-মান-ইজ্জত সম্পর্কে খুবই সচেতন থাকেন। তিনি তাঁদের সাধ্যাতীত কোন হুকুম না করেন, যা তাঁরা পালন করতে কষ্ট পাবে। যদিও খলিফা একজন বিধর্মীর হাতেই মারা গেলেন, তবুও জীবনের শেষ লগ্নে সেই বিধর্মীদের প্রতি তাঁর হৃদয়-উজাড় করা ভালবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ, মায়া, মমতা সকল কিছুই চিরদিনের জন্য রেখে গেলেন। এখানেই বোঝা যায় খলিফা ওমর কত বড় উদার-প্রাণ, মহৎ-প্রাণ ও মহান ছিলেন। জাতীয় জীবনের নানা সমস্যার প্রতি খলিফা সুনিপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পর আপন ব্যক্তিজীবনের প্রতি লক্ষ্য দিলেন। পুত্র আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমার ঋণের পরিমাণ কত?' আব্দুল্লাহ উত্তরে বলেন—'ছিয়াশি হাজার দিরহাম।" এই টাকা খলিফা কোনদিনই আপন ব্যক্তিগত কারণে বা পারিবারিক কারণে ব্যয় করেননি। এটা খলিফা হিসাবে ব্যয় করেছিলেন—গরিব মানুষের জন্য। তবুও মহৎপ্রাণ খলিফা এটাকে ব্যক্তিগত ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে পুত্রকে নির্দেশ দিলেন তাঁর আপন সম্পত্তি বিক্রি করে এই ঋণ পরিশোধ করতে। এবং আরো নির্দেশ দিলেন, যদি তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করেও সমস্ত ঋণ পরিশোধ না হয়, তাহলে যেন তাঁর আপন গোত্র 'আদি'-র নিকট জানানো হয়, তাঁরাও যদি অক্ষম হয়, তাহলে যেন কোরেশদেরকেও জানানো হয়। তবুও ঋণ যেন পরিশোধ করা হয়। পরিশেষে আমির মুয়াবিয়ার নিকট ওমরের বাসগৃহটি বিক্রি করে এই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা হয়। খলিফা ওমরের এই বাসগৃহটি ছিল বাবুস্-সালাম (শান্তির দরজা) ও বাবুর-রহমত (করুণার দরজা) নামক দুটি পবিত্র দরজার মধ্যবর্তী স্থানে। ঋণ পরিশোধের পব এই বাড়িটি দারুল-কাজা অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের বাসভূমি নামে পরিচিত হয়।

খলিফা আহত হন বুধবার ভোরে। শনিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহ..... রা'জেউন)। দশ বছর ছয় মাস চার দিন ইসলাম জগতের অবিস্মরণীয় মহান খলিফার দায়িত্ব পালন করেন। স্বয়ং মহানবী ওমর সম্পর্কে একদিন বলেছিলেন—'আমার পর যদি কেউ নবী হতো, সে হতো ওমর। আজ পর্যন্ত ইসলাম জগতে যত বড় বড় দুর্ঘটনা, দুর্যোগ ও দুর্ভাগ্যময় ঘটনা ঘটে গেছে, খলিফা ওমরের হত্যা বা মৃত্যু তাদের অন্যতম। সারা বিশ্বের দরবারে এই ব্যক্তিত্বের কথা বলে কোনদিনই শেষ করা যাবে না। আমাদের চিন্তা করতেও ভয় হয়, আমরাও মানুষ, আবার হযরত ওমরও মানুষ। এই দুই মানুষের মাঝে কত দুস্তর ব্যবধান রয়ে গেছে, তা কোনদিনই চিন্তাও করা যাবে কি!

হজরত আলী শিশুর ন্যায় ক্রন্দনরত অবস্থায় বলেছিলেন—'আবু হাফসা!

হে হাফসার পিতা, আল্লাহ্ আপনাকে নিজ রহমতে সিক্ত করে দিলেন, মহানবী ব্যতীত্ আপনি অপেক্ষা আমার নিকট এত প্রিয়জন আর কেউই ছিলেন না। আজকে আরব অনাথ হয়ে গেল।'

মহামান্য খলিফার লাশ বা মরদেহ মসজিদে-নববীতে আনা হল। কি সকরুণ দৃশ্য। পর পর তিনটি মহামানব চলে গেলেন—স্বয়ং মহানবী, আবুবকর ও ওমর। যে তিনজন মানুষের কোন বিকল্প মানুষ ছিল না। আজ তাঁরা তিনজনেই বিদায় নিলেন। এ শূন্যস্থান আর পূরণ হওয়ার নয়। একদিন মহানবীর পতাকা হাতে নিয়েছিলেন আবুবকর, আবার আবুবকরের পতাকা হাতে নিয়েছিলেন ওমর। আজ ওমরের পতাকা হাতে নেবে সেই—কর্মনিষ্ঠ, লৌহমানব, খরদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, তেজদীপ্ত মনস্বী, সারা বিশ্বের বিস্ময়পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক আজ কোথায়! মহানবী দাঁড়িয়েছিলেন বিশাল আকাশের ন্যায়, যে আকাশে একটি সূর্য ও একটি চন্দ্র উদিত হয়েছিল আবুবকর ও ওমব।

মহামান্য খলিফার নির্দেশমতো শোহায়ের জানাজার নামাজ পড়ালেন। আব্দুল্লাহ, আলী, ওসমান, আব্দুর রহমান, সাদ ও জুবায়ের খলিফার নশ্বর দেহকে কবর মাঝে শেষ শয্যায় শায়িত করলেন। তখন মনে হয়েছিল—আসমান ও জমিন যেন ভেঙে পড়ল। আকাশের সূর্য যেন তার শেষ রশ্মি হারিয়ে ফেলল, চন্দ্র যেন উদিত হতে অনিচ্ছুক হল। বিশ্ব যেন হারাল তার বিরল বন্ধুকে, মানবতার মহান দূত অদৃশ্য হলেন, মনুষত্বের মহাসেবক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, গরিবের চির-বন্ধুর চির বিদায়, অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল আজ অরক্ষিত, বিশ্ব-বিচারের চির প্রবাদপুরুষ আজ প্রাণ দিলেন, তাঁর ধূলির দেহ ধরণীর ধূলি-মাটিতে মিশে গিয়ে ধরণী ধন্য হল, একটি পবিত্র আত্মা ফিরে গেল আজ অনন্তের দরবারে, একটি মানুষ আজ রেখে গেলেন অসংখ্য মানুষের জন্য মানব-জীবনের মহান আদর্শ, একটি শাসক আজ রেখে গেলেন বিশ্ব-শাসকের জন্য কতই না সুন্দর শাসননীতি, সম্রাট ওমর উটের রশি ধরে ধাবমান, দাস যাঁর আরোহী, জেরুজালেমের পথে এই দৃশ্য দেখে হয়তো সেদিন আল্লাহর আরশও কেঁপে উঠেছিল, ৫৮২-তে মায়ের কোলে, ৬১৫-তে রসুল-পাকের পদতলে, ৬২২-এ মদিনার পথে নবী-পাগল পথিক, ৬৩২-এ মহানবীর ইন্তেকালে পাগল-প্রায় ও খলিফা নির্ণয়ে মুসলিম জাহানের প্রথম মানব, ৬৩৪-এ সগৌরবে খেলাফতে, ৬৪৪-এ অর্ধপৃথিবীর অধীশ্বর মহান আল্লাহর আবেহায়াতের সন্ধানে, জীবনে ছিলেন মহানবীর দক্ষিণ বাহু, মরণেও হলেন পাশের সাথী। কি পরম সৌভাগ্য, কি ভাগ্যবান পুরুষ।

হে ওমর! তুমি নবীও ছিলে না, রসুলও ছিলে না, তুমি ছিলে আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ; একজন সাধারণ মানুষের চরিত্র যে এত উন্নত হতে পারে, জগৎ আজও যা চিন্তা করতে ভয় পায়। ন্যায়-অন্যায়ে তুমি ছিলে বিধাতার বহির প্রকাশ। ৪:৫৮, ২৩৫, ৫:৮, ১৬:৯০, ৫৭:৩।

অষ্টম অধ্যায়

হযরত ওমরের প্রশাসন ও সংবিধান
বিশ্ব-সংবিধান

কোরআন :

* মানুষ যখন অন্ধকারের
ভীষণতম কুসংস্কারে
ডাক দিয়েছে তোমার দূত—
জ্বালিয়ে মশাল এ সংসারে।
মানবাকাশে উঠল ভেসে
সূর্য-সম তোমার দূত
সঙ্গে নিয়ে বিশ্ব-বিধান
আজও যাহা নিটোল নিখুঁত।
নাই কোন যার পরিবর্তন
কালের ঊর্ধ্বে বিরাজমান
ভূত হতে ভবিষ্যতেও
মহাকালের সংবিধান।
সাম্যের লাগি শান্তির লাগি
বিশ্ব-স্রষ্টার শেষ আহ্বান।
চির-শান্তির চির নির্দেশ
দিতেছে তোমার মহাকোরআন।

কোরআন : * এটি মানব জাতির সংবিধান। ৪৫ : ২০।
এটি বিশ্বজগতের সংবিধান। ৬৮ : ৫২।
এটি মানব জাতিকে বের করে আনে
অন্ধকার হতে আলোতে। ১৪ : ১।

কোরআন : ২ : ২, ২৩, ২১৩, ৩ : ১৯১, ৪ : ৮২, ৬ : ৩৪, ১০ : ৩৭, ৩৮, ৬৪, ১৮ : ২৭, ২১ : ১০, ২৩ : ১১৫, ৪৫ : ২০, ৫১ : ৯, ৫৪ : ২২, ৩২, ৪০, ৫৬ : ৭৭, ৮০, ৮১, ৬৮ : ৫২।

ইসলামের রাজ্য জয়ের অন্তরালে কি ছিল
(Background of the Conquests of Islam)

মহানবীর যুগ (৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ):

ইসলামের প্রবর্তক ও প্রধান প্রচারক মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) এই জগতে এসেছিলেন কোন এক সাম্রাজ্য যেমন গড়তেও নয় তেমনি ভাঙতেও নয়। তিনি এসেছিলেন মনুষ্যত্বের সাম্রাজ্য গড়তে ও মানবতার রাজ্য বিস্তার করতে। মনুষ্যত্বের সাম্রাজ্যটি সেদিন শূন্যে মিশে গিয়েছিল। মৃত্যুর দুয়ারে ধিক ধিক বা ধুক ধুক করছিল মানবতার রাজ্য, হেনকালে তাঁর অবির্ভাব:

জন্ম তোমার মরুজগতে বিশ্ব-মানব ধন্য
পথহারা এক হরিণী যখন বিশ্ব তোমার জন্য।
বিশ্বজোড়া মানবতার রুখে দিয়ে মৃত্যুবাণ
মরণমুখী মনুষ্যত্বে সঞ্চারিলে বীরের প্রাণ।
তোমার কাজের শ্রেষ্ঠ যে-কাজ সমাজ সংস্কার
তোমার কাছে সবাই ঋণী এ বিশ্ব-সংসার।

মহানবীর মূল ব্রত ছিল সাম্যভিত্তিক সমাজ সংস্কার, এবং সকল সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা বন্দিত হোন। এই-ই ছিল তাঁর মূল ব্রত:

মনের কোণে দেখেছি তোমার দুইটি ছিল আরাধনা
সাম্যের বুকে সমাজ গড়া প্রতিপালকের বন্দনা।
বিশ্ববুকে তোমার ব্রত বিশ্বস্রষ্টার বন্দনা
সেই স্রষ্টারই সন্তান সবে এক অভিন্ন ভাই জানা।

মহানবীর পরবর্তীকালে তাঁকে যারা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পেরেছিলেন পরিচালনার দিক থেকে, প্রধানত তাঁরা ছিলেন তাঁর চারজন খলিফা—আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী। এঁরা কোনদিনই এক মুহূর্তের জন্যও মহানবীর চিন্তাধারা থেকে পদস্খলিত হননি। এঁদের মনের কোণে বুকের মাঝে কোনদিনই রাজ্য বিস্তারের কোন আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠেনি! কেবলমাত্র আপন নিরাপত্তার জন্য যেটুকু করার প্রয়োজন মনে করতেন, ততটুকুই করতে চাইতেন। এর বেশি তাঁদের কোনরূপই ইচ্ছা ছিল না। এককথায় তামাম দুনিয়ার তামাম সত্যভাষী ঐতিহাসিক এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, তদানীন্তন রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশই ইসলামের শান্তি-পতাকাতলে মুসলমানদের নজিরবিহীন বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার একমাত্র হেতু ছিল। দুর্ধর্ষ আরব জাতি, বনের বাঘ যেন বনে ঘুমিয়েই ছিল, শিকারী পারস্য ও রোম অহেতুক ভাবে খুঁচিয়ে না দিলে রাজ্যবিস্তারে তার ঘুম হয়তো কোনদিনই ভাঙতই না।

রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে মহানবীর খোলাখুলি দুটি উদ্দেশ্য ছিল—আরব এতখানি নিরাপদ হয়ে উঠুক, যেন তদানীন্তন দুই বিশ্বশক্তি—পারস্য ও রোম তাদের দিবা-রাত্রি ধমক দিতে না পারে। সব সময়ই তাদের খাব খাব না করে। দ্বিতীয়টি ছিল—পারস্য ও রোম আল্লাহ্র বাণী কোরআনকে মেনে নিয়ে শান্তির সাথে সবাই আপন আপন স্থানে অবস্থান করুক। এতদ্ব্যতীত মহানবীর তৃতীয় কোন উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনাই ছিল না। আমরা সকলেই জানি সিরিয়া প্রান্তে মহানবীর অভিযান পাঠানোর মূলে কি ছিল। তিনি সিরিয়া প্রান্তে কয়েকবার ইসলাম প্রচারে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা কোন গুপ্তচর বা সৈনিক ছিলেন না, কিন্তু রোমানগণ বারবারই যখন তাদের হত্যা করতে থাকে, তখন তিনি নিরুপায় হয়েই অভিযান পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেননা তাঁর কোরআনভিত্তিক নীতি ছিল—"অত্যাচার করো না, এবং অত্যাচার সহ্যও করো না।" ২:১২৪, ২৭৯। ১১:১৮। এখানে রাজ্য বিস্তাবের বা সাম্রাজ্য স্থাপনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি ছিলেন আল্লাহর মহান দূত। দূতের কঠোর ও পবিত্র কর্তব্য পালন করছিলেন। এই পালনই ছিল তাঁর পবিত্র পেশা।

ধরার বুকে কোরআন প্রচার পবিত্র তোমার পেশা
মানব জাতির উত্থান ছিল একটি তোমার নেশা।

খলিফাদের যুগ: (৬৩২-৬৬১ খ্রী:):

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর নিখুঁতভাবেই মহানবীর নীতিতে দাঁড়িয়েছিলেন। যখন ঘরে-বাইরে সকলেই তাঁকে একেবারেই তুলে ফেলতে বদ্ধপরিকর হল, তখনই তিনি তাঁর আপন স্বরূপ তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে যা ঘটেছিল, সেকথা ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায় চির উজ্জ্বল, চির অম্লান, চির নজিরবিহীন, ।চিরবিরল। দৃষ্টান্ত। সেদিন সকলেই লক্ষ্য করেছিলেন—ইসলামের সিংহ আবুবকরের স্বরূপ কি ছিল, তাঁর সারকথা কি ছিল, সারমর্ম কি ছিল।

অতঃপর আমরা লক্ষ্য করব—ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের পররাষ্ট্রনীতি কি ছিল। পারস্যের রাজধানী স্বর্গপুরী মাদায়েন দখলের পর যখন সেনাপতি সাদ-বিন-আবি ওয়াক্কাস মহামান্য খলিফার অনুমতি চাইলেন পারস্যের অন্যান্য অঞ্চলগুলো দখল করার জন্য, তখন খলিফা যে জবানীতে যা উত্তর দিয়েছিলেন, তা হতে পরিষ্কার বোঝা যায়, খলিফার পররাষ্ট্রনীতি কি বা কেমন ছিল; "যদি আমাদের ও পারসিকদের মধ্যে একটি আগুনের পাহাড় বিদ্যমান থাকত, তাহলে তারাও আমাদের আক্রমণ করতে পারত না, এবং আমরাও তাদের হামলা করতে পারতাম না। জেনে রেখ, মরুর সম্পদই আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট করেছেন। জেনে রেখ, আমার নিকট

মুসলমানদের নিরাপত্তা মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ ধন অপেক্ষা অনেক বেশি কাম্য।" এখানে আমরা রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফাব উদ্দেশ্য অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবেই জানতে পারলাম। তিনি মহানবী ও আবুবকরেব মতই চেয়েছিলেন—আরব ভাষাভাষীদের নিয়ে একটি অখণ্ড আরব রাষ্ট্রেব স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠামাত্র।

জয়ের উপসংহার :

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর নিহাওয়ান্দের যুদ্ধের পব ভেবেছিলেন আর কোন যুদ্ধ বাধবে না। কিন্তু পারস্য ও রোমানদের বারবাব অহেতুক ব্যবহারে খলিফা তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে বয়স্ক সাহাবীগণের পরামর্শ চাইলেন, কি করা যায়। সকলেই ছিলেন মহানবীর ভালবাসা ধন্য, সকলেই ছিলেন পরম ও চরম শান্তিকামী মানুষ, কিন্তু সকলেই এক মত হয়ে খলিফাকে বোঝাতে বাধ্য হলেন—যতদিন পারস্য সম্রাট ইয়েজদ্গির্দকে পারস্যের মাটি থেকে একেবারেই নির্বাসনদণ্ড দেওয়া না যাবে, ততদিন পারস্য হতে এই ষড়যন্ত্রের কোন অবসান আশা করা দুরাশা মাত্র। এইভাবে একদিন আপন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার নিমিত্তই রাজনীতির ও পরবাষ্ট্রনীতিব পরিবর্তন অপরিহার্য ও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল রোমান ও পাবসিকদের দিনের পর দিন অশুভ ও অসৎ আচরণে, বদ সংকল্পে ও গোপন ষড়যন্ত্রে। তখন অভিজ্ঞ খলিফা বুঝতে পেরেছিলেন—এর জট কোথায় নিহিত আছে। এবার খলিফা বদ্ধপরিকর হলেন ঐ বিষবৃক্ষটি জট সহ তুলে ফেলতে, যা ছিল পারস্যের সিংহাসন ও পারস্যের সম্রাট।

খলিফা ওমর বদ্ধপরিকর :

খলিফা যখন ভালভাবে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে পাবস্য সম্রাটের চিহ্নমাত্র থাকতে তিনি আরব বিদ্বেষকে পরিহাব করবেন না, দিবারাত্রি অশান্তি চলতেই থাকবে। এই অশান্তির নিরসনকল্পেই তিনি বদ্ধপরিকর হলেন সমগ্র পারস্যকে জয় করতে হবে—কেবলমাত্র শান্তির জন্য, সম্পদ বা সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য নয়। তিনি সমগ্র পারস্যকে জয় করার নিমিত্ত এক একটি প্রদেশের জন্য এক একজন সেনানায়কের হাতে এক একটি ইসলামেব পতাকা তুলে দিয়ে বললেন—এবার উভয় দেশে শান্তি আন। তখন একুশ হিজরী অর্থাৎ ৬৪৩ খ্রীঃ। নিম্নলিখিত প্রদেশগুলো নিম্নলিখিত সেনানায়কগণের তত্ত্বাবধানে পড়ল :

১। আজারবাইজান — সেনানায়ক উৎবাহ্

২। মাকরান — হাকাম বিন ওমর আল তাগলাবি

৩। সিস্তান — আসিস বিন ওমর

৪। কির্মান — সুহায়েল বিন আদি

৫। ফাসার — সাবিয়াহ্ বিন রহম-আল কিনানী
৬। খোরাসান — আহ্‌নাক বিন-কায়েস
৭। সবুর — মাজাশা বিন মাসুদ
৮। ইস্‌তিখার — ওসমান বিন আল অসল সাকাফী
৯। ইস্পাহান — আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ
১০। হামদান — নুয়াইম বিন মাকরান
১১। রায় — নুয়াইন বিন মাকরান
১২। জুর্জান — সুয়াইদ বিন মাকরান
১৩। তাবারিস্তান — সুয়াইদ বিন মাকরান

জয়ের উপসংহার বলতে এখানেই শেষ। তবে জয়গুলো কিভাবে হল, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমরা জয়ের উপসংহার পর্যন্ত এসে অনায়াসেই বুঝতে পারলাম—ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্তরালে কি ছিল। ছিল না কোন বিশেষ সেনাবাহিনী ও অসৎ কামনা। অন্যের চাপে পড়েই এটা ঘটেছিল। এইটাই মূল সত্য।

সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ ইস্পাহান আক্রমণ করলে সেখানকার শাসনকর্তা ইসতানদার বিশাল বাহিনী-সহ আক্রমণ প্রতিরোধ করলে ভীষণ যুদ্ধ বাধার পূর্বেই পারস্যবীর সহরবাজ জাদুয়াহ আব্দুল্লাহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালে প্রথম আঘাতেই জাদুয়াহ মৃত্যু বরণ করলে প্রদেশ রাজ ইসতানদার ভীত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে সন্ধি করেন। কিন্তু নগরপাল ফাদুসকান পুনরায় মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে পরিশেষে জিজিয়া কর দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। নুয়াইম বিন মাকরান হামাদান আক্রমণ করলে তারা বশ্যতা স্বীকার করলেও দাইলাম-রায় ও আজারবাইজানের শাসকগণ সম্মিলিতভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায়। পরিশেষে সম্মিলিত বাহিনী মুসলিম বাহিনীর নিকট একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। খলিফা এই সংবাদে অত্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

অতঃপর খলিফা নুয়াইমকে রায় প্রদেশের দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলে রায়ের শাসক বাহরাম অন্যান্য কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সেনানায়ক জেবিন্দি নামক পারসিক প্রধানের সাহায্যে রায় অধিকার করে জেবিন্দিকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করে তিনি নিজে রায় শহরে অবস্থান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে সুয়াইদ কুমাস নামক বিখ্যাত দুর্গটি দখল করেন। সেনানায়ক হুজাইফা-বিন-ইয়ামান আজারবাইজানের রাজধানী আর্দবেলে উপস্থিত হলে, সেখানকার শাসক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে পরিশেষে বার্ষিক আট লক্ষ দিরহাম কর দিয়ে সন্ধি করেন। অতঃপর হুজাইফা মুকান ও জাবালিন দখল করতে অগ্রসর হলে পুনরায় আজারবাইজানে বিদ্রোহ দেখা দিলে খলিফা উৎবাক দ্বারা ঐ বিদ্রোহ দমন করেন।

সুয়াইদ কুমাস জয় করে জুর্জানের দিকে অগ্রসর হলে সেখানকার শাসনকর্তা রুজবান জিজিয়া-সহ সন্ধি করেন। তাবারিস্তানও ঠিক একই পথ অনুসরণ করল পাঁচ লক্ষ দিরহাম কর দিয়ে। সেনানায়ক বুকাইর আজারবাইজান দখল করে বাব শহরে উপস্থিত হলে বাবের শাসনকর্তা জিজিয়ার পরিবর্তে সামরিক সাহায্য দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সন্ধি করেন।

সেনাপতি সাদ কাদিসিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করার পর সেনাপতি আলা-বিন আল হাদরামী বাহরায়েন থেকে সমুদ্র পথে ফারস আক্রমণ করেন। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে খলিফার অনুমতি ব্যতীতই এই অভিযান আরম্ভ করেন। ইসতিখার নামক স্থানে মুস[illegible] সেনারা অবতরণ করলে সেখানকার শাসনকর্তা তাঁদের গতি রোধ করেন। এবং সমুদ্র পথ বন্ধ করে মুসলমানদের জাহাজগুলো দখল করে নেন। তখন সেনানায়ক খালিদ-বিন-মুনায়ব নিজেদের জাহাজগুলো হস্তচ্যুত হওয়ায় বসরা অভিমুখে ফেরার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারসিকগণ সে পথটিও বন্ধ করে দেয়।

খলিফা ওমর এই ভয়াবহ সংবাদ কর্ণগোচর হওয়ামাত্রই আলাকে ভীষণ তিরস্কার করে সেনাপতি উৎবাকে নির্দেশ দেন সাহায্যের জন্য। উৎবাব আদেশে সেনানায়ক আবু সাবরা বারো হাজার সৈন্য-সহ ফারসের দিকে অগ্রসর হলে সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ বাধে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীই বিপুলভাবে বিজয়ী হন। আবু সাবরা বসরায় প্রত্যাগমন করেন। এই বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাবুর, তোজ, ইসতিখার প্রভৃতি অঞ্চলগুলোও বিজিত হয়। সেনানায়ক সুহায়েল কিরমান দখলে অগ্রসর হলে সেখানকার শাসনকর্তা কাফ্‌স্ তুমুল বেগে বাধা দিয়েও নিহত হন। ফলে বাণিজ্য কেন্দ্র জিরকত ও সিরজান মুসলমানদের হস্তগত হলে তাঁরা প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেন।

আসিম বিন ওমর সিস্‌তান অধিকার করেন। হাকাম মাকরান জয়ে পদক্ষেপ রাখার সঙ্গে সঙ্গে শাসনকর্তা রাসেলের সাথে নদীতীরে ভীষণ যুদ্ধ বাধে। পরিশেষে রাসেল প্রাণ হারান ও মাকরান অধিকৃত হয়। অতঃপর মুসলমানগণ দায়বল ও থানার নিম্ন অঞ্চল অর্থাৎ সিন্ধু ও ভারতের দ্বারদেশ পর্যন্ত ইসলামের শান্তি পতাকাকে তুলে ধরেন।

তাড়িত ও বিতাড়িত সম্রাট :

সেনানায়ক আহনক-বিন-কায়েস (৬৪৩ খ্রীঃ) খোরাসান দখলের মানসে হিরা অঞ্চলে উপস্থিত হলে অঞ্চলটি অধিকার হয়। অতঃপর তিনি মার্ভ-শাহজাহানের দিকে অগ্রসর হন, যখন সম্রাট ইয়েজদ্‌গির্দ সেখানে অবস্থান করছিলেন। সম্রাট মুসলমানদের কথা শোনা মাত্রই সেখান হতে পলায়ন করে বল্‌খে আশ্রয় গ্রহণ করলে আহনক সেখানেও তাঁকে তাড়া করেন। তখন নিরুপায় সম্রাট নদীপার হয়ে তাতার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সেনাপতি আহনক নিশাপুর ও তুখারিস্তান পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করে খলিফাকে সংবাদ দেন সমগ্র ভূভাগ এখন ইসলামের পতাকাতলে।

খলিফার সতর্ক বাণী :

খলিফা কোনদিনই সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে ছিলেন না। তাই তিনি খোরাসান জয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই সেনাপতি আহনককে নির্দেশ দেন 'আর অগ্রগতি নয়'। তিনি আহনককে 'প্রাচ্যের মণি' স্বরূপ প্রশংসা করেন। তবুও বলেছিলেন—"আমাদের ও খোরাসানের মধ্যে যদি একটি আগুনের নদী প্রবাহিত থাকত, কত ভাল হতো, কেউই কাউকে আক্রমণ করতে পারত না।" সকল মদিনাবাসীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—"অগ্নি উপাসকদের সাম্রাজ্য আজ খতম হয়ে গেল; আর তা কোনদিনই ইসলামের ওপর আঘাত হানতে পারবে না। কিন্তু তোমরাও মনে রেখো, যদি তোমরাও সত্যপথ থেকে পথভ্রষ্ট হও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের হাত হতেও এই রাজশক্তি কেড়ে নিয়ে অন্যকে দান করবেন।"

ভাগ্যহত শাহানশাহ :

সম্রাট ইয়েজদ্গির্দ-এর জীবনের অন্তিম ক্ষণটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকল। যখন তাঁকে মার্ভ ত্যাগ করতে হল তখন তিনি বুঝতেই পেরেছিলেন—জীবনের করুণ পরিস্থিতি ও সকরুণ পরিণতি। পশু-পক্ষীর মতো এ ডাল হতে ও ডাল করছেন। কিন্তু কোন বৃক্ষের কোন ডালই তাঁকে একটু স্বস্তির আশ্রয় দিতে পারছিল না। এই-ই ছিল সম্রাটের সকরুণ ইতিহাস। ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর সকলেই চলে গেল, নিকট বন্ধু-বান্ধবরাও চলে গেলেন, সঙ্গীসাথীরাও একের পর এক কেটে পড়লেন, আত্মীয়-স্বজনরা দূরে পড়ে থাকল। একাকী হতাশ সম্রাট তুর্কিস্তানে আশ্রয়ের আশায় নদী পারে এক ফলওয়ালার জীর্ণ কুটীরে রাত্রিবাসের জন্য একটু আশ্রয় নেন। ফলওয়ালা আগুন্তুকের বেশভূষা ও কিছু মূল্যবান দ্রব্যাদি দেখে লোভ সম্বরণ করতে না পেরে রাত্রিকালে সম্রাটের নিদ্রা অবস্থায় অতর্কিতে তাঁকে বধ করেন। তুর্কীগণ সকালে সম্রাটের খোঁজে এসে লক্ষ্য করে সম্রাট নিহত, তখন তারাও রাগে ও ক্ষোভে ফলওয়ালাকেও সপরিবারে বধ করে সকল মৃতকেই নদীগর্ভে ফেলে দেয়। সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি অতি সুপ্রাচীন সাম্রাজ্যেরও সমাধি রচনা হল। যে সাম্রাজ্য বারোশ বছরেরও অধিককাল এই বিশাল ভূখণ্ডে সৃষ্টি করেছিল পৃথিবীর এক ঐতিহ্যবাহী অমর ইতিহাস। এই পতনের আটশ বছর পর আবার ইরানের শাহানশাহের পুনরুত্থান হয়। তাও এখন কালগর্ভে নিমজ্জিত। বর্তমানে ইসলামের আবার সেই আদি গণতন্ত্রের পতাকা উড্ডীয়মান। সুব্হান্ আল্লাহ-আল্লাহ কতই মহান।

বিশাল রোমান শক্তি প্রায় চারশো বছর ধরেও চেষ্টা করে যে পারস্যকে

হতমান করতে পারেনি, মাত্র দশ বছরের চেষ্টায় অখ্যাত আরবজাতি তাঁদের ভাতের হাঁড়ি পর্যন্ত কেড়ে নেয়। এবং তিনশো বছর পর্যন্ত সেখানে এক অবর্ণনীয় প্রতাপ চালায়। এমনকি তাদের ভাষা পর্যন্ত আরবীতে রূপান্তরিত হয়। আমরা লক্ষ্য করলাম বিশাল পারস্য বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে মাত্র চল্লিশ হাজার আরবীয় মুসলিম বাহিনীই যথেষ্ট হয়েছিল। তখনকার দিনে ইতিহাসের এই ঘটনা ছিল সারা বিশ্বের একটি অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। পারস্যের সম্রাট তো বহুদূরের কথা, সে দেশের একটি কাক কোকিলও এ ধারণা করেনি যে, মাত্র দশ বছরে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য একটি কাঁচের ঘরের মতো খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে। অখ্যাত, অজ্ঞাত ও অসভ্য আরবদের হাতে। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।

পারস্য দেশ যে কেবলমাত্র ধনসম্পদেই বড় ছিল, তা নয়। তার গুরুত্ব বহু দিক থেকেই ছিল ও আছে। ইসলামের কারামাতিয়ান আন্দোলন, ফাতেমিয়া আন্দোলন, শিয়া আন্দোলন—আরো বহু আন্দোলনের সুতিকাগার পারস্য। পরবর্তীকালে পারস্য যে অগণিত মহাকবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, জ্যোতিষী এমনকি এককথায় মানব সভ্যতাব এমন কোন অধ্যায় নেই, যেখানে তাঁদের দান ও অবদান পৌঁছয়নি। আজকের বিশ্বসভ্যতা সেদিনের অর্থাৎ ইসলামের যুগের পারস্যের নিকট চিরঋণী। এই পারস্য বিজয়ই একদিন ইসলামকে বিশ্ববিজয়ী করেছিল। পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে ইসলামের যে প্রচার ও প্রসার, সেখানে পারস্য প্রভাব আরবী প্রভাবকেও অতিক্রম করেছে। পারসিক শব্দগুলো বহু আরবীকে বিতাড়িত করে নিজেরাই আসন দখল করে বসে আছে সারা ইসলাম জগতে।

ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হযরত ওমর
(Omar was the real builder of Islamic States)
(Conquests of Omar and his Consolidation of States)

রাজ্যজয় (ইসলামিস্তান) :

খলিফা ওমর সর্বমোট সাড়ে দশ বছর খেলাফত পরিচালনা করেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ২২,৫১,০৩০ (বাইশ লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ) বর্গমাইল জুড়ে ব্যাপক ভূখণ্ডকে নিয়ে 'ইসলামিস্তান' গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। নামকা ওয়াস্তে মুসলিম স্টেট ও ইসলামি স্টেট কখনও এক নয়। আধুনিক কালে মুসলিম স্টেটগুলোও পুরোপুরি ইসলামের পায়াবন্দও নয়। মুসলিম স্টেট ও ইসলামি স্টেটের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। যেমন একটি মানুষ মুসলিম হলেই যে সে ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হবে, এমন কোন কথা নেই। তাহলে মুসলিম জগতের অবস্থা আজ এমন হবে এমন হতো না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ওমরের কোন সাম্রাজ্য মুসলিমস্তান ছিল না, ছিল প্রকৃত ইস্লামিস্তান। প্রকৃত কথা বলতে সেখানে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতাকা উড্ডীয়মান ছিল না, বরং ইসলামের বা ইসলামি আইন-কানুনের পতাকাই উড্ডীয়মান ছিল। সেখানে ইসলামের আইন-কানুন বলতে ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে মুসলমান হতে হবে, এমন কোন কথাও ছিল না। বরং সেখানে ইসলামের নীতি ছিল প্রতিটি মানুষকে আপন আপন আচরণ ধর্মমতে ও চলার পথে শুদ্ধাচারী হতেই হবে। এইটাই ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের নীতির শাসন। এই নীতির অবমাননা করলে শাস্তি ছিল সকলেরই জন্য অনিবার্য। কিন্তু ইসলামি শাসনে ও সাম্রাজ্যে কোনদিনই ধর্মে বল প্রয়োগ ছিল না। কোরআন—২:১৫৬, ৫:৬৯, ৬:১০৮, ১১:১১৮, ১৬:৯৩, ১৭:৮৪, ২২:৬৭, ২৩:৫৩, ৩০:৩২, ৪৫:১৪,১৫, ৪৯:১১,১৩।

রাজ্য সীমানা :

ইসলামিস্তানের সীমানা ছিল মক্কা হতে উত্তরে এক হাজার ছত্রিশ মাইল, পূর্বে এক হাজার সাতাশি মাইল, দক্ষিণে চারশো তিরাশি মাইল, পশ্চিমে লোহিত সাগর, মিশর থেকে শুরু করে সিরিয়া, খোজিস্তান, ইরাক, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, ফারস, কিরমান, মাকরান, খোরাসান ও পূর্বে বেলুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। তখনকার দিনের বিশ্বশক্তি ইরান ও রোমের দুই সম্পদশালী রাজ্য ইরাক ও সিরিয়া ইসলামিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যে দুটো রাজ্য ধনে-জনে, মানে-সম্মানে, শিল্পে-সমরশক্তিতে, শস্যে ও সভ্যতায় দুই বৃহৎ শক্তির তুঙ্গে অবস্থান করছিল। তারাও তখন ইসলামের পতাকাতলে। এই অভাবনীয় পরাজয় ও জয়ের পতন ও উত্থানের পেছনে কি ছিল।

পতনের অন্তরালে চরিত্রহীনতা :

আরবদের এই অচিন্ত্যনীয় জয় সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে পাশ্চাত্যের জড়বাদী ঐতিহাসিকগণের অধিকাংশের মত, দুটি কারণে আরবগণ এই অভূতপূর্ব জয়লাভ করতে পেরেছিলেন। প্রথমটি, পূর্বদেশীয় রোমকরাজ ও পারস্যের কিসরারাজ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আরবগণ এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে ভুল করেনি। দ্বিতীয়টি, রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে তখনকার দিনে নানা ধর্মীয় কলহ ও গোষ্ঠী বিবাদ আরবদের জয়ে কম অবদান জোগায়নি। বাহ্যদৃষ্টিতে কথা দুটো ঠিকই। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, আরবদের জয়ের পেছনে ঐ দুটো কারণের তেমন কোন সারবত্তা নেই। রোমানরা দুর্বল হয়েছিল ধনে-জনে সম্পদে নয়, বরং চরিত্রে-আচারে-বিচারে।

প্রথমেই আমরা আরবদের কথাই লক্ষ্য করবো। তখন আরবরা ছিল—অশিক্ষিত, অসভ্য, মরু বেদুঈন, যাযাবর, অনুন্নত; খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, এমনকি বাসস্থানও নেই বললেই চলে। অন্যদিকে পারস্যের অবস্থা ধনে-জনে-মানে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে ছিল তুঙ্গে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাই মহানবীর সময় হতে হযরত ওমর পর্যন্ত কয়েক ডজন যুদ্ধ বেধে গেল পারস্যের সাথে আরবদের। যদি পারস্যরাজ পারভেজ, কিসরা অত্যন্ত দুর্বলই হবেন, তাহলে কয়েক ডজন যুদ্ধ পরিচালনা করলেন কিভাবে। এই কয়েক ডজন যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা যা লক্ষ্য করলাম, আরবদের প্রথম পথ তৈরি করতে হয়েছে, পরে সেই পথে এক পা এক পা করে অগ্রসর হতে হয়েছে। খুবই কম ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি—আরবরা বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। আমরা বহু স্থানেই লক্ষ্য করেছি—আরবগণ সংগ্রাম কালে বহুবার বহু ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন, কখনও কখনও পর্বত প্রমাণ বাধা-বিপত্তি তাদের পথকে একেবারেই রুদ্ধ করে দিয়েছে, কখন আরব-অস্তিত্ব একেবারেই বিলোপের মুখে। স্বয়ং মহানবী যখন রোমক অত্যাচারে একেবারেই অতিষ্ঠ হয়ে সিরিয়ার মোতা প্রান্তরে অভিযান পাঠিয়েছিলেন, সেখানে পরপর তিনজন মুসলিম সেনাপতি শহিদ হওয়ার পর হতমান মুসলিম সেনাবাহিনী তখন প্রকৃত পক্ষেই প্রমাদ গুনলেন— আরবদের অস্তিত্ব বোধহয় বিলোপের পথে।' সর্বশেষ রণকুশল মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ রোমানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েই মুসলমানদের মান-সম্মান রক্ষা করে তাঁদের সসম্মানে মদিনায় ফিরিয়ে আনলে স্বয়ং মহানবী খালিদকে আল্লাহর তরবারি 'সাইফুল্লাহ' উপাধি প্রদান করেন। মহানবীর ঐ উপাধি প্রদানের পশ্চাতে কি কোন বিরাট রহস্য বিজড়িত ছিল না! মহানবী তাঁর দিব্য চোখে দেখতে পেয়েছিলেন—যেভাবে বর্বর রোমানরা মহানবীর 'কোরআনের বার্তাবাহক ও ইসলামের শান্তি প্রচারকগণকে বারবার সিরিয়া প্রান্তে—মোতা প্রান্তে একেবারেই নৃশংসভাবেই নিধন করেছিল,

সেই ভাবেই মোতা অভিযানে বিশাল রোমান বাহিনী আরব মুসলমানদের অস্তিত্বকেই একেবারে মহাশূন্যে বিলীন করে দিত, যদি না আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য মহাবীর খালিদের হাতে অর্পিত হত। এই জন্যই মহানবী খালিদকে 'আল্লাহর তরবারি' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। একথাকে সমর্থন করে স্বয়ং পবিত্র কোরআন—সুরা আন্‌ফাল্ ৮ : ১৭, আহ্‌যাব্ ৩৩ : ৯। ইম্‌রান ৩ : ২৬, কাসাস্ ২৮ : ৬। এবং ঐ সময়ের মধ্যে পারস্যের এমন কোন ছোট-বড় রাজা-মহারাজাকে দেখলাম না, যারা বিদ্রোহ করে আরবদের সাথে যোগদান করল। সুতরাং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যা বলেছেন—তা প্রকৃতপক্ষে একেবারেই সারশূন্য। তাঁরা ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করেছেন—পবিত্র কোরআনকে বাদ দিয়েই, অর্থাৎ বৃষ্টিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন—মেঘকে বাদ দিয়েই, এবং বরফকে জানার চেষ্টা করেছেন বাষ্প ও বৃষ্টিকে বাদ দিয়েই। এরূপ গবেষণার পরিণতি পণ্ডশ্রম হতে বাধ্য।

এবার আমরা লক্ষ্য করবো রোমকরাজ। রোমকরাজ ছিলেন পারস্যরাজ অপেক্ষাও ভীষণ প্রতাপান্বিত পুরুষ। সকল ঐতিহাসিকের নিকটই এটি চিরবিদিত যে ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে রোমক সম্রাট সিজার হিরাক্লিয়াস খ্রীস্টান জগতের নতুন ত্রাতা ও সংবিধাতা এবং সংহতিদাতা রূপে বিশ্ববন্দিত হয়ে পারস্যের কবল থেকে আদি ক্রুশটিকে উদ্ধার করে, অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টি-সহ জেরুজালেমে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নিজকে সারা বিশ্বের বুকে অতুলনীয়, অভাবনীয় ও অখণ্ড প্রতাপশালী বীরের মর্যাদায় নিজকে প্রতিষ্ঠা করেন। এর ঠিক পরের বছরেই (৬৩০) বেধেছিল মোতা অভিযান। বিশ্বের অদ্বিতীয় শক্তিধর ও বিশ্বত্রাস প্রবল প্রতাপান্বিত রোমকরাজ হিরাক্লিয়াস্ কি একটি বারও চিন্তা করেছিলেন, একটি আরবও মদিনার ঘরে ফিরে যাবে, কিন্তু বিশাল রোমানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েই তাঁরা বীরের বেশে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। বিশ্বত্রাস রোমানরাজ একবারও কি চিন্তা করেছিলেন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই (৬৩৬) তাঁকে তাঁর অতি প্রিয় শস্যভাণ্ডার, প্রমোদ ভাণ্ডার, প্রকৃতির স্বর্গপুরী, নিজ হাতে গড়া রাজপুরী, রাজমহল, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি সকল কিছুকেই চোখের জলে চিরবিদায় দিতে হবে। সিরিয়ার সুরক্ষিত শত দুর্গও তাঁকে আর সিরিয়াতে রাখতে পারল না। ভীরু শশকের মতো বিতাড়িত হয়ে, দুর্বল মশকের ন্যায় তাড়িত হয়ে বিশ্বত্রাস রাজাধিরাজ হিরাক্লিয়াসকে কোন্ কারণে বলতে হল, কাহার দ্বারা বলতে হল—"হে প্রাণের সিরিয়া, হে প্রেমের ভাণ্ডার, হে প্রীতির বালাখানা, তোমাকে চিরবিদায়, চিরবিদায়, চিরবিদায়!" এই বিদায়ের ঘণ্টা কে বাজালেন, কেন বাজালেন. কোন্ প্রহরী প্রহর গুনছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁর তন্দ্রাও নেই, নিদ্রাও নেই, চির বিরাজিত, চির জাগরিত। নিশ্চয়ই তিনি 'মহাবিচারক', যাঁর বিচারে দুই বিশ্বশক্তিই দোষী স্যাবস্ত হয়েছিল তাদের আচরণে। ৫৩ : ১১, ৫৩ : ৩।

একটি মানুষের শরীরের রক্ত যখন ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে, তখন প্রথম দিকে তেমন কিছু টের পাওয়া যায় না। যখন রক্ত খারাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়. তখন শরীরের নানা স্থানে কারণে-অকারণে নানা প্রকারের চর্মরোগ দেখা দেয়, এমনকি কুষ্ঠ ব্যাধি পর্যন্তও। মানব চরিত্রের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। মানুষের চরিত্রের মানবীয় গুণগুলো যখন একের পর এক লোপ পেতে থাকে, তখন বিশেষ কিছু ধরা যায় না, কিন্তু যখনই তা চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, তখনই মানব সমাজে তা প্রকাশ্যে ধরা পড়ে। যখন আর কিছু করারও থাকে না। ধ্বংস তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে। উত্থান-পতনের/এই ধারাই ব্যক্তিজীবন হতে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, এবং রাষ্ট্রীয় জীবন হতে জাতীয় জীবনে কার্যকরী হয়ে থাকে। এখানে অহেতুক বিধাতা পুরুষকে দোষারোপ করাটা বা উত্থান-পতনের হেতুটিকে তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা একান্তভাবেই অজ্ঞতার পরিচয়। বিধাতা এখানে পরিদর্শক ও পরীক্ষক মাত্র, বিচারক মাত্র। উত্থান-পতনের শেষ পরিণতির প্রয়োগকারী বা নিমিত্ত মাত্র। জীবন-পরীক্ষাগার, যে যেমনই পরীক্ষা দিক, শেষের ঘণ্টা বাজবেই।

শেষের ঘণ্টা*

তোমার বিচারাসনে তুমিই প্রহরী
বাজাতে বিদায়ী ঘণ্টা নাহি কর দেরি।
তুমি আছ চিরকাল, চির-বিরাজিত
তন্দ্রা ও নিদ্রাহীন সদা জাগরিত।
আস্‌মান্ জমিন্ জোড়া তোমার আসন
সদাই সতর্ক থাকে তোমার নয়ন।
কেহ নাই তব পাশে তব দরবারে
কোন কিছু বলিবারে কোন অধিকারে।
তব আজ্ঞা অনুমতি নাহি যদি পায়
কে আছে এমন তিনি তব দ্বারে যায়।
সামনে পেছনে যাহা সবই তব জ্ঞানে
তোমার জ্ঞানের কণাও কেহ নাহি জানে।
এমনি প্রহরী তুমি কালের প্রহরে
ভিখারি ভিক্ষুক হতে রাজার অন্তরে—
পাপ ও পুণ্যের লীলা দেখ সব ঘেরি
সবেরে সময় দিয়ে কর কিছু দেরি।

---

*দুই বিশ্বশক্তি ইরান ও রোমের পতন

মানুষের বুদ্ধি বল দেখ বিবেচনা
তারপরে দাও তুমি আপনারে চেনা।
সীমার বাহিরে গেলে সম্মুখে ঘেরি
বাজাতে বারোটা তুমি নাহি করো দেরি।
তোমারে করিব দায়ী কেন অকারণ
নিজ হাতে গড়ি মোরা উত্থান-পতন।
এমনি প্রহরী তুমি মানব-অন্তরে
দিবা নাই রাত্রি নাই তোমার প্রহরে।
অনাচার অবিচার দেখে সব ঘেরি
বাজাতে শেষের ঘণ্টা নাহি কর দেরি।

কোরআন ২:২৫৫, ৩:২৬, ২০:১১০, ২৮:৬। ১৩:১১, ৫৩:৩, ৮৯:৫৩।

উত্থানের অন্তরালে জাতীয় চরিত্র:

দিবা-রাত্রি, জন্ম ও মৃত্যু, অভিষেক ও শোকের যেমন লক্ষ্য করি চির পাশাপাশি অবস্থান। এদের একের অন্তর্ধানে অন্যের আগমন ঘটে। ঠিক তেমনি ভাবেই মানুষের জীবনে, সমাজ জীবনে, রাজ্য ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে উত্থান ও পতনের অবস্থানও চির পাশাপাশি। একের আগমনে অন্যের অন্তর্ধান। যে-কারণে দুই বৃহৎ শক্তি ইরান ও রোম পতনের মুখোমুখি হতে বাধ্য হল, নিশ্চয় তার বিপরীত কিছু ঘটেছিল আরবের জাতীয় চরিত্রে, যার জন্যই তাঁরা উত্থানের মুখোমুখি হতে পেরেছিলেন। আরবের এই জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় জীবন-গঠনের মূলে ছিলেন স্বয়ং মহানবী (সাঃ)। এই উত্থান-পতন সম্পর্কে মহানবীর সতর্কবাণী:—

নিখিল মানবে সাবধান বাণী—
মহানবীর হুঁশিয়ার,
কোন মানুষের কিছু নাই কারো
চেষ্টা ব্যতীত তার।
তোমার ভাগ্য তোমারই হাতে
বিধাতা সাধে না বাদ,
সাধনার শ্রমে সুপ্ত আছে—
বিধাতার আশীর্বাদ। ৫৩:৩৯-৪১।

কোরআনের সতর্কবাণী:

নিঃসংকোচে নিখিলের বুকে
ঘোষণা করেছে কোরআন
জাতির ভাগ্য জাতিরই হাতে
জাতি আনে উত্থান।

১৩:১১, ৫৩:৩, ৮৯:৫৩।

ওমরের ব্যক্তিত্ব :

এবার আমরা লক্ষ্য করবো আরবের জাতীয় জীবনে এমনকি ঘটেছিল, যার জন্য বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি তাঁদের নিকট মাথা নত করতে বাধ্য হল। এককথায় তারা হারিয়েছিল মানুষের সহজাত গুণ—মনুষ্যত্ব ও মানবতা, এবং আরব অর্জন করেছিল তাদের ঐ হারানো ধনটিকে প্রথম, পরে রাজ্য। এইভাবেই হজরত ওমরের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ইসলামি সাম্রাজ্য। রাজ্য হারাবার পূর্বেই বিশাল শক্তিধর ইরান ও রোম তারা তাদের চরিত্রকেই হারিয়ে ফেলেছিল। অন্যদিকে আরবগণ রাজ্য জয় করার পূর্বেই নিজদেরকে জয় করেছিলেন। এই জয়ের পেছনে ছিল মহানবীর অফুরন্ত অবদান। ইসলামের মহান শিক্ষা। মহানবী বারবার বলেছিলেন—তোমরা একহাতে কোরআন ও অন্য হাতে হাদিস রেখে দিও। যা তোমাদের এনে দেবে দুনিয়াতে চরম উত্থান ও আখেরেতে পরম স্বর্গস্থান। এইভাবে একদিন আরব জাতীয় জীবন চরম উৎসাহে ও পরম উদ্দীপনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। এই উদ্বেলিত আরব জাতীয় স্রোতকে সুশৃঙ্খলিত করেছিল লৌহমানব খরদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ও তেজদীপ্ত মনস্বী আমিরুল-মোমেনিন হজরত ওমর ফারুকের অত্যুচ্চ সাধুতা, কঠিন ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়দৃষ্টি, বিরল ব্যক্তিত্ব ও সুমহান চরিত্রবল। সুতরাং আরবদের বিশ্ব বিজয়ের প্রথম কারণ ছিল আরবদের জাতীয় জীবনে ওমরের ন্যায় মানুষের আবির্ভাব।

আরব গোত্রসমূহের মধ্যে জাতীয় চেতনা :

আরবদের এই উত্থান দ্বিতীয় কারণ স্বরূপ দেখতে পাই, ইরান ও রোমক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রদেশে বহু আরব বহুকাল থেকেই জীবিকার সন্ধানে বসবাস করতেন। তাঁদের প্রতি শাসককুলের অবজ্ঞার ও অত্যাচারের কোন সীমা ছিল না। যদিও তারা ধর্মে খ্রীস্টান হয়েছিল। তবুও তারা ছিল চিরদিনই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এই অসহ্য অত্যাচারেও শতাব্দীর পব শতাব্দী ধরে তারা ছিল নিরুপায়, নিরুত্তর ও নির্বাক। যখনই আরব জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিল সঙ্গে সঙ্গে তারা তার সদ্ব্যবহার করতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেনি। তাদের আহ্জারী আল্লাহর আরশে গৃহীত হল, এবং তারা হল বিজয়ী। দাস আজ মালিকের আসনের উপবিষ্ট। মজলুম আজ জালেমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। আজ বিদেশে আরব পেল স্বজাতির-স্বগোত্রের সহানুভূতি, সাহায্য ও সমবেদনা, আজ আরব সেখানে আগন্তুক নন, সম্মানের অতিথি।

বিশ্ববিজয়ী ওমরের বিজয় নীতি :

এই বিশ্ব বহু বিজয়ীকে জন্ম দিয়েছে। কিন্তু হজরত ওমরের ন্যায় একটি মাত্র বিশ্ব বিজয়ীকেই জন্ম দিয়েছে। তাঁর সাথে কোন বিজয়ীর তুলনা চলে

না। মহানবীর যুদ্ধনীতিকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। আর মহানবী তাঁর যুদ্ধনীতির দ্বারা সমরক্ষেত্রকে আল্লাহ্‌র এবাদত বা উপাসনালয়ে পরিণত করেছিলেন, বিচারের মহা বিচারালয়ে পরিণত করেছিলেন, অতিথির আশ্রমে পরিণত করেছিলেন, অসহায়ের সহায় স্থানে পরিণত করেছিল, এককথায় সমরক্ষেত্রকে মানবতার মন্দির বা মসজিদে পরিণত করেছিলেন। তাই বিজিত প্রজাবর্গ ওমরকে একজন কঠোর বিজেতারূপে না দেখে কোমলপ্রাণ বন্ধুরূপে দেখেছিলেন, মানবতার কাণ্ডারী রূপে পেয়েছিলেন। এই বিজয়ীর বিজয়নীতি বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল, তিনিও বিরলবিহীন ব্যতিক্রম। [দ্র: মহানবীর যুদ্ধ নীতি: মহানবী গ্রন্থে দেখুন।]

বিশ্ববিজয়ে ওমরের বীরত্ব:

এই বিশ্বে আমরা বহু বিশ্ববিজয়ীর ইতিহাস দেখেছি। এই বিশ্ব বহু বিশ্ববীরেব পদার্পণে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। তাঁরা এক একজনে বিশ্বত্রাস সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্বত্রাসে তাঁদের বীরত্ব ষোলকলায় ফুটে উঠেছে। আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজ খান, হালাকুখান, নেবুকাডনাজার, তৈমুর, নাদির শাহ, আতাতুর্ক, কামাল পাশা প্রমুখ বীরগণ এই বিশ্বে বিশ্বত্রাস সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বা করেছিলেন। এককথায় বীরের ইতিহাসে তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বত্রাস সৃষ্টিকারী বীর।

কিন্তু সারা পৃথিবীর এই শ্রেণীর কোন বীরকেই বিশ্ব-বিজয়ী ওমরের সাথে তুলনা করা চলে না। আমরা এই সমস্ত বীরকে লক্ষ্য করছি তাঁরা একাধিকবার নরহত্যা যজ্ঞের মহাশশ্মান সৃষ্টি করে আপন আপন বীরত্বের আসনকে করেছেন অলঙ্কৃত। কিন্তু হযরত ওমর জীবনে একটি বারও এইভাবে তাঁব বীবের আসনকে কলঙ্কিত করেননি। বিজিত রাজ্যসমূহে তথা কথিত বীরের ন্যায় জনগণের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করা তো বহুদূরের কথা, অপরকে করেছেন একেবারেই আপন, পরকে করেছেন ঘর। তাই বিজিত প্রজাবৃন্দ হয়েছিল তাঁর পরম ভক্তবৃন্দ, হযরত ওমর সমগ্র জীবনে একটি বারও কোন যুদ্ধক্ষেত্রেই যাননি, যদিও তিনিই ছিলেন মহাসেনাপতি। মদিনা হতে তাঁর ইঙ্গিতেই সর্বক্ষেত্রেই যুদ্ধ পরিচালনা হতো। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধনীতি বারবার ঘোষণা করেছিলেন, বারবর সতর্ক ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—"কোথাও যেন কোন অসামরিক মানুষ তো দূরের কথা পশুপক্ষীও যেন আঘাত না পায়, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, প্রকৃতিজগৎ, জড়জগৎ, স্থাপত্যজগৎ প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ একেবারেই নিষিদ্ধ করেছিলেন।" অন্যান্য বীরদের ছিল অসংখ্য দেহরক্ষী ও দ্বাররক্ষী। কিন্তু হযরত ওমর তাঁর জীবনে দেহরক্ষী বা দ্বাররক্ষী কি জিনিস, তা জানার কোনদিনই প্রয়োজন বোধ করেননি। হযরত ওমর একদিকে ছিলেন—সমরের বীর, অন্যদিকে ছিলেন শিক্ষার বীর, মনুষ্যত্বের ও মানবতার বীর ছিলেন তিনি। সমগ্র পৃথিবীর বীরের অধ্যায়কে তিনি কলঙ্কিত না করে অলঙ্কৃত

করে গেছেন। অন্যান্য সকলেই ছিলেন বিশ্বত্রাস, কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্ব-তৃপ্তি। বিশ্ব তাঁব নিকট হতে শান্তি পেয়েছে, সান্তনা পেয়েছে, স্বস্তি পেয়েছে, তৃপ্তি পেয়েছে।

সমর নায়ক হযরত ওমরের জীবনে অন্য একটি জিনিস লক্ষ্য করি, যা আজও পর্যন্ত কোন বীরের ভাগ্যে জোটেনি। ওমর জীবনে ছিলেন বিজয়ী বীর, মরণেও বিজয়ী বীর। একথায় চরম তাৎপর্য আছে। আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীর যত বীর যত জয় করে গেছেন, সেই সমস্ত জয়ের চিহ্নমাত্র আজ আর নেই। কিন্তু আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে হযরত ওমর যে সমস্ত স্থানে ইসলামের পতাকা গেড়ে ছিলেন, সেই সমস্ত অধিকৃত এলাকা। আজও মুসলিম শাসনাধীনে, যে সমস্ত স্থানে আজও সগৌরবে ইসলামের শান্তি পতাকা চির উড্ডীয়মান। বিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ একে কি শুধু কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেবেন, ধর্মীয় পুরুষগণ একে কি শুধু অলৌকিকতা বলে ধরে নেবেন, এককথায় ওমর ছিলেন নশ্বর দেহধারী, কিন্তু তাঁর বীরত্ব ছিল অবিনশ্বর। এখানেই তিনি মানবতার বীর, মনুষত্বের মহাবীর।

ওমরের যুদ্ধ পরিচালনা :

অন্যান্য বীর বা সেনাপতির ন্যায় ওমর যুদ্ধ পরিচালনা কবতেন না। ধূলি-মাটির ঘরে-মসজিদে-নববীতে বসে তিনি যুদ্ধের যাবতীয় জিনিস পরিচালনা করতেন। সৈন্য সংগ্রহ, ছাউনি নির্মাণ, সমরঘাঁটি, অস্ত্রাগার পরিদর্শন, অস্ত্রপরীক্ষা ও অনুমোদন, কখন অবরোধ, কখন আক্রমণ, সমস্ত পরিকল্পনা, শৃঙ্খলাবিধান, যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ, সৈনিকদের তত্ত্বাবধান, যাবতীয় কাজ খলিফা নিজ দায়িত্বে নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন। এইরূপ ধরনের একজন অকৃত্রিম অনাড়ম্বব দায়িত্বশীল সেনাপতির দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসেও লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং আরবদের উত্থানে ও বিজয়ে, ইসলামি সাম্রাজ্য স্থাপনে হযরত ওমরের অবদান অপরিসীম, এককথায় অচিন্ত্যনীয়ও বটে।

এখানে আমরা একটি জিনিস অতি পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পারলাম যে, ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনের মহা উত্থান-পতনে ধর্ম-জন ও মানের কোন মূল্য নেই, বিশ্ব ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ মিলবে, বরং উত্থান-পতনের আবর্তনে-বিবর্তনে-পরিবর্তনে যে কয়েকটি জিনিসকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না, তারা হল নর-নারীর আচার বল, বিচার বল ও চরিত্র বল, বা সততা, সাধনা ও শৃঙ্খলা বল, সাম্য ও শান্তি কামনা। যে জিনিসগুলো মানুষকে, সমাজকে সদাই উত্থানের পথে নিয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত অনাচারে, অত্যাচারে, ব্যভিচারে এবং বিশৃঙ্খলতায় ও বিলাসতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে কোন জীবনই বা কোন সমাজই পতনকে যেমন রুখতে পারে না, উত্থানকে তেমনি আনতেও পারে না। সেখানে ধ্বংস হয় অনিবার্য পরিণতি। ৫৩ : ৩, ১১, ৩৯, ৪১।

ওমরের রাজ্য সংগঠন :

কথায় বলে ধন ও জ্ঞান উপার্জন করা অপেক্ষা উপার্জিত ধনের ও জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করাটাই বেশি শক্ত, সন্তান লাভ করা অপেক্ষা সন্তানকে মানুষ করাই কঠিন কাজ, বাড়িতে পুস্তক বা বই সংগ্রহ করা অপেক্ষা সংগৃহীত পুস্তকগুলোর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাটাই অধিক শক্ত কাজ। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা বিশ্ব-বিজয়ী ওমর আজ সেই অধিকতর শক্ত কাজটিতে মনোসংযোগ করলেন। এই কাজটি ছিল বহু রাজ্য জয় করার পর তাদের সুসংগঠন। এই ব্যাপারে খলিফার মূলনীতি ছিল মহানবীর পূর্ণ অনুসরণ। এবং এই কাজে মহানবীর মূলনীতি ছিল পবিত্র কোরআনের পূর্ণ অনুসরণ। এই কাজের জন্য কোরআন বলে—দেশের বা জনসাধারণের "কাজকর্মে তাদের (দেশবাসীর) সাথে পরামর্শ কর, অতঃপর যখন তুমি কোন (কাজের জন্য) সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করো।" সূরা ইমরান ৩:১৫৯, শুরা ৪২:৩৮। দশ বা দেশের কাজে এখানেই এসে গেল ইসলামে গণতন্ত্র বা ইসলামের গণতন্ত্র।

মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি : শুরা (সংসদ)

এ কথাটি সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, ইসলামি বা তথা কথিত মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর বা গোড়া পত্তন স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং মহানবী নিজ হাতেই। বীজটা তিনিই বপন বা রোপণ করেছিলেন। চারা গাছটিকে প্রথম খলিফা আবুবকর অতি সযত্নে বহু বিপদেব হাত হতে রক্ষা করে লালন করেছিলেন। এবং ওটাকে বিশাল এক মহীরুহতে পরিণত করেন দ্বিতীয় খলিফা ওমর। এখানেই তাঁর রাষ্ট্রগঠনের চরম সার্থকতা চূড়ান্ত সফলতায় রূপ লাভ করেছে। আমরা প্রথমেই বলে নিচ্ছি তখনকার দিনের ইসলামি রাষ্ট্র আজকের দিনের মত গণতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক বা স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ছিল না। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলতে হয় ওটা ছিল কোরআন অনুযায়ী 'পরামর্শতান্ত্রিক'। খলিফার চোখে এই 'পরামর্শতান্ত্রিক' শাসনব্যবস্থা কোন লোক-দেখান কিছু ছিল না। তাই খলিফা ওমর বজ্রকণ্ঠে বহুবার ঘোষণা করেছিলেন—"লা খেলাফাতুন ইল্লা আন মাশারতুন", অর্থাৎ পরামর্শ বা মন্ত্রণা ব্যতীত কোন খেলাফত নেই। এই পরামর্শসভাকে বলা হতো—'মজলিশ-ই-শুরা' অর্থাৎ পরামর্শসভা। এই পরামর্শসভা পূর্বেও ছিল। কেননা এটা কোরআনেরই ইঙ্গিত বা আদেশ। তবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর এটাকে বাহ্যিক ভাবে পূর্ণ রূপ দিলেন।

এই মজলিস-ই-শুরা গঠন হতো মহানবীর প্রবীণ ও যোগ্য সাহাবীদের নিয়ে। এখানে আনসার ও মোহাজেরীন উভয় দলের মানুষ থাকতেন। তবে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। কয়েকজন গণ্যমান্য সাহাবী সব সময়ই সভাতে থাকতেন। বাকিদের মধ্যে সকলেই সকল সভাতেই থাকতেন, এমন নয়।

এই সভা আহ্বান করার জন্য একজন 'খতিব' থাকতেন। তিনি সকলকে আহ্বান জানালে সকলেই মসজিদ-ই-নববীতে হাজির হতেন। খলিফা প্রথম দু'রাকাত নামাজ পড়ে সভার 'কার্য্য' আরম্ভ করতেন। খলিফা বলতেন—"আমি আপনাদের আহ্বান করেছি; রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আপনারা আমার গুরুদায়িত্বের ভার কিছুটা লাঘব করুন, কিন্তু আমি চাই না আপনারা আমার ইচ্ছার দাস হোন, এটা পরামর্শসভা, আপনারা আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করুন।" এইভাবে প্রয়োজনে দিনের পর দিন এক একটি আলোচনা চলতে থাকত। অবশেষ সকল কিছুর মীমাংসা হতো পরামর্শ সভাতে। তবে খলিফা পরামর্শের পরিণতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অনেক সময় বেশি সংখ্যকের, অনেক সময় কম সংখ্যকের, আবার অনেক সময় উভয় দলের মতামতকে অগ্রাহ্য করতেন। তবে তিনি অধিবেশনকে কোনদিনই আপন ইচ্ছার দাসে পরিণত করেননি। কোরআনের দৃষ্টিমতে এটা সিদ্ধান্ত সভা নয়, পরামর্শসভা, তাই দশ ও দেশের জন্য যা ছিল মঙ্গলময় ও কল্যাণকর, তিনি সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতেন।

দ্বিতীয় পরামর্শ সভা :

এই পরামর্শসভা ব্যতীতও আরো একটি ছোট পরামর্শসভা ছিল। যার কাজ ছিল দৈনন্দিন ছোটখাটো বিষয়গুলোর মীমাংসা করা। এ সভাটিও মসজিদে-নববীতেই বসত। নানা প্রদেশ ও নানা জেলা হতে যে সমস্ত প্রশাসনিক উপদেশ-আদেশ ও অভিমত চেয়ে পাঠান হতো, এই সভা তার নিষ্পত্তি করে প্রশাসনকে যথাযথ নির্দেশ দিত। এটা ছিল দৈনন্দিন প্রশাসনিক সভা। এই সভাতে অতি সাধারণ নাগরিকগণও যোগদান করে আপন আপন মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন। এই সভাতেই প্রাদেশিক ও জেলা শাসকগণ নিযুক্ত হতেন। খলিফা স্থানীয় অধিবাসীদের মতামতের ওপর খুবই জোর দিতেন। তারা তাদের মতামত পাঠিয়ে দিলে খলিফা কালবিলম্ব না করেই তাদের মতামতকে মূল্য দিতেন। খলিফা সকল প্রশাসককে এককথায় বুঝিয়ে দিতেন তাঁরা জনগণের দাস বা সেবক, জনগণ যদি কাউকে না চায়, তিনি কোন প্রশাসককেই তাঁর পদে বহাল রাখতে পারবেন না। খলিফার এই সতর্কবাণীকে অবলম্বন কবেই সকল শাসনকর্তাকেই শাসন পরিচালনা করতে হতো। সে দিনের সকল প্রশাসকেরাই সরকারি চাকুরিতে বহাল থাকার একমাত্র সম্বল ছিল—জনগণের সেবা ও শুভেচ্ছা। হযরত ওমর এরূপ একটি সার্থক সুন্দর পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নিখুঁত ইসলামিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র :

লৌহ মানব, খরদীপ্ত মানব, তেজস্বী মানব, বিরলমানব হযরত ওমর এক নিখুঁত ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই বিরল ব্যতিক্রমবিহীন রাষ্ট্র গঠন করতে তিনি কতকগুলো নীতির অনুসরণ করেছিলেন।

১। মহানবীর যুদ্ধনীতিগুলোকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।
২। খলিফা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখেননি।
৩। খলিফা হিসাবে তাঁর কোন বিশেষ ভাতা ছিল না।
৪। খলিফার যে কোন কাজ জনগণের সমালোচনার উর্দ্ধে ছিল না।
৫। তাঁর রাষ্ট্র গঠনে ও প্রশাসনে জনগণই শেষ কথা ছিল।

তিনি বহুবার ঘোষণা করেছিলেন সরকারি কোষাগারের সাথে তাঁর সম্পর্ক একটি অনাথের বা নাবালকের সম্পত্তির ওপর একজন অভিভাবকের যে সম্পর্ক। তিনি বলতেন—'আমি সচ্ছল হলে এক পয়সাও সরকারি কোষাগার হতে গ্রহণ করতাম না, আমি দরিদ্র বলে একজন দরিদ্রের সমান ভাতা নিতে পারি মাত্র, খলিফা বলে তার বেশি নয়।' এখানেই তিনি নিজেকে গরিব জনগণের সাথে এক সারিতে বেঁধে রাখতে পেরেছিলেন। একদিকে প্রচুর ধনরত্ন ও অন্যদিকে অসম্ভব দারিদ্রতাও তাঁর পদস্খলন ঘটাতে পারেনি। এমনি ছিল তাঁর প্রবল মানসিকতা।

তিনি বলতেন—"আমার ওপর জনগণের তিনটি অধিকার আছে, (১) আমি অন্যায়ভাবে কর আদায় করতে পারি না, এবং যুদ্ধলব্ধ ধনের অংশও গ্রহণ করতে পারি না, (২) এবং যুদ্ধলব্ধ ধনরাশিকে নিজের খুশিমতো স্বজন পোষণ করে ব্যয় করতেও পারি না। এর জন্য আছে 'মজলিস-ই-শুরা'। (৩) এই সাম্রাজ্যের আমি মালিক নই মালী মাত্র, প্রভু নই প্রহরী মাত্র, খলিফা মাত্র। আমি এক হাতে আল্লাহর প্রতিনিধি ও অন্য হাতে জনগণের প্রতিনিধি। আল্লাহ আমার অন্তরের পরীক্ষক, জনগণ আমাব আচারের পরীক্ষক। আল্লাহ্ আমার বিচার দিনের মালিক, জনগণ আমার খেলাফতের মালিক। আল্লাহ্ আমার অভিভাবক, আমি জনগণের অভিভাবক। আমাব আশ্রয়স্থল আল্লাহ্, জনগণের আশ্রয়স্থল আমি। জনগণের সাথে এই আমাব সম্পর্ক, এই আমার খেলাফত। এইভাবে এই নীতিতে মহাত্যাগ ও মহাতিতিক্ষার কষ্টি পাথরে দিবা রাত্রি দগ্ধ হয়ে, মানবতার মহা-পিলসূজকে মাথায় নিয়ে, মনুষ্যত্বের অতীব দুর্গম পথে পাড়ি দিয়ে, দুর্লঙ্ঘনীয় বাধাকে লঙ্ঘন করে, দুর্বার আকাঙ্খাকে অর্জন করে, দুর্লভ মানব জীবনকে ধন্য করে, খেলাফতের গৌরবজনক গুরুদায়িত্বকে মাথায় নিয়ে সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী বেগবান ধারার ন্যায় অমর জীবনের পথে প্রবাহিত হয়ে বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সকল কিছুর সম্মানজনক সমাধান করত জগতের বুকে এক অতি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

এই ইসলামি সাম্রাজ্য কায়েম ছিল ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলী পর্যন্ত (৬৬১ খ্রীঃ)। অতঃপর এসে গেল রাজতন্ত্র। নকল ইসলাম না এলেও

আসল ইসলামও রইল না। ফলে ইসলাম হারাল তার মৌলিকত্ব, মুসলিম হারাল তার গুরুত্ব, দেশ হারাল তাঁর সাম্যবাদ, সমাজ হারাল তার আদর্শবাদ, কাল হারল তার স্বর্ণযুগ।

কি দিয়ে জীবন গড়ে কেমন ক'রে
সাধন সংযম রোদে শুকিয়ে ম'রে,
কে করে কেমন করে জীবন গঠন
জীবনেরই ভাঙ্গা-গড়া উত্থানপতন।

হযরত ওমরের (রাঃ) প্রশাসন ব্যবস্থা:

(Civil administration under Omar)

বহু দেশী ও বিদেশী লেখক দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর প্রশাসন ব্যবস্থার প্রথম সারিতে হযরত ওমরের স্থান নির্ণীত হয়েছে। স্বয়ং মহানবীর সময় ইসলাম সবেমাত্র দানা বেঁধেছে। সমগ্র দেশের একমুখী দুর্বার গতিকে তিনি অন্যদিকে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন। যা কোন মানুষই চিন্তা করতে পারে না, তা-ই মহানবী করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই গতিকে রোধ করার প্রবল চেষ্টা দেখা দিল। ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর সেই চেষ্টাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়ে ইসলামের গতিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। হযরত ওমর সেই প্রাণবন্ত চারা গাছটিকে ফলে পুষ্পে পল্লবে বিকশিত করে তোলেন।

মহানবী মদিনায় প্রজাতন্ত্রের বা গণতন্ত্রের জন্ম নিয়ে গিয়েছিলেন, হযরত আবুবকর তাকে রক্ষা করলেন ও কিছু সম্প্রসারিত করলেন। হযরত ওমরের সময় তা বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হল। এখানে ছিল বহু জাতি, বহু ধর্ম। এই বহু জাতি ও বহু ধর্মকে নিয়ে কিভাবে একটি সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, এটাই ছিল হযরত ওমরের চিন্তা-ভাবনা। তিনি এমন দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সাথে এই শাসন ব্যবস্থাকে বিন্যাস করলেন, তা একদিকে ইসলামকে মহিমান্বিত করে তুলল, মুসলমানকে সুসংহত করল, অমুসলমানদের যাবতীয় নিরাপত্তার পূর্ণ ব্যবস্থা থাকল। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে উঠল। খলিফা ওমর (রাঃ) জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই সমর্থন পেলেন, এই সমর্থন পাওয়ার মূলে সকলের জন্য খলিফার ছিল কল্যাণ চিন্তা, আবার এই সমর্থনই খলিফাকে দান করল চরম সফলতা। বস্তুত নানা জাতির ও নানা ভাষার মানুষের সমন্বয়ে ওমরের সাম্রাজ্য একটি একান্নবর্তী পরিবারের ন্যায় ছিল।

আল্লাহ্-তন্ত্র (Theocracy):

হযরত ওমর (রাঃ) প্রশাসনকে একেবারে ঢেলে সাজালেন। তাঁর একদিকে

ছিল কোরআনের নির্দেশ ও অন্যদিকে ছিল মহানবীর (সাঃ) আদেশ। কেননা বিশ্বজগতের প্রতিপালক পরম করুণাময় আল্লাহ্ ইসলামি রাষ্ট্রের একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। আল্লা দেওয়া বা রচিত আইন-কানুন বা বিধান যে শাসনব্যবস্থায় বলবৎ বা কার্যকরী থাকে, তাকেই বলা হয় Teocracy এবং যে শাসনব্যবস্থায় মানুষ রচিত বিধানে মানুষ পরিচালিত হয়, তাকে বলা হয় Democracy। সেখানে (আল্লাহ্-তন্ত্রে) যিনি খলিফা থাকেন, তিনি হন এক আল্লাহ্র প্রতিনিধি মাত্র। তাঁর রচিত বিধানে তিনি প্রশাসন চালিয়ে যান। সেখানে একনায়কত্বের পরিবর্তে থাকবে গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচিত হবেন। খলিফার থাকবে—পরামর্শসভা বা council, যাকে বর্তমানে বলা হয়— Parliament House । খলিফা এই সভার পরামর্শ মতো কাজ করতে থাকেন, যেখানে জনগণেরও খলিফার কাজের সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর এই নীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা চালিয়ে যান। মৌলানা মহম্মদ আলী সে যুগের একজন প্রখ্যাত আইনবিশারদ হিসাবে বলেন—"হযরত ওমরের সময় গণতন্ত্রের আদর্শ যতদূর বহন করা হয়েছিল, সে আদর্শ অর্জন করতে বিশ্বের আরো বহু দিন লাগবে।"

উপদেষ্টা পরিষদ: (মজলিস-উস্-শুরা):

ইসলামের খেলাফতের সর্বমোট সময়কাল প্রায় ত্রিশ বছর। এই ত্রিশ বছর যে নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, তার উদ্ভাবক ছিলেন হযরত ওমর। তাই আমীর আলী বলেন—"ত্রিশ বছরের খেলাফতে হজরত ওমরের জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পরে যে নীতি অনুসৃত হয়, তা তাঁরই অবদান।" হযরত ওমরের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বস্তু ছিল মজলিস-উস্-শশুরা অর্থাৎ উপদেষ্টা পরিষদ বা Consultative Body । এই মজলিস-উস-শুরা (Majlis-us-Shura)-কে তিনি দুভাগে ভাগ করেন। একটি খাস্, ও অন্যটি আম। যাদের বলা হতো—মজলিস-উস-খাস ও মজলিস-উস-আম। এই মজলিস-উস-খাসে ছিলেন বিশিষ্ট মোহাজিরিনগণ ও মক্কাবাসী, মহানবীর ঘনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীরা, যেমন—হযরত ওসমান, হজরত আলী, তালহা, যুবাইর প্রভৃতি। এই উচ্চসভার কাজ ছিল দৈনন্দিন কার্যকলাপে খলিফাকে পরামর্শ দেওয়া। মজলিস-উস-আম বা সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছিল মহানবীর মক্কার সাহাবীগণ ও মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে। একটিকে বলা যেতে পারে Cabinet, অন্যটিকে Parliament বা Assembly House. হযরত ওমর বলেন—"পরামর্শ ব্যতীত কোন খেলাফত হতে পারে না।" তিনি তাঁর সমগ্র খেলাফতে কোরআন ও শুরার নির্দেশ ব্যতীত ও সুরার পরামর্শ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। তিনি সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী

ছিলেন। তাই তাঁর যাবতীয় প্রশাসন নিখুঁত গণতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এই সভা বসত মসজিদে নববীতে অর্থাৎ মদিনাতে নবীর মসজিদে। এবং সেখানে যাবতীয় বিষয়ে আলোচনার পর বিবর্তনশীল চাহিদানুযায়ী গণতন্ত্রের মৌলিকত্ব যে বিকাশ লাভ করেছিল, এ কথায় সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"

আরব জাতীয়তাবাদ :

হযরত ওমরের প্রশাসনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—আরব জাতীয়তাবাদকে সকল মালিন্য ও সংস্পর্শ হতে পৃথক রাখা। একটি জাতিকে নিখুঁত ও নতুনভাবে গড়ে তুলতে বা তাদেরকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে এটা ছিল তার চরম দূরদর্শিতার পরিচয়। আজকের দুনিয়া শুধু সামরিক বাহিনীকেই সকল কিছু হতে দূরে রাখে। কিন্তু হযরত ওমর আজ হতে ১৪০০ বছর পূর্বেই সমগ্র একটি দেশকেই পৃথক রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এক অসাধারণ প্রশাসকের পরিচয় রেখে গেছেন। হযরত ওমর সমগ্র আরব উপদ্বীপকে সম্পূর্ণরূপে মুসলিম-অধ্যুষিত বাসভূমিতে পরিণত করার জন্য শত্রুভাবাপন্ন ইহুদি ও খ্রীস্টানদের আরব দেশের বাইরে বসবাসের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের জন্য খাইবারের ইহুদি ও নাজরানের খ্রীস্টানদের তিনি ক্ষতিপূরণ দান করেন। দ্বিতীয় নির্দেশ দিলেন আরবের বাইরে যে আরব সেনাগণ আছেন, তাঁরা কোথাও জমিজমা ভূ-সম্পত্তি কিছুই ক্রয় করতে পারবেন না। এবং আরো নির্দেশ দিলেন তারা সেনা-নিবাসের বাইরেও বসবাস করতে পারবেন না। যাতে তাঁদের জাতিগত বিশুদ্ধতা, সামরিক কলাকৌশল, বীরত্ব ইত্যাদি অক্ষুণ্ন থাকে। এইভাবে খলিফা আরব মুসলিমদের জগতের একটি শ্রেষ্ঠতম সমর-বাহিনীতে পরিণত করেন, এবং আরব দেশকে একটি মহাশক্তিশালী দেশে পরিণত করেন।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা :

বিভাগ : হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর সময়ে প্রদেশে ও প্রধান প্রধান শহরে আমির নামে শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রাঃ)-ও এই প্রথা অপরিবর্তিত রাখেন। কিন্তু তাঁর সময়ে রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের শাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি ভাগকে এক একটি প্রদেশ নামে অভিহিত করা হতো। সেদিনের প্রদেশগুলোর নাম : মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, আলজিরিয়া, বসরা, কুফা, মিশর, প্যালেস্টাইন, কারস, কিরমান, খোরাশান, মাকরান, সেজিস্তান ও আজারবাইজান প্রভৃতি। এই বিভাগেই হযরত ওমর ক্ষান্ত হননি। প্রত্যেকটি প্রদেশকে আবার কয়েকটি জেলায়

বিভক্ত করেন। এই বিভাগের মূলে ছিল শাসন-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা। এই বিভাগ হযরত ওমরের শাসনব্যবস্থার দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

শাসনকর্তা :

প্রদেশের শাসনকর্তাকে খলিফা তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের সাথে পরামর্শ করে নিযুক্ত করতেন, এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা খলিফার অনুমোদন-সহ জেলার শাসনকর্তাকে নিয়োগ করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে অলি বা আমিল বলা হতো। বিভাগীয় শাসনকর্তা খলিফার নিকট সরাসরি দায়ী থাকতেন। প্রতি বছর পবিত্র হজ পালনের সময় তাঁদেরকে আপন আপন কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ ও হিসাব প্রদান করতে হতো। এই সময় শাসনকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে খলিফা নিয়োগপত্রের সাথে লিখিত নির্দেশাবলী দান করতেন। এবং জনগণকেও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত করা হতো। প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর তিনটি কাজের ভার থাকতো। (১) শাসন বিভাগ পরিচালনা করা, (২) সৈন্য বিভাগ তদারক করা ও (৩) ধর্মীয় অনুষ্ঠান অর্থাৎ শুক্রবারের নামাজ পরিচালনা করা। অর্থাৎ তাঁর ওপর ছিল মহা গুরু দায়িত্ব। দুটি কাজকে খলিফা প্রাদেশিক শাসনকর্তার ওপর রাখতেন না—(১) বিচার বিভাগ ও (২) আয়কর বিভাগ।

দুর্নীতিমুক্ত শাসন-ব্যবস্থা :

বিচার বিভাগ ও আয়কর বিভাগকে পৃথক রাখার মূলে ছিল শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা। সরকারি উচ্চপদে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার পূর্বে তাঁকে তাঁর সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ দাখিল করতে হতো। এবং প্রতি বছর খলিফার নিকট এই হিসাব প্রদান করতে হতো। এই নীতিরই ফলশ্রুতি হিসাবে মহাবীর খালেদের পদচ্যুতি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা আবু হোরায়রা ও অমর-বিন-আল-আসের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে সফল করার জন্য খলিফা গুপ্তচর প্রথার প্রবর্তন করেন।

সচিবালয় :

প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে সাহায্য করার জন্যে কয়েকটি বিভাগ ছিল। বর্তমানে যাকে আমরা সচিবালয় বলে থাকি। এই বিভাগ ছিল অনেকটা সেই ধরনের। যেমন কাতিব (প্রধান উপদেষ্টা), কাতিব-উদ-দিওয়ান (প্রধান সামরিক উপদেষ্টা), সাহিব-উল-আহদাত (পুলিশ উপদেষ্টা), সাহিব-উল-বাইতুলমাল (কোষাধ্যক্ষ) এবং পৃথকভাবে থাকতেন কাজি (বিচারক), সাহিব-উল-খারাজ (রাজস্ব-উপদেষ্টা) প্রভৃতি আরো অনেক বিভাগ।

বেতন ব্যবস্থা :

প্রতিটি কর্মচারীর যোগ্যতানুসারে তাদের বেতন দেওয়া হতো। যাতে কেউ কোনরূপ ঘুষ বা অন্যায় পথ অবলম্বন না করে। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে

পাঁচ হাজার দিরহাম পর্যন্ত ভাতা দেওয়া হতো, অধিকন্তু গণিমতেরও (যুদ্ধলব্ধ ধন) অংশ পেতেন।

জেলা প্রশাসন :

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে জেলা প্রশাসন পরিচালিত হতো। কেন্দ্র হতে অঞ্চল, শহর হতে পল্লী পর্যন্ত নানা কাজে খলিফাকে তিনজন ব্যক্তি বিশেষভাবে সাহায্য করতেন, যেমন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব আব্দুল্লাহ্ ইবন আকরাম অভিযোগ তদন্তকারী মহম্মদ বিন মাসলামা, প্রদেশের সঠিক সংবাদ আহরণ করে খলিফার নিকট পেশ করতেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় হযরত ওমর ছিলেন ইসলামি জগতের প্রশাসনিক ইতিহাসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নীতিসমূহ আজও আদর্শ প্রশাসনিক গঠন-কাঠামোর মর্যাদা পায়।

হযরত ওমরের রাজস্ব ব্যবস্থা (Revenue System under Omar-I)

ইরান-ইরাক :

তখনকার দিনে সম্রাট নওশেরওয়ার যুগ পর্যন্ত উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। যা তিন কিস্তিতে পরিশোধ করতে হতো। পরবর্তীকালে সম্রাট খসরু ও পারভেজ এর পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। সম্রাট ইয়েজাদ্গির্দের সময় রাজস্ব পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়। খলিফা সর্বপ্রথম দু জন প্রবীণ সাহাবী ওসমান বিন হানিফ ও হুদায়ফা-বিন-আল-ঈমানকে জমিন জরিপের নির্দেশ দেন। নিজ হাতে মাপকাঠিও তৈরি করে দেন। তখন সারা ইরাকের আয়তন ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার বর্গমাইল। ওর থেকে মরুভূমি মরূদ্যান-নদীনালা, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি বাদ দিয়ে তিন কোটি আট লক্ষ 'জরীপ' কৃষিযোগ্য জমি পাওয়া গেল।

খলিফার ঘোষণা মতো রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হল—রাজবংশের সম্পত্তি, মন্দিরের সম্পত্তি, মালিকবিহীন সম্পত্তি, পলাতক ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের সম্পত্তি। এই সমস্ত সম্পত্তির আয় থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বহন করা হতো। কেউ কোন ভাল কাজ করলে তাকে এখান হতে পুরস্কার দেওয়াও হতো। তবে নিষ্কর হিসাবে কাউকে কোন জমি দেওয়া হতো না। খলিফার এই জরিপ সম্পর্কে 'কিতাবুল খারাজ' নামক গ্রন্থে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী কাজী আবু ইউসুফ বলেন—"এই জরিপের কাজ বস্ত্রখণ্ড মাপার মতো নির্ভুল ছিল।

মিশর, সিরিয়া, ফারস্, কিরমান ও আর্মেনিয়া :

মিশরে ফেরাউন আমলেও কিছুটা জরিপের কাজ হয়েছিল। চার বছরের

ফসলের গড় ধরে রাজস্ব নির্ধারিত হতো। এছাড়াও অতিরিক্ত খাদ্যশস্যও আদায় করা হতো। রোমানগণ এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। খলিফা ওমর ভূমিকর প্রথা মেনে নিলেও অতিরিক্ত শস্য আদায় প্রথাটিকে রহিত করেন। পরবর্তীকালে খলিফা কর নীতিরও আমূল পরিবর্তন করে কৃষককুলকে বহুদিনের অত্যাচার হতে মুক্ত করেন। তাঁর নতুন নীতির ফলে ভূমি-কর ছিল মাত্র এক দিনার প্রতি জরিপে। এই পরিবর্তিত নীতিতেও তখনকার দিনে কেবল মিশর হতেই এক কোটি কুড়ি লক্ষ দিনার (বর্তমান বাজারে পাঁচ কোটি ছয় লক্ষ টাকা) আয়কর আদায় হতো। তখনকার দিনে সিরিয়া হতে আসত এক কোটি চল্লিশ লক্ষ দিনার। এছাড়াও অন্যান্য কিছু কিছু কর আদায় হতো, যেমন কুটীরশিল্প ও কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতি হতে।

রাজস্বের পরিমাণ :

ইসলামি রাজ্যসীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য খলিফা রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। বিজিত দেশ সমূহে নিবর্তনমূলক কৃষিব্যবস্থার বিলোপ সাধন ছিল খলিফার রাজস্ব ব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ও ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের সময় কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট কর-প্রথা ছিল না। কারণ তখনও ইসলামি রাষ্ট্র ঠিকমতো দানা বেঁধে ওঠেনি। হযরত ওমরের সময় ইসলামি রাষ্ট্র বিশাল রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। এই কারণেই হযরত ওমরকে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। নবীবরের ও আবুবকরের সময় উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ বা ঐ পরিমাণে উশর দিতে হতো। হযরত ওমর প্রথম রাজস্ব আদায়ের জন্য একটি পৃথক বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম দিওয়ান-উল-খারজ বা রাজস্ব বিভাগ। বিজিত দেশসমূহে সৈন্যদের মধ্যে জায়গীরদার প্রথার বিলোপ সাধন করেন। কেননা এতে সৈন্য বিভাগের সততা নষ্ট হয়ে সামরিক বাহিনীর দুর্বল হওয়ার সম্ভবনা ছিল। হযবত ওমর (রাঃ) প্রথম আদম সুমারীর (লোকগণনা) প্রবর্তন করেন ইরাকে। এর পূর্বে বিজিত দেশসমূহে সৈনিকগণ সেখানকার জমি-জায়গার মালিক রূপে পরিগণিত হতেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) এই প্রথার বিলোপ সাধন করেন। জমির মালিকদের তিনি জমিহীন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিচক্ষণ খলিফা লোকগণনার কাজ শেষ করার পরই ইরাকে জমি জরিপের কাজ আরম্ভ করেন। এই জরিপের কাজ সমাধা করার পর যখন তাঁর চোখে মানুষের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ আয়নার মতো ভেসে উঠল, তখন তাদের বিলি-বন্দোবস্ত ও কর নির্ধারিত হতো। তখনকার দিনে ইরাকে বণ্টনযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৩,৬০,০০,০০০ জরীপ। প্রতি জরীপে বাৎসরিক কর ছিল গমে ২ দিরহাম, ইক্ষু ৬. তলা ৫. আঙ্গুর ১০, খেজুর ১০, তিল বা ঐ জাতীয় ৮ দিরহাম।

এইভাবে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ার পর প্রতি বছর রাজস্ব আদায় হতো ৮ কোটি ৬০ লক্ষ দিরহাম। সিরিয়া ও মিশরে একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সিরিয়ায় রাজস্ব আদায় হতো ১ কোটি ৪০ লক্ষ দিনার। কোথাও কোথাও বিশেষ ক্ষেত্রে লা-খেরাজ বা করহীন ভাবে কিছু কিছু জমি দেওয়া হতো। আমাদের দেশে এ ধরনের বন্দোবস্ত লাখ্‌রাজ নামে পরিচিত। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কোথাও যাতে কোন রকমের জুলুম বা অত্যাচার না হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হতো। এই কর অমুসলমান কৃষকদের নিকট হতে আদায় করা হতো।

রাজস্বের উৎস :

রাজস্বের উৎস ছিল নানাবিধ: (১) খারাজ বা অমুসলমানদের ভূমিকর, (২) উশর, মুসলমানদের ভূমি বা বাণিজ্যিক কর, (৩) জিজিয়া, অমুসলমানদের ওপর সামরিক কর, (৪) জাকাত, মুসলমানদের ওপর গরিব-কর, (৫) গানিমাহ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, (৬) আল-ফে, রাষ্ট্রীয় ভূমির আয়। মহানবী (দঃ) নিজেই ইসলামের রাজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে জমিতে উৎপাদিত শস্য, সোনা-রূপা, উট, মেষ ও ছাগলের ওপর কর নির্ধারিত হয়েছিল। হযরত ওমরের সময় ঘোড়ার ওপর জাকাত দিতে হতো, কেননা, এই সময়ে ঘোড়ার ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ছিল। জিজিয়া কর আদায় করা হতো অমুসলমানদের নিকট হতে সামরিক দায়দায়িত্বের পরিবর্তে। তাঁদের জান-মাল সমস্ত কিছু রক্ষা করার দাযিত্ব ছিল মুসলমানদের ওপর। যখন এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতো না তখন তাদের জিজিযা হতে মুক্তি দেওয়া হতো। কিন্তু কোন মুসলমান সামরিক দায়িত্ব পরিহার করার জন্য কর দিতে চাইলেও তা গ্রহণীয় হতো না। সামরিক দাযিত্ব মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। মাথাপিছু জিজিযার বার্ষিক পরিমাণ ছিল ৪ দিনার, ধর্মযাজকদের জন্য ২ দিনার, মধ্যবিত্ত ও গরিবদের জন্য ১ দিনার। যুদ্ধলব্ধ ধনকে গানিমাহ বলা হতো। এর চার-পঞ্চমাংশ সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ হতো এবং এক-পঞ্চমাংশ মহানবীর বংশধর ও বাজকোষের জন্য নির্ধারিত থাকত। হযরত ওমরের সময় যখন ইসলামি রাজ্য বিশাল রাজ্যে পরিণত হয়, তখন গানিমাহ রাজকোষের এক বিরাট আয়ে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের নিজস্ব যে সমস্ত জমি-জায়গা থাকত, এবং সেগুলোর আয় হতে যা কিছু রাজকোষে জমা হতো তাকে 'ফে' বলা হতো। খলিফা ওমর উশর প্রথার আমূল পরিবর্তন করেন। মুসলমান ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্যের ওপর শতকরা আড়াই, অমুসলমান বণিকদের ওপর শতকরা পাঁচ এবং বিদেশী বণিকদের ওপর শতকরা দশ হারে বাণিজ্য কর ধার্য করা হয়। জলসেচের ব্যবস্থা ব্যতীত বৃহৎ ভূ-সম্পত্তির ওপরও কর আদায় করা হতো।

মহানবীর সময় অভাবই বেশি ছিল, তাই সরকারি কোষাগার স্থাপনের কোন প্রশ্নই ছিল না। যা কিছু সামান্য আয় হতো, তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় হয়ে যেত। কিন্তু হযরত ওমরের সময় যখন ইসলামি রাজ্য বিশাল রূপ পরিগ্রহ করে, তখন খলিফা ওয়ালিদ বিন-হিশামের পরামর্শে একটি বায়তুল মাল সরকারি কোষাগার স্থাপন করেন। এই কোষাগারের প্রথম কোষাধ্যক্ষ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরকাম। এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকত। পরবর্তীকালে প্রতিটি প্রদেশেও বায়তুলমাল স্থাপন করা হয়। এটি ছিল সম্পূর্ণ জনসাধারণের সম্পত্তি, এতে খলিফার কোনরূপ ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না। প্রথম উমাইয়া খলিফা আমীর মুয়াবিয়ার হাতে ইসলামের এই পবিত্র জাতীয় প্রথা প্রথম রহিত হয়।

জাতীয় অর্থ বণ্টন :

বায়তুলমালের টাকা ঠিকমতো যাতে জনসাধারণের নিকট পৌঁছয় তার জন্য হযরত ওমর দিওয়ানুল-খারাজ বা রাজস্ব বিভাগের ওপর ভার দেন। বায়তুলমাল হতে প্রথম ব্যয় হতো প্রশাসনিক খরচ, অতঃপর যুদ্ধাভিযান, এরপর যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকত তাকে সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য খলিফা পৃথিবীব বুকে প্রথম আদম সুমারীর (লোকগণনা) ব্যবস্থা করেন। এই আদম সুমারীতে অসহায়, দুর্বল, অনাথ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, অন্ধ, খোঁড়া, বিধবা প্রভৃতি সকলের জন্য একটি বৃত্তি তালিকা প্রস্তুত করেন। এবং এই তালিকা অনুযায়ী সকলকেই সরকারি সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, "পৃথিবীব লিপিবদ্ধ আদম সুমারীর প্রথম স্রষ্টা হযরত ওমর"। অধ্যাপক মূইর বলেন, "ওমরের প্রবর্তিত ভাতা ভোগকারীদের তালিকা পৃথিবীর বুকে তুলনাবিহীন ছিল"। ভাতা ভোগকারীদের তিনটি ভাগ ছিল।

এই তিনটি শ্রেনীবিন্যাস—মহানবীর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগণ্যতা, মহাদুর্দিনে মহানবীর সঙ্গে সম্পর্ককারীগণ ও মহানবীর সাথে জেহাদে অংশগ্রহণকারীগণ। এই তালিকার সর্বাগ্রে ছিল মহানবীর বিধবা পত্নীগণ, যাঁদেরকে উম্মাহাতুল মুমেনিন বা বিশ্বাসীদের মাতা বলা হতো। তাঁদের বাৎসবিক ভাতা ১০-১২ হাজার দিরহাম ধার্য ছিল। এরপর আনসার ও মোহাজিরদেব নাম লিপিবদ্ধ ছিল, যাঁদের বাৎসরিক ভাতা ছিল ৪ হাজার দিরহাম, এবং তাঁদেব সন্তান ও বংশধরদের দুহাজার দিরহাম দেওয়া হতো। নিম্নলিখিত হারে সকলকে বাৎসরিক ভাতা দেওয়া হতো :

	হাজার	দিরহাম
(১) মহানবীর বিধবা পত্নীগণ	১০-১২	,,
(২) আনসার ও মোহাজিরগণ	৪ ,,	,,

		হাজার	দিরহাম
(৩)	আনসার ও মোহাজিরগণের সন্তান ও বংশধরগণ	২ ,,	,,
(৪)	বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ	৫ ,,	,,
(৫)	হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ	৪ ,,	,,
(৬)	রিদ্দার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ	৩ ,,	,,
(৭)	সিরিয়া ও ইরাকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ	২ ,,	,,
(৮)	কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে	১ ,,	,,
(৯)	একজন সাধারণ সৈনিকের জন্য	৫-৬ শত	,,
(১০)	প্রত্যেক নবজাত শিশু	১ শত	,,
(১১)	মক্কার অধিবাসী ও অন্যান্যদের	৮ শত	,,

এছাড়া সকল অসহায় গরিব-দুর্বল-বিধবা-অনাথ-অন্ধ সকলেই সরকারি ভাতা পেতেন। এই বিলি ব্যবস্থা সুন্দর ছিল। এবং এর গৌরব আমীরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর প্রাপ্য। এই সম্পর্কে উইলিয়াম মূইর বলেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে একটি জাতিব পক্ষে সম্পূর্ণ রাজস্ব গনিমত ও রাষ্ট্রের জয়লব্ধ সম্পদ সম-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে বণ্টন করার দৃষ্টান্ত নজিরবিহীন।" হযরত ওমর রাজস্ব ব্যবস্থায় সেই নজিরবিহীন বাজনীতিবিদ্ বিরল ব্যক্তিত্ব।

হযরত ওমরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা
(Land Revenue System under Omar-I)

প্রাচীন ব্যবস্থা :

রোমকগণ মিশর, সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল জয় করে সেথাকার সমস্ত আবাদী জমি বাজেয়াপ্ত করেছিল। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির এক অংশ সেনাবাহিনী ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে, এক অংশ সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে, ও এ অংশ চার্চের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। যার ফলে জমির প্রকৃত মালিক বা চাষীরা তাদের আপন আপন আবাদী জমি হতে বঞ্চিত হয়ে নতুন মালিকদের অধীনে ভূমি-দাসে পরিণত হয়।

মহানবীর জামানা :

মহানবীর সময়ে বা তাঁর পূর্বে আরবে ভূমি-রাজস্ব বলে কিছুই ছিল না। খাইবার যুদ্ধে ইহুদিদের পরাজয়ের পর তারা মহানবীর নিকট প্রার্থনা জানাল—তারা কৃষিকাজে খুবই পটু, সুতরাং তাদের জমি তাদেরই নিকট রেখে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক কর নির্ধারণ করা হোক। মহানবী তাদের আবেদন চরম সহানুভূতির সাথেই বিবেচনা করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল

থেকে জাকাতের অনুরূপ একটা ভূমি-কর আদায় করা হতো। ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকরের সময় বিভিন্ন অঞ্চল হতে এককালীন একটা ভূমি-কর স্থির হতো। তখনও ইসলামি সাম্রাজ্য বলতে তেমনি কিছু গড়ে ওঠেনি। সবেমাত্র সূচনা।

হযরত ওমরের আমলে কৃষিজমি :

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা বিশাল বিস্তৃতি লাভ করে। খলিফা এবার ভূমি-রাজস্ব ব্যাপারে প্রথম মনোনিবেশ করলেন। সমস্যাও বড় আকারে দেখা দিল। মহানবীর সময় অধিকৃত ভূমি সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। ঐ নীতি অনুযায়ী সকল সেনাপতি দাবি করেন অধিকৃত ভূমি সেনাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হোক। বহু গণ্যমান্য প্রবীন সাহাবীগণও ঐ দাবি সমর্থন করেন। এমনকি হযরত বেলাল খলিফাকে এই ব্যাপারে এত চাপ দিতে থাকেন যে, খলিফা ওমর অত্যন্ত খেদভরে বলে ওঠেন—"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে বেলালের হাত থেকে রক্ষা কর।" ওমর কতকগুলো মূলনীতিকে সম্মুখে রেখে ঐ প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর অভিমত ছিল—কৃষকদের জমি কৃষকরাই মালিক রূপে আবাদ করুক। তাঁর যুক্তি ছিল—

(১) খলিফা বলেন—"মহানবী গরিব মানুষ, অসহায় মানুষ, দরিদ্র মানুষ। অবহেলিত ও অত্যাচারিত মানুষের মুক্তিকল্পে ও সাহায্যার্থে তখনকার সীমিত গোত্রের ও সীমিত স্থানের ক্ষেত্রে যে নীতি আরোপ করেছিলেন, আজকের দিনে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশাল ক্ষেত্রে মহানবীর ঐ পূর্বতন নীতির প্রয়োগ করলে তাঁরই মৌল ও মূলনীতিরই বিরোধিতা করে অসংখ্য গরিবের উপকারের পরিবর্তে চরম অপকার করে মহানবীর মূল উদ্দেশ্যের ও ন্যায়নীতির মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। মহানবী বলে গেছেন—"নিশ্চয় প্রতিটি কাজ তার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করবে।"

(২) আরবসেনারা জমির মালিক হলে তারা আর জগদ্বিখ্যাত সেনা থাকবে না, তখন মামুলী কৃষকে পরিণত হবে। এটা মোটেই কাম্য নয়।

(৩) রোমানদের ন্যায় আরবসেনাদের জমির মালিক করে প্রকৃত কৃষককুলকে ভূমি-দাসে পরিণত করলে দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার চরমভাবে বিঘ্নিত হবে ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে দেশ ও সমাজ একেবারেই ভেঙে পড়বে। ঐ কাজ অসমীচীন। ইসলামের গরিবদরদী ন্যায়নীতির ঘোরতর পরিপন্থী।

(৪) যদি সমস্ত আবাদী জমি সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যয়ভার কে বহন করবে? সুতরাং আজ অধিকৃত ভূখণ্ড সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করাও বিধি বিরুদ্ধ কাজ। এবং বাস্তব-বিরোধী নীতি।

(৫) খলিফা সুরা হাশরের (৫৯:৮-১০) মর্মবাণী থেকেও বুঝিয়ে দিলেন—যে সমস্ত বিজয় হচ্ছে, ওগুলো কোন মানুষের একাকী বিজয় নয়, ওগুলো সারা রাজ্যের বিজয়। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয় এবং ইসলামি সাম্রাজ্য কেবলমাত্র বর্তমান প্রজন্মের জন্যই নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্যও। সুতরাং অধিকৃত স্থায়ী সম্পদ হবে সাম্রাজ্যের স্থায়ী সম্পদ, কারো ব্যক্তিগত হবে না। এই ভাবে খলিফা পবিত্র কোরআন ও হাদিস হতে এই জিনিসটাকে প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝিয়ে দিলে মজলিস-ই-শুরার সকল সদস্যই বিনা বাক্যে বিনা প্রতিবাদে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন:

"অধিকৃত বা বিজিত অঞ্চলসমূহ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে গৃহীত হবে, তাতে সেনাবাহিনীর কোন অধিকার থাকবে না। ভূমির মূল (জমির) কৃষকদের-(মালিকদের) উচ্ছেদ করা হবে না।"

খলিফার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও কৃষি নীতি: লাঙ্গল যার জমি তার।

অতঃপর খলিফা সাদ-বিন-ওক্কাসকে নির্দেশ দিলেন অধিকৃত দেশসমূহের জমির পরিমাণ নির্ধারণ করতে, এবং আদমসুমারী গ্রহণ করতে। পরে আদম-সুমারীতে দেখা গেল প্রতিটি সৈনিকের অংশে তিনজন কৃষক পড়ে। কিন্তু খলিফা শুরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির করলেন—কোন কৃষককেই তার জমি হতে বেদখল করা হবে না। তাদের জমি তাদের দখলেই থাকবে। এককথায় লাঙ্গল যার জমি তার।

অতঃপর খলিফা জমি সম্পর্কে আরো কয়েকটি কঠিন, কড়া ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন দেশের উৎপাদন শক্তিকে ও উৎপাদনকে বৃদ্ধি করার জন্য। আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে একটি মানুষ যে জমি-জায়গা সম্পর্কে এরূপ একটি সুন্দর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তা ধারণাতীত আজকেব মানুষেরও।

কৃষিবিজ্ঞানী খলিফা পর পর সাতটি নীতি ঘোষণা করলেন—

প্রথম: পূর্বকালের রোমান ও ইরানের কৃষক উচ্ছেদেব জঘন্যতম গরিবী নির্যাতন নীতিকে একেবারেই রহিত করলেন।

দ্বিতীয়: কোন মুসলিম বা মুসলিম সেনা আরবের বাইরে কোন আবাদী জমির মালিকানা গ্রহণ করতে পারবে না। এমনকি ক্রয়মূল্যে কিনেও নিতে পারবে না। যদি কেউ এই নীতি লঙ্ঘন করে, তাহলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তৃতীয়: কোন আরব আরবের বাইরে বিজিত দেশে কোন রকম কৃষিকাজ হাতে নিতে পারবে না। সুরাইক ঘাত্‌কী নামক জনৈক আরব এরূপ করলে স্বয়ং খলিফা তাকে মদিনার দরবারে ডাক করিয়ে এমন তীব্র শাস্তি দেন যে, সমগ্র আরবে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আর ঐরূপ কাজ করার সাহস পায়নি।

চতুর্থ: বিজ্ঞ খলিফা লক্ষ্য করলেন, দেশে-বিদেশে বহু জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে। তখন খলিফা ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন অনাবাদী পড়ো জমিকে আবাদ করবে, সে তার মালিকানা স্বত্ব পাবে। খলিফার এই সময়োপযোগী নির্দেশের ফলে দেশ- বিদেশের বহু অনাবাদী জমি আবাদী হয়ে উঠল। ফলে উৎপাদনও বহু গুণে বেড়ে গেল।

পঞ্চম: খলিফা লক্ষ্য করলেন, বহু ধনী ব্যক্তি ও প্রভূত সম্পত্তির মালিকগণ কারণে-অকারণে প্রতি বছর বহু আবাদী জমিকে অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রেখে দেশের উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তখন তিনি বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, যে সমস্ত আবাদী জমির মালিক তাদের জমিকে পব পর তিন বছরের বেশি ফেলে রেখে দেবে, তারা তাদের সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব হারাবে। এই ঘোষণার ফলে বহু জমির মালিকগণ তাদের সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অনতিবিলম্বে ফসল উৎপাদনে মনোসংযোগ করায় দেশের উৎপাদন শক্তি বহু গুণে বেড়ে গেল। এমনকি যে সমস্ত কৃষক যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ভয়ে-ভাবনায় দেশ ত্যাগ করেছিল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন দেশে ফিরে চাষ-আবাদে মনোসংযোগ করে দেশের উৎপাদকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।

ষষ্ঠ: অতঃপর খলিফা দেশ-বিদেশের অনাবাদী জমিগুলোকে আবাদী কবাব পরিকল্পনায় একটি নতুন দপ্তরের প্রবর্তন করেন। এই দপ্তর গবেষণা করে খলিফাকে রির্পোট দিলেন যে, ঐ অনাবাদী জমিগুলোর জন্য সেচ-প্রথা, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ, যথা সময়ে জলসরবরাহ ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করতে পারলে ওগুলোকে সত্বর আবাদী জমিতে পরিণত করা যাবে। এবার খলিফা যথাযথভাবে কাজ আরম্ভ করলেন। এই কাজের জন্য কেবলমাত্র মিশরেই খলিফা এক লক্ষ তিন হাজার কর্মী নিযুক্ত করেন। খলিফার নির্দেশবলে জুমা বিন মাবিয়া নামক জনৈক কৃষি-বিজ্ঞানী খোজিস্তান আহওয়াজ এবং অন্যান্য কয়েকটি অনাবাদী অঞ্চলে বেশ কয়েকটি খাল খনন করে জলসেচের ব্যবস্থা করলে অনন্তকাল ধরে পড়ে থাকা লক্ষ লক্ষ একর ঊষর জমি কিছুদিনের মধ্যে অতি উত্তম ও উর্বর জমিতে পরিণত হয়ে সমগ্র অঞ্চলটিকে সবুজ ও শস্য-শ্যামলা করে তোলে। পরবর্তীকালে খলিফা এই সমস্ত অঞ্চলগুলোকে স্বচক্ষে ও স্বনজরে অবলোকন করে শতবার আনত চিত্তে আল্লাহর নিকট শোকরিয়া আদায় করেছিলেন।

সপ্তম: খলিফা কঠোরভাবে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তিই হোক, যে কোন কারণেই হোক খেতের ফল-শস্য নষ্ট করলে কঠোর শাস্তির জন্য দায়ী হবে। ফলশস্যের রক্ষার্থে খলিফার নির্দেশ খুবই কার্যকরী হয়েছিল। কোন এক সময় সিরিয়া অভিযানকালে কিছু সংখ্যক

সেনাবাহিনী একজন কৃষকের শস্যখেত মাড়িয়ে গেলে কৃষক খলিফার নিকট নালিশ জানালে খলিফা ঐ সেনাবাহিনীর সেনাপতিকে বরখাস্ত করে ঐ কৃষককে দশ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেন। তামাম দুনিয়ার বুকে আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন কিনা, আমাদের জানা নেই, যিনি খলিফা ওমরের মতো কৃষক, কৃষি ও কৃষিক্ষেত্র সম্পর্কে এত অকৃত্রিম ও এত অসাধারণ এবং এত সফল পদক্ষেপ রাখতে পেরেছেন। কৃষিবিজ্ঞানী হযরত ওমর শুধু প্রশাসনে নয়, কৃষিক্ষেত্রেও এক অদ্বিতীয় প্রতিভা, চির অমর।

রাজস্ব-ব্যবস্থায় চিন্তানায়ক ওমর :

ভাষা সমস্যার সমাধানে ভাষাবিদ ওমর :

নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় পদক্ষেপ রেখে চিন্তানায়ক ওমর শুধুমাত্র রাজস্ব ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তন করেননি, বরং ঐ কাজ করতে গিয়ে এমন কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যা আজও মহাকালের বুকে চিরউজ্জ্বল, চিরঅম্লান। খলিফা ওমর প্রথমেই বিবিধ দপ্তর সৃষ্টি করতে গিয়ে ভাষা সমস্যায় পড়লেন। বিজ্ঞ খলিফা বুঝতে পেরেছিলেন রাতারাতি ভাষা সমস্যার আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়, এবং সেটা দেশ ও জাতির জন্য খুব একটা জরুরি কাজও নয়। তাই মজলিস-ই-শুবার অধিবেশন ডেকে কয়েকটি জরুরি সিদ্ধান্ত নিলেন। যাদের একটি ছিল ভাষা সমস্যা। সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা ঘোষণা করলেন—যে দেশে যে ভাষা প্রচলিত আছে, সেই ভাষাতেই রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালিত হবে, যেমন ইরানে ফারসী, সিরিয়ায় ল্যাটিন ও মিশরে কপ্ট ভাষা সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ রক্ষিত হতো আপন আপন ভাষাতে। খলিফা তাঁর মদিনার দরবারে কিছু দো-ভাষীর ব্যবস্থা করেছিলেন, যাঁরা খলিফাকে জরুরি বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতেন। আরো কিছু দো-ভাষী ছিলেন—যাঁরা কেন্দ্রীয় অফিস মদিনা হতে অন্যান্য বিজিত অঞ্চলগুলোতে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ইসলামি মুদ্রার প্রবর্তন :

হযরত ওমরের পূর্বে ধনরত্নের সমাগমও তেমন কিছু ছিল না। তাই রাজকোষ স্থাপনের প্রশ্নও ওঠেনি। প্রয়োজনের সাথে সাথেই সবকিছুর প্রশ্নও মাথা চাড়া দেয়। প্রচুর ধনরত্ন আসতে থাকল, রাজকোষও স্থাপিত হল। এবার প্রশ্ন জাগল, ধন-রত্ন-টাকা-কড়ি প্রভৃতি মুদ্রাগুলো কি আজীবন বিদেশীদের বা বিজিতের ছাপ বহন করতেই থাকবে। খলিফা ওমর নির্দেশ দিলেন—ইসলামি মুদ্রা প্রচলন করার জন্য। সর্বকালে সর্বদেশে রাজ-আদেশ অনিবার্য। খলিফার আদেশও কার্যে পরিণত হল। ইসলামি মুদ্রার প্রচলন হল। ইসলামি মুদ্রার প্রবর্তক হিসাবে খলিফা ওমরের নাম চিরদিনের জন্য ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হল। খাঁটি ইসলামি মুদ্রা, যার ওপর লিখিত ছিল।

আল্‌হামদুলিল্লাহ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। লা-ইলাহা-ইল্‌লাল্লাহ: আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। পরবর্তীকালে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান (৬৮৫-৭০৫ খ্রীঃ) ৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে ব্যাপক ভাবেই মুসলিম মুদ্রার প্রচলন করেন। কেউ কেউ বলে থাকেন আব্দুল মালিকই মুসলিম মুদ্রার প্রবর্তক। কিন্তু একথা আদৌ ঠিক নয়। খলিফা ওমরের হতেই প্রথম ইসলামি মুদ্রা জন্মলাভ করে। পরে তা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

ইসলামি বা হিজরী সনের প্রবর্তনকারী ওমর:

ঠিক ইসলামি মুদ্রার পথেই হিজরী সনও একদিন খলিফা ওমরের হাতে জন্মলাভ করল। ৬৩৮ খ্রীস্টাব্দ, ১৬ হিজরী, মজলিসে-শুরার অধিবেশন চলছে। কোন একটি খসড়া কাগজে কেবলমাত্র লেখা ছিল—'শাবান'। 'শাবান' আরবী মাসের নাম। তখন খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ বছরেব 'শাবান', চলতি বছরের, না গত বছরের? ঠিকমতো উত্তর পেলেন না। তখন তিনি প্রয়োজনের তাগিদেই সন নির্ধারণের প্রস্তাব তুললেন অধিবেশনে। আলোচনান্তে অনেকে বললেন—ইরানের সন গ্রহণ করতে, কেউ বললেন রোমানদের। সবশেষে তাসাউফের জড় 'জ্ঞানের দবজা' হযবত আলী প্রস্তাব দিলেন—মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মক্কা হতে মদিনাতে 'হিজবত' কবাব মত বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ইসলামের বিশেষ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদেব ইসলামি সন গণনা করা উচিত। এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল, এবং খলিফা তখন হতেই 'হিজরী সন্' (৬২২ খ্রীঃ) প্রবর্তনেব কথা ঘোষণা করলেন।

যদিও মহানবী ৬২২ খ্রীস্টাব্দে রাবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখে হিজরত করেছিলেন, তবুও আরবী বছবেব প্রথম মাস 'মহবম' হতেই বর্ষ গণনা আরম্ভ হল—৬২২ খ্রীস্টাব্দ হতে। এব জন্য দু মাস আট দিন মাত্র পিছিযে দিতে হল হিজরী সনকে।

হযরত ওমরের সমর বিভাগ:
(Military Organisations under Omar-I)

কোরআন শরীফ:

যুদ্ধ: (কোরআনে বা ইসলামে কোথাও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ নেই। যুদ্ধ শুধু আল্লাহব পথে শান্তি ও ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের জন্য।)

সূরা বাকার:

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।" ২:১৯০।

"তোমাদের উপর সংগ্রাম বিধিবদ্ধ হল।" ২:২২৬।

সূরা নিসা:

"যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করুক, এবং কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করলে, সে মরুক অথবা বাঁচুক, আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করবো।" এইখানেই ইসলামের পথে সংগ্রামী মুসলমানগণ—'যুদ্ধে বাঁচলে গাজী, মরলে শহিদ'। ৪:৭৪।

সূরা তওবা:

তোমরা হালকা ও গুরুতর অভিযানে বের হও, এবং তোমাদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। এই-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে । ৯:৪১।

সূরা হজ্ব:

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম।"—২২:৩৯।

অন্যান্য স্থানে: ২:২৪৬, ৪:১০৩, ৯:৫, ২৯, ৩৬, ৪৭:৪।

মূল উৎপত্তি:

বিশ্ব ইতিহাস ও বিশ্ব সমাজের নিকট হতে সেনাবিভাগ বা সামরিক বিভাগের উৎপত্তি সম্পর্কে যা জানা যায়, তা বড়ই এক কৌতূহলপূর্ণ কাহিনী—'জোর যার মুলুক তার'। যুগ যুগ ধরে সমাজের নানা আবর্ত্তনে ও বিবর্তনে মানবসমাজ নদীরই মতো কোথাও ভাঙতে থাকে, কোথাও গড়তে থাকে। এই ভাঙা-গড়ার ইতিহাসেই আজকের সমাজ কোথাও সংগঠিত, কোথাও সংঘবদ্ধ। মানব সভ্যতার ও শক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু সংখ্যক মানুষ তারা দুনিয়ার বিশাল ভূসম্পত্তির ওপর অঞ্চল বিশেষে মালিকানা স্বত্ব স্থাপন ও ভোগ করতে থাকলেন। এই স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ও স্থায়ী রাখতে তাদের স্ব-স্ব বাহিনীও রাখতে হতো। এই বাহিনীই পরবর্তীকালের সেনাবাহিনীর ও সামরিক বাহিনীর মূল সূচনা বা সূত্রপাত।

মালিকের শক্তি ও সীমানা যতই বাড়তে থাকল, ঐ বাহিনীও ততই বাড়তে থাকল। একদিকে মালিকের সংখ্যাও যেমন বাড়তে থাকল, অন্যদিকে মালিকের শক্তি পরীক্ষাও তেমনি কারণে-অকারণে, সময়ে-অসময়ে বিশাল কলেবরে বৃদ্ধি পেতে থাকল। সংঘর্ষময় সংসারে শান্তি অপেক্ষা অশান্তিই, সুখ অপেক্ষা অসুখ, সাম্য অপেক্ষা অসাম্য, আনন্দ অপেক্ষা নিরানন্দ ইত্যাদি বেশি। কালের ইতিহাসে গড়ে উঠল—জোতদার-জমিদার, রাজা-মহারাজা, আমির-উমরাহ, নবাব-সুলতান, সম্রাট-বাদশাহ প্রভৃতি। এই সমস্ত মালিকদের প্রথম লক্ষ্যই ছিল ভূসম্পত্তি বা সীমানা বৃদ্ধি। যিনি অত্যাচারে-অবিচারে নিপীড়নে-নিষ্পীড়নে যতখানি সীমানার স্বামী বা প্রভু, তিনি ততখানি শক্তিধর

মানুষ। শুধু তাই-ই নয়, জোতদার জোতদারে লড়াই হত, ওপরে বসে জমিদার তামাসা দেখতেন, কখন এক পক্ষকে উস্কিয়ে দিতেন, আবার কখন অন্য পক্ষকে অন্যায়ে ইন্ধন জোগাতেন। সবশেষে যিনি জিততেন, তিনি তাঁকেই বাহবা দিয়ে আলিঙ্গন করতেন, বীরের মর্যাদা দিয়ে তকমাটি গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। লড়াইয়ের এই জঘন্য পদ্ধতি ও নীতিটি সর্বনিম্ন জোতদার হতে সর্বোচ্চ সম্রাট পর্যন্ত চলতে থাকত।

প্রথমদিকে জোতদার থেকে আরম্ভ করে সম্রাটের নিচু পর্যন্ত সকলকেই আপন আপন ওপরওয়ালা প্রভুকে বার্ষিক এক মোটা ভূ-কর পরিশোধ করতে হতো। এতদ্ব্যতীত বিপদের সময় লাঠিয়াল বাহিনী দ্বারা মাঝে ওপরওয়ালা প্রভুকে সাহায্য করতে হত। এইভাবে জোতদার থেকে সম্রাট পর্যন্ত গড়ে উঠতে থাকল বাহিনী। এই বাহিনীই পরবর্তীকালের রূপান্তরিত সেনাবাহিনী বা সামরিক বাহিনী।

ইসলামের পূর্বে বিশাল রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যে আমরা সেনাবাহিনীর যে চিত্রটি লক্ষ্য করি, তা এক শ্রেণীর রণ প্রভুর দল। তারা সারাদেশ জুড়ে আস্তানা গেড়ে বসে আছে। সম্রাট তাঁদের বিরাট বিরাট জায়গীর দিয়েছেন। তাঁরা ঐ সমস্ত জায়গীর পাওয়ার পরিবর্তে সম্রাটকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। এখন আমরা লক্ষ্য করছি—দু'রকমের ভূ-মালিক ছিলেন, 'জমিদারগণ বাদশাহ বা সম্রাটকে টাকা দিতে বাধ্য থাকতেন, এবং জায়গীরদারগণ সৈন্য দিতে বাধ্য থাকতেন। এইসব যুদ্ধে সৈনিকদের মূল আকর্ষণ ছিল লুণ্ঠন।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই সকল যুদ্ধে নীতির কোন বালাই ছিল না। লুণ্ঠন যেখানে মূল উদ্দেশ্য সেনাবাহিনীর, অত্যাচার যেখানে অন্তিম লক্ষ্য আক্রমণকারীর, সেখানে হয়তো ন্যায়ের আশা করাটাও অন্যায় হবে। এমনকি ইতিহাসে বারবার লক্ষ্য করা যায় জোতদার সুযোগমতো তাঁর প্রভু জমিদারকে আক্রমণ করছে, কোথাও জমিদার রাজাকে, রাজা মহারাজাকে, মহারাজা স্বয়ং সম্রাটকে; অর্থাৎ তদানীন্তন সেনাবহিনীর বিধানই ছিল—'জোর যার মুলুক তার'।

আরবে সেনাবাহিনী :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের কোন জাতীয় বা প্রকৃত ইতিহাস ছিল না। ছিল না কোন সমাজব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, রাজা বা রাজশাসন। তবে তারা এতই দুর্ধর্ষ ছিল, কেউই একনায়কত্ব করার সাহস পেত না। এমনকি পাশের বিরাট শক্তিধর পারস্য ও বিশাল রোমানরাজও তাদের আপন আপন ইচ্ছার দাস বানাতে কোনদিনই সাহস পায়নি। এই ছিল আরবের জাতীয় চরিত্র। ইয়ামেন ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে যদিও কিছু কিছু রাজতন্ত্র দেখা যায়, তবুও তাদের কোন বাঁধাধরা সেনাবাহিনী ছিল না। ঐ একই পথে তাঁরাও সেনা সংগ্রহ করতেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পর কোন সংগঠিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়নি। কেননা মহানবী স্বয়ং একজন শ্রেষ্ঠতম মুজাহিদ ও মুহায়িদ, এবং তাঁর যত শিষ্য ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন মুজাহিদ, অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিরোধকারী। যখন যার প্রয়োজন হতো, সকলেই যুদ্ধে যোগদান করতেন। তাই বিশেষ কোন সামরিক বাহিনী ছিল না। এমনকি মহানবীর পর প্রথম খলিফা আবুবকরের সময়ও কোন সামরিক বিভাগ বা সমর দপ্তর বলে কিছুই ছিল না। দেশবাসী সকলেই যুদ্ধের লাভ-লোকসান, ক্ষয়-ক্ষতি সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। এমনকি দ্বিতীয় খলিফা ওমরের খেলাফতের প্রথম দু'বছর ঐ একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে কখনও কেউ খাঁটি মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ না সে একজন মোজাহেদ (অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ও সংগ্রামকারী) হয়—কোরআন সূরা ইমরান ৩ : ১১০, নিসা ৪ : ৯৫।

প্রথম কোষাগার ও সমর দপ্তর :

প্রয়োজনের তাগিদে সৃস্টি হল ইসলামের প্রথম কোযাগার ও সমর দপ্তর। যে ঘটনাটি এই কাজগুলোকে ত্বরান্বিত করেছিল, বাহারায়েনের শাসনকর্তা বিখ্যাত সাহাবী আবু হোরায়রাহ ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে (১৫ হিজরী) ভূমিকর হিসাবে পাঁচ লক্ষ দিরহাম খলিফা ওমরের নিকট মদিনায় প্রেরণ করলে খলিফা এই বিপুল অর্থ নিয়ে কি করবেন, তা জানার জন্য তিনি মজলিশ-ই-শুরার সভা আহ্বান করে সকলের মতামত জানতে চাইলে প্রবীণ সাহাবী ওয়ালিদ বিন হিশাম ইসলামের কোষাগার স্থাপন ও সমর দপ্তর খোলার জন্য প্রস্তাব রাখলে তা সভাতে সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হওয়ায় ইসলামের প্রথম কোষাগার ও সমর দপ্তর খোলা হয়।

পরে সাহিব-ই-দিওয়ান নামে এই দপ্তরের প্রধানকর্তার পদও সৃস্টি হয়। তিনি সৈন্যবিভাগে রেজিস্টারী খাতা প্রবর্তন করেন। প্রতিটি সৈনিকের নাম-ঠিকানা নথিভুক্ত হত। পরে ছোট ছোট গোত্রের জন্যও সৈন্য রেজিস্টারী তৈরি হয়। এই রেজিস্টারী ভুক্ত সৈনিকগণ দু'ভাগে বিভক্ত হতেন। প্রথম ভাগের সৈনিক পূর্ণ বেতনভুক্ত ছিলেন। তারা দিবারাত্রি শিবিরে যুদ্ধের জন্যই সদাই প্রস্তুত থাকতেন। দ্বিতীয় বিভাগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মাতুয়াই বা সাময়িক সৈন্য বলা হতো। তাঁদেরকে প্রয়োজন মত ডাক দেওয়া হত, বাকি সময় তাঁরা আপন আপন কাজে বা পেশায় নিযুক্ত থাকতেন। তবে ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে খলিফা সামরিক বিভাগকে একেবারেই সাজিয়ে সুসংগঠিত করে তোলেন।

সামরিক ঘাঁটি :

খলিফা সমগ্র সেনাবিভাগকে সর্বমোট আটটি সামরিক কেন্দ্রে বিভক্ত করেন। যাদেরকে আরবী ভাষায় 'জুন্দ' বলা হতো। প্রথম মদিনা, কুফা, বসরা, ফুসতাত, দামেস্ক, মসুল, উরদান ও প্যালেস্তাইন ছিল সামরিক কেন্দ্র। এই

সামরিক কেন্দ্রগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল প্রথম স্বদেশকে বিদেশীর আক্রমণ হতে রক্ষা করা, এবং প্রয়োজনে আক্রমণ করা। কুফা, বসরা ও ফুসাতাতে (কায়রো) সেনাব্যারাকও তৈরি হয়েছিল, পরে এগুলো বিখ্যাত শহরে পরিণত হয়। প্রতিটি জুন্দে একটি করে আস্তাবল থাকত, এবং প্রতিটি আস্তাবলে চার হাজার অশ্ব থাকত। এইভাবে সকল 'জুন্দ' মিলে বত্রিশ হাজার যুদ্ধাশ্ব সদাই প্রস্তুত থাকত। ৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে হঠাৎ জাজিরাতে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিলে এই সেনাবাহিনী তা নিমিষের মধ্যেই স্তব্ধ করে দেয়। এই আস্তাবলগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কর্মচারী নিযুক্ত থাকত। খলিফার গুপ্তচর বাহিনী এগুলোর ওপর তীব্র নজর রাখতেন। কোথাও কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে খলিফার নিকট সেই কর্মচারীকে যথাযথভাবে জবাবদিহি করতে হতো। আস্তাবলগুলোতে শুধু যে ঘোড়াই থাকত তা নয়, যথেস্ট সংখ্যাতে উটও থাকত। এই বাহিনীকে 'জাইশ-ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর বাহিনী নামে অভিহিত করা হতো। এই সকল জুন্দের প্রশাসন বিভাগও ছিল খুবই সুন্দর ও শক্ত। এই প্রশাসনের প্রধানত দুটো বিভাগ ছিল, প্রথমটি ছিল সাধারণ প্রশাসনে যাবতীয় নথিপত্র সংরক্ষিত হতো, এবং দ্বিতীয়টিতে ছিল খাদ্যভাণ্ডাব ও খাদ্যের ব্যবস্থাপনা।

সেনানিবাস :

এই সমস্ত সমরঘাঁটি ব্যতীতও খলিফা সারা রাজ্যে কতকগুলো সেনানিবাসও প্রস্তুত করেন। বিজিত অঞ্চলের ঐ সমস্ত সেনানিবাসে আরব মুসলমানদের পরিচালনা এক প্রকার বাধ্যতামূলক ছিল। যখন রোমানদেব কবল থেকে সিরিয়া বিজিত হল, তখন খলিফা সেখানে একটি সেনানিবাস স্থাপন করাব নির্দেশ দেন। যাতে কেউ সুযোগমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারে। সিরিয়া বিজেতা আবু উবায়দাহ সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানসমূহে খলিফার নির্দেশ মত আরো কতিপয় সেনানিবাস তৈরি করেন। সিবিযাব পতনেব পব বোমান শক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যায় আরব বাহিনীব বিরুদ্ধে। এই বোমান আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্যই সেনানিবাসগুলোতে বহু সৈন্য মোতায়েন রাখতে হতো। মিশরে আমর-বিন-আসেব অধীনে যে বাহিনী ছিল, তার এক-চতুর্থাংশ আলেকজান্দ্রিয়ায়, এবং এক-চতুর্থাংশ সমুদ্রোপকূলে টহলদারি হিসাবে, এবং অবশিস্ট সৈন্য সারা মিশর দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত ফুসতাতে নিযুক্ত থাকত। বসরা, কুফা, প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রয়োজনমতো সেনানিবাস প্রস্তুত ছিল। এমনকি ইরাকের সমস্ত পুরাতন সেনানিবাসগুলোকে নতুন ভাবে মেরামত করার পরও খারিজা ও জাবুকাতে সাতটি নতুন সেনানিবাস তৈরি হয়। রায় ও আজারবাইজান সেনানিবাসেও সর্বদাই দশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত থাকত। এই সমস্ত সমরঘাঁটি ও সেনানিবাসের প্রধানত দুটো উদ্দেশ্য ছিল,—(১)

স্বদেশের ও বিজিত দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহকে দমন করা, (২) এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে রোমানদের নৌশক্তির মোকাবিলা করা। ছোটখাটো বিদ্রোহগুলোকে সেনানিবাস হতেই প্রশমিত করা হতো, বড় আকারে কিছু দেখা দিলে—সামরিক ঘাঁটির সাহায্য নেওয়া হতো। এককথায় সামরিক ঘাঁটি ও সেনানিবাস ছিল খলিফা ওমরের দক্ষিণ ও বাম বাহু।

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সেনা নিয়োগ প্রণালী :

প্রথমদিকে ইসলামের সেনা নিয়োগ ও সেনাবাহিনী দুটো মাত্র গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ ছিল—আনসার ও মোহাজেরিন। যাঁদের কথা কোরআনেও বর্ণিত আছে। ৯:১০০, ১১৭। পরবর্তীকালে খলিফা ওমর এই নিয়োগকে সারা আরবের মধ্যে মুক্ত করে দেন। তখন আরবের প্রান্তিক ভাগ সুদূব তায়েফ ও বাহরাইন হতেও বহু আরববাসী সৈন্যদলে যোগদানের সুযোগলাভ করেন। এমনকি ইরাকের কুফা, বসবা, ফুসতাত, জাজিরাহ ও অন্যান্য অঞ্চল হতেও আরববাসীগণ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হননি। এভাবে দেখা গেল তখন আট থেকে দশ লক্ষ আরব সেনার নাম সমর দপ্তরে তালিকাভুক্ত। ইবনে-সাদ ও অন্যান্য স্বনামধন্য আবব ঐতিহাসিকদের মতে তখন প্রতি বছর প্রায় ত্রিশ হাজাব সেনা নতুন ভাবে যোগদান করত। বিখ্যাত তাবারির মতে প্রায় এক লক্ষ যুদ্ধোপযোগী মানুষ কেবলমাত্র কুফা শহরেই বসবাস করতেন। এবং তাঁদের মধ্য হতে পালাক্রমে চল্লিশ হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হতো। অতঃপর বিজ্ঞ খলিফা সেনাবিভাগের সীমানাকে পাবস্য ও অন্যান্য দেশেব মধ্যেও যুক্ত করে দেন। এই সুযোগে অবাবিতভাবে সকলেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে থাকেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র সাধারণ সেনাই ভর্তি হতেন না। বহু উচ্চ পদাধিকারীও ভর্তি হতেন। সে যুগে খুসরো, আফরুদ্দীন, সায়াহ ও শাহরীয়ারের মতো সেনানায়কগণ দুই হতে আড়াই হাজার মুদ্রা পেতেন। সায়াহ এমনি বীর ও রণকুশল ছিলেন, তাঁরই বীরত্বে ও রণকৌশলে ফুসতারের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিলেন। বাধান ছিলেন নিজে অগ্নি-উপাসক, তিনি তাঁর সমস্ত বাহিনী-সহ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ইসলামের পূর্বে বহু ভারতীয় পারস্য সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। সিন্ধুর জাঠগণ ২০ হিজরীতে ৬৪২ খ্রীস্টাব্দে সুস অধিকৃত হলে সকলেই ইসলামে দীক্ষা নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন। আজো যাদের উপাধি 'যাত্'। অতঃপর রাজ্যের সীমানা ও বিস্তৃতি যেভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকল, সেনা নিয়োগের পরিধিও সেইভাবে প্রশস্ত হতে থাকল। এমনকি রোমান ও গ্রীকগণও ইসলামের জয়কালে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন। অগ্নিপূজক থেকে আরম্ভ করে বহু অমুসলমানও সেনাবাহিনীতে যোগদান করার সুযোগ লাভ কবেন। দূরদর্শী

খলিফা ওমর ইসলামের সেনা নিয়োগের ব্যাপারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও দেশের কোন ভেদাভেদ ও ব্যবধান না রেখে এক অতুলনীয় মেধার পরিচয় রেখে গেছেন।

সৈনিকদের বেতন ও ব্রত: (মার্‌লে গাজী, মর্‌লে শহিদ)

খলিফা সৈনিকদের বেতন ও সুখ-সুবিধা সম্পর্কে খুবই সচেতন মানুষ ছিলেন। আবার তাঁদের ব্রত সম্পর্কেও খুবই কঠোর ছিলেন। রোমান বা অন্যান্য সৈনিকদের মতো তিনি তাঁর কোন সৈনিককেই সামরিক কর্তব্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুই করতে দিতেন না। এমনকি ছোটখাটো কৃষিকাজ ও ব্যবসাবাণিজ্যও নয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—এতে সৈনিকের মূল সামরিক গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি তাঁদের কঠোর নীতিতে কঠিন সৈনিকই রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁদের প্রারম্ভিক বেতন ছিল—দুই থেকে তিনশত দিরহাম। খলিফা সৈনিকদের সর্বনিম্ন বেতন বার্ষিক দুই থেকে তিনশত পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। ঊর্ধ্বে এই বেতনহার ছিল সাত থেকে দশ হাজার। বেতন দেওয়া হতো বছরের প্রথম দিকে, এবং ভাতা দেওয়া হতো কয়েক মাস পর পরই। ওমরের পূর্বে সৈনিকগণের সন্তানগণ মাতৃস্তন্য ত্যাগ করার পর নির্ধারিত ভাতা পেত, পরে খলিফা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় শিশুদের প্রতি নির্মম ব্যবহার বুঝতে পেরে শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তার বৃত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শিশুজগতের প্রতি তাঁর নিষ্কলুষ স্নেহকে সত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেন। প্রতি দশজন সৈনিকের ওপর একজন আরিফ নামে ঊর্ধ্বতন অফিসার থাকতেন। তিনি তাঁর সৈনিকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সকল কিছুর দায়িত্ব পালন করতেন। চাকরি জীবনে প্রত্যেকের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকত। এতদ্ব্যতীত মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ ধনেরও সৈনিকগণ অংশ পেতেন। মুসলিম সেনাদের বেতন ও সৈনিক জীবনের ব্রত সম্পর্কে অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"পারসিক ও রোমান সেনাদের তুলনায় আরব সেনারা অনেক বেশি বেতন পেত, তার ওপর ছিল মালে গনিমতের নির্দিষ্ট অংশ। আরব সেনাদের নিকট যুদ্ধ কেবলমাত্র একটা লাভজনক ব্যবসা ছিল না, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট এটা সর্বাপেক্ষা মহৎ ও প্রিয় কাজ ছিল। আরব সৈন্যের শক্তিসুধা কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্য এবং উন্নত মানের অস্ত্র-শস্ত্র ও সংগঠনই ছিল না, তা ছিল (মহানবীর দেওয়া যুদ্ধ নীতি) উচ্চ নৈতিক জ্ঞান, অসাধাবণ মনোবল ও ধর্মীয় প্রীতি।" এইখানেই আরব-সেনাদের যুদ্ধ লাভজনক পেশা বা ব্যবসা হতে পবিত্র ব্রতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। প্রকৃত কথা বলতে আরবদের কোন জাগতিক বলই ছিল না একটিই মাত্র তিন বল নিহিত বল ছিল, সেটা চরিত্র বল, মনোবল ও ঈমানের বল। তাঁদের ব্রতে তাঁরা অপরের প্রাণ নিলে গাজী হতেন, এবং আপন প্রাণ দিলে শহিদ হতেন।

এ জগতে তুল্যহীন যে তিন সম্বল
মনোবল চরিত্রবল ঈমানের বল।

কোরআন: ২:১৫৩,১৯০, ২১৬, ২৪৬, ৪:৯, ৭৪,
১০৩, ৯:৫, ২৯, ৩৬, ৪১, ২২:৩৯, ৪৭:৪।

অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক:

ইসলামের প্রথম যুগে সৈনিকদের বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদ বলে কিছু ছিল না। কারণ মুসলমানগণ প্রথম প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ইসলামের প্রচারক রূপে। পরে বাধ্য হলেন রণাঙ্গনে নামতে ইসলামের সৈনিক রূপে। আমরা ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে (২১ হিজরী) মুসলিম সৈনিকদের কিছু নতুন পোশাকে দেখতে পাই—পশমী কোট, লম্বা টুপি, আমামা, পাজামা ও চামড়ার কিছু পোশাক। সেনাবাহিনী কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত থাকত, গোত্র নেতা আপন আপন গোত্রের নিশানসহ যুদ্ধে যোগদান করতেন। পদাতিক সৈনিকগণ তীর-ধনুক, ফিঙ্গা, ঢাল ও তলোয়ার ব্যবহার করতেন। আবিসিনিয়ার বিশেষ বর্শা 'হারবাহ' ব্যবহারেও তাঁরা খুবই পারদর্শিতার পরিচয় দিতেন। অশ্বারোহীগণ ব্যবহার করতেন—'রুমহ' বা লম্বা বর্শা, যার খত্তি বা দণ্ডটি বাহরাইনের আল-খাত নামক বিখ্যাত বাঁশ হতে প্রস্তুত হতো। তাঁরা তীর-ধনুক এবং তরবারিরও ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'হিন্দ' নামক ভারতীয় তরবারির খুবই মর্যাদা ছিল। এতদ্ব্যতীত সৈনিকগণ ঢাল বা বর্মও ব্যবহার করতেন আত্মরক্ষার জন্য। যাঁরা প্রসিদ্ধ বা খ্যাতনামা সৈনিক ছিলেন, তাঁরা আপন আপন পছন্দ মতো বিখ্যাত অশ্ব সংগ্রহ করতেন। বাকি অন্যান্যদের সরকার থেকে অশ্ব সরবরাহ করা হতো।

সৈন্যবিন্যাস:

সেনাবাহিনী শ্রেণীবদ্ধ রূপে সর্বমোট পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত থাকত—অগ্র-পশ্চাত, বাম-ডান ও মধ্য। সাধারণভাবে অশ্বারোহীগণ ডানে ও বামে থেকে পদাতিকগণকে রক্ষা করত। আবার পদাতিকগণও তিন ভাগে বিভক্ত থাকত—বামে ও ডানে বর্শাধারী ও ধনুর্ধরগণ, এবং মধ্যভাগে পদাতিকগণ। প্রথম দিকে সমগ্র বাহিনীর কোন নির্দিষ্ট একজন সিপাহসালার বা সেনাধ্যক্ষ থাকত না। ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রথম সিপাহসালার বা সেনাপতি রূপে দেখতে পাই। এইজন্যই খালিদ বিন ওয়ালিদকে ইসলামের জগতের প্রথম সিপাহসালার বলা হয়। এই পদে ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকর তাঁকে নিযুক্ত করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে (৪০) চল্লিশ হাজার সৈন্য ছত্রিশটি অংশে বিভক্ত হয়েও একই সঙ্গে একজন সেনাপতি অজেয় বীর খালিদের অধীনে যুদ্ধ করেন।

খলিফা ওমর যেভাবে সেনাবিন্যাসের নির্দেশ দিয়েছিলেন—

১। **কলব্=মধ্যভাগ:** এর সঙ্গে থাকতেন স্বয়ং সিপাহসালার।
২। **মকাদ্দামাহ্=** সম্মুখ দল:
৩। **মায়মানাহ্=** দক্ষিণ বাহু:
৪। **মায়সারাহ্=** বাম বাহু:
—(এরা মূল সেনাবাহিনী)
৫। **সাফাহ্=** পশ্চাদ দল:
৬। **তালাইয়াহ্=** টহলদারি দল: যারা শত্রুর ওপর নজর রাখত।
৭। **রিদ =** সর্বপশ্চাদ দল: যাদের কাজ ছিল সম্মুখকে সাহায্য করা।
৮। **রাইদ =** রসদবাহী: যাদের কাজ ছিল খাদ্য সরবরাহ।
৯। **রুকবান =** উষ্ট্রবাহিনী: যাদের কাজ ছিল ভার বহন।
১০। **ফরসান =** অশ্বারোহী বাহিনী:
১১। **রাজিল =** পদাতিক বাহিনী: —মূল সেনাবাহিনী।
১২। **রমাত্ =** তীর-ধনুক বাহিনী:
১৩। **নাযারাত-ই-নাফিযা =** পূর্ত বাহিনী: কাজ ছিল সড়ক, সেতু ও গৃহ নির্মাণ।
১৪। **গুপ্তচর বাহিনী =** গুপ্তচর বাহিনী: কাজ ছিল গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা।

এতদ্ব্যতীত যুদ্ধকালে কিছু কিছু যন্ত্রপাতিও ব্যবহৃত হতো। দুর্গ দখল করতে ও দুর্গপ্রাচীর ধ্বংস করতে প্রস্তর ক্ষেপক যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। 'দাব্বাহ' নামক একটি যন্ত্র অবরোধকালে খুবই কাজে লাগত। আরো কিছু যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। এগুলোর বেশির ভাগ পদাতিক বাহিনীরাই ব্যবহার করতেন দুর্গ আক্রমণ করতে, কোথাও ধ্বংস করতে, কোথাও আত্মরক্ষা বা আত্মগোপন করতে। নাযারাত-ই-নাফিয়া গোষ্ঠী অভিযানকালে রাস্তা, সেতু, শিবির ইত্যাদি নির্মাণকাজে ব্যস্ত থাকত। এরা সকলেই সৈন্যবাহিনীর অন্তর্গত ছিলেন।

খলিফা ওমরের খেলাফতে যাতে সঠিক সংবাদ খলিফার নিকট পৌঁছায়, তাঁর জন্য তিনি বিশেষ গুপ্তচর বাহিনীও প্রস্তুত করেন। তাঁর সময় এই বাহিনী খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল। খলিফা গুপ্তচর হিসাবে কোন আরবকে কোথাও পাঠাতেন না। তিনি যেখানে গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন, গুপ্তচর সেই দেশবাসীরই হতেন। কেননা কোন প্রবাসীর পক্ষে কোন নতুন দেশের কোন গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা যতটা কঠিন, আপন দেশবাসীর জন্য সেটা ততটা শক্ত নয়। এই গুপ্তচর নিয়োগে খলিফা কোন জাতি-ধর্ম বা বর্ণের ভেদাভেদ রাখতেন না। অগ্নিপূজক হতে আরম্ভ করে ইহুদি-খ্রীস্টান বা যে কোন সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তি হলেই তাকে নিয়োগ করতেন। প্যালেস্টাইন ও জর্ডনের সুমাবিস্তান

গোষ্ঠীর ইহুদিগণ গুপ্তচর হিসাবে খুবই পারদর্শী ছিল। খলিফা তাদের মধ্য হতেও অনেক গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন, এবং তাদের নিষ্কর জমি দান করতেন। খলিফা এই গুপ্তচর বিভাগে আরো একটি শাখা রাখতেন, তাঁরা ছিলেন গুপ্তচরের গুপ্তচর। এখানে একজন মুসলিম খলিফা একজন বিধর্মীর প্রতি কতইনা আস্থাভাজন ছিলেন।

সেনাবাহিনীর খাদ্যব্যবস্থা :

ইসলামের প্রথম দিকে সৈনিকদের খাদ্যব্যবস্থা বড়ই ঢিলেঢালা গোছের ছিল। কেননা তখন কোন ব্যবস্থাই একটা পাকাপাকি রূপ নেয়নি। এর মূল কারণ ছিল স্বয়ং মহানবীর নিকট যুদ্ধ-বিগ্রহ বড়ই ঘৃণিত বস্তু ছিল, তাঁর পেশা ছিল ইসলাম প্রচাব ও নেশা ছিল মানব জাতির কল্যাণ।

ধরার বুকে কোরআন প্রচার পবিত্র তোমার পেশা
মানব জাতির উত্থান ছিল একটি তোমার নেশা।
বিশ্ববুকে তোমার ব্রত বিশ্বস্রষ্টার বন্দনা
সেই স্রষ্টাব সন্তান সবে এক অভিন্ন ভাই জানা।

এই কারণেই ইসলামেব প্রথম দিকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুই একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেনি। তখনকার দিনে সেনাবাহিনী আশপাশের গ্রাম হতে তাঁদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত। পববর্তীকালে জিম্মিগণ মাথা পিছু পঁচিশ সেব খাদ্যশস্য আদায় দিত। এইভাবে আদাযকৃত খাদ্যশস্য সেনাবিভাগে চালান দেওয়া হতো। মিশর ও জাজিরাহ থেকে আসত জলপাই তেল, মধু ও সির্কা, এগুলো সৈনিকগণের খুবই কাজে লাগত। পরবর্তীকালে খলিফা 'আহরা' নামক একটি খাদ্যদপ্তর স্থাপন করেন। এই দপ্তরের মূলত কাজ ছিল খাদ্য সংগ্রহ করা ও তা ঠিকমতো সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা। এই দপ্তর হতে প্রতিটি সৈনিককে প্রতি মাসে একমণ দশ সের খাদ্যশস্য, বারোসের জলপাই ও বারোসের সির্কা দেওযা হতো। কিন্তু এরও পরবর্তীকালে খলিফা যখন সিরিযা পরিদর্শনে এলেন, তখন হতে তিনি সৈনিকদের রেশন দেওয়ার পরিবর্তে রান্না করা খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন।

সৈনিকগণের স্বাস্থ্য বিভাগ

সেনাবাহিনীকে ঠিকমতো খাদ্য সরবরাহ করার পরও যাতে তাদের স্বাস্থ্যের কোন অবনতি না ঘটে, যাতে তারা উন্নতমানের স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, সেদিকেও খলিফার সজাগ দৃষ্টি ছিল। যুদ্ধবিহীন অবসর সময়ে সৈনিক যাতে অলস ও অপদার্থ হয়ে না পড়ে, তার জন্য খলিফা আধুনিক যুগের মতো ঘোড়দৌড়, তীর ছোঁড়া, কুস্তিবাজী, সন্তরণ, খোলা মাঠে খালি পায়ে বিচরণ ইত্যাদি নানা প্রকারের ফরমান জারি করেন। খলিফা সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন—ঋতু পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখে অভিযান পরিচালনা করতে।

তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকালে যুদ্ধ পরিচালনা করতে। এই দুই অভিযানকে বলা হতো 'শাতিয়াহ' ও 'সাফিয়াহ'। পারস্য অভিযানের সময় খলিফা লক্ষ্য করেছিলেন আবহাওয়ার জন্য সৈনিকদের স্বাস্থ্য খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতঃপর খলিফা কঠোরভাবে নির্দেশ জারি করেছিলেন, প্রতি বছর বসন্তকালে সেনাবাহিনীকে স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করতে, যে সমস্ত অঞ্চলে উত্তম চারণভূমিও থাকবে যুদ্ধের জীবজন্তুগুলোর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। মিশরের শাসনকর্তা আমর-বিন-আস বসন্তকালে সেনাবাহিনীকে গ্রামাঞ্চলে কিংবা উত্তম স্থানে সময় বিনোদনের জন্য পাঠাতেন, যেখানকার সুজলা-সুফলা চারণভূমিগুলোতে দীর্ঘদিন চারণের ফলে যুদ্ধের অশ্ব ও উটগুলো স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠত।

খলিফা যখনই কোথাও সেনানিবাস বা সেনাব্যারাক নির্মাণ করার জন্য অনুমতি দিতেন, তার পূর্বেই তিনি সেই অঞ্চলের আবহাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করতেন। সাধারণত এগুলোকে খোলামেলা ও উচ্চস্থানে তৈরি করা হতো। আবহাওয়া যাতে কোনরকমেই বদ্ধ না হয়ে যায়, তার জন্য খলিফা বিশাল প্রান্তরে মুক্ত হাওয়া চলাচলের যথেষ্ট অবকাশ রেখেই ঐগুলো প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন। সেখানকার পথঘাট, পানীয় ব্যবস্থা, আলো-বাতাস সমস্ত কিছুকে খলিফার গোচরে আনা হতো। কুফা-বসরা ও ফুসতাতের সেনানিবাসগুলো এক একটি স্বাস্থ্য-নিবাসে পরিণত হয়েছিল।

ছুটি :

প্রতিটি সৈনিক প্রচণ্ড অভিযান চলাকালেও সপ্তাহে একদিন-একরাত্রি পূর্ণ ছুটি পেত বিশ্রামের জন্য। খলিফার এই সমস্ত নির্দেশের ওপর স্বয়ং খলিফা নিজেই উপযুক্ত তদারকি করার জন্য উপযুক্ত মানুষ নিযুক্ত করতেন। যে সমস্ত সৈনিক দূরবর্তী স্থানে যুদ্ধ পরিচালনায় চলে যেতেন, তাঁরা সাধারণত বছরে একবার ছুটি পেতেন। খলিফা ওমর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বহু কথাই গুপ্তচর বাহিনীর মুখে শ্রবণ করতেন, কিন্তু সেখানে তাঁর সংবাদ সংগ্রহের পিপাসা নিবৃত্তি হতো না। তিনি রাত্রিকালে একাকী ছদ্মবেশে দীন-দরিদ্র মানুষের, অসহায় নর-নারীর অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য গোপনে পরিভ্রমণ করতেন। ঠিক এইরূপ ভ্রমণকালে একদিন এক বিবাহিতা যুবতীর করুণ-বিরহ সঙ্গীত তাঁর কানে পড়লে তিনি তাঁর আপন কন্যা (মহানবীর স্ত্রী) বিবি হাফসাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন কতদিন বিবাহিতা যুবতী তার স্বামী ব্যতিরেকে নিরুদ্বেগে থাকতে পারে? উত্তরে কন্যা বলেন—বড় জোর চার মাস। খলিফা সঙ্গে সঙ্গে সকল সিপাহসালারদের ফরমান জারি করলেন—চার মাস অন্তর প্রতিটি সৈনিককে আপন আপন পরিবারে ফেরার জন্য ১৫ দিন ছুটি দিতে হবে।

সমর বিভাগের সর্বময় কর্তা ওমর:

খলিফার সমর বিভাগে বহু সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু খলিফা ছিলেন সর্বময় কর্তাব্যক্তি। তাঁর সামান্য অঙ্গুলি ইশারাতে যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন হতো। এটা ছিল তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। তাঁর ব্যক্তিত্ব গভীরতায় সমুদ্র হতেও অতলস্পর্শী ছিল, গম্ভীরতায় ছিল গগনস্পর্শী, অটলতায় ছিল পর্বততুল্য, উদারতায় ছিল আকাশতুল্য, বিচারে ছিল আকাশের বারিবিন্দু হতেও বিশুদ্ধ, শাসনে ছিল সূর্যের মতো তীব্র, স্নেহতে ছিল মায়ের তুল্য চন্দ্রবৎ। আরবের ভাগ্যাকাশে তিনিই ছিলেন ভবিষ্যৎ, আরবের গঠনপথে তিনিই ছিলেন নিপুণ নির্মাতা। স্বয়ং মহানবী (সাঃ) তাঁর চরিত্র-গুণে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পবিত্র নবীর মুখ দিয়ে বের হয়েছিল—"আমার পর কোন নবী এলে, সে হতো ওমর।"

এই অতুলনীয় অচিন্ত্যনীয় ব্যক্তিত্বই আরবের বিশাল সাম্রাজ্যের বিরাট সমর বিভাগে দিয়েছিল—অফুরন্ত শক্তি, সাহস, শৃঙ্খলা, অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা। এককথায় খলিফা ওমর জাতির জীবনে সৌভাগ্যের শত সিন্ধুক খুলতে সমর বিভাগের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সফলতার এক গোছা চাবি।

হযরত ওমরের বিচার বিভাগ

কোরআনে বিচার:

*"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন—
তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে,
তখন ন্যায় বিচার কর।" ৪ : ৫৮।

*"তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় থাকবে,
তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষ্য দেবে,
যদিও তা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়,
সে দরিদ্র হোক, আর ধনীই হোক, আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতম অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যদিও তোমরা প্যাঁচালো কথা বল, ও পাশ কাটাও, তবে তোমরা যা করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" ৪ : ১৩৫।

* "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অটল থাকবে। এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা হেতু সুবিচারের অন্যথা করো না। তোমরা সুবিচার কর।" ৫ : ৮।

"নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচার ও সৎকর্ম করতে এবং অত্মীয়-স্বজনদের দান করতে নির্দেশ দেন। তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন।" ১৬ : ৯০।

বিবাট ব্যাবিস্টাব যোগে পাপ কবি ক্ষয
বলি হে বিধাতা কোর্টে পাপে নাহি জয,
সত্য যদি ফুটে মানবেব হাটে।
ফুটিবে সঠিক সত্য হাশবেব মাঠে।
থাকিলে পাপেব কণা কিঞ্চিত জমা
তোমাব বিচাবাগাবে নাহি আছে ক্ষমা।

১৭ : ১৪, ৬৯ : ২৫, ৯৯ : ৭ ৮।

বিচারক ওমর :

স্বযং মহানবী তাঁব পবিত্র জীবনকালেই হযবত ওমবকে মদিনাব প্রধান বিচাবপতিব আসনে অধিষ্ঠিত কবে বিশ্ব-বিচাবজগতেব চূড়ান্ত মানব ও বিশ্ব-বিচাবাগাবেব চিবপ্রবাদ-পুরুষ রূপে নির্ণয কবে গেছেন। হযবত ওমব সম্পর্কে তাঁব এই মূল্যাযন ছিল চিব অভ্রান্ত, চিব অম্লান। স্বযং মহানবী হযবত মহম্মদ (সাঃ)-এব নিকট এরূপ আস্থাভাজন হওযা কত যে সুকঠিন, কত যে দুর্লভ, কত যে অমূল্য, কত যে মহামূল্য, কত যে অচিন্তনীয, এবং কত যে আকর্ষণীয ছিল, তা এককথায শত গ্রন্থ লিখে বোঝাবাব নয, ববং তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বোঝাব বস্তু।

মহানবীব জীবনকালে হযবত ওমবেব বিচাব সম্পর্কে কেবলমাত্র দুটি ঘটনাব কথা উল্লেখ কবলে তাঁব সাবা জীবনেব ঘটনাবাশি এক নিমিষে সকল মানুষেব চোখে একত্রিত হযে পবিত্র গোলাপ ফুলেব পাপড়ি ছাডাব মতো ফুটে উঠবে। কেননা ইসলামেব ফুল-বাগিচায তিনি নিজেই ছিলেন একটি ফুটন্ত গোলাপ। আবু শামা হযবত ওমবেব যোগ্য ছেলে। ভুল মানুষেব চিবসঙ্গী, ভ্রান্তি মানুষেব চিবসাথী। সেই ভুলেব ফুল আবু শামা আজ বিচাবেব কাঠগডায দণ্ডাযমান। বিচাবক স্বযং হযবত ওমব। সমগ্র মদিনাব, সমগ্র আববেব অনুবোধ, উপবোধ, অনুনয, কাকুতি-মিনতি সকল কিছুকে উপেক্ষা কবেই আপন হাতে আপনাব চবম স্নেহধন্য পুত্রেব প্রাণদণ্ড ঘোষণা কবে বিশ্ব-বিচাবাগাবকে ধন্য কবে, বিশ্ব-বিচাবকমণ্ডলীকে অনুশীলনেব এক অভাবনীয আদর্শ ও অচিন্তনীয দৃষ্টান্ত দান কবে, আল্লাহব মহান 'আবশ' কে আলোড়িত কবে, সমগ্র মানবমণ্ডলীব বিচার জগৎকে চিব উজ্জ্বল হতে চিব সমুজ্জ্বল কবে, চিব গৌবব দান কবে গেছেন। এই-ই ছিল হযবত ওমবেব বিচাবেব দৃষ্টান্ত ও বিচাবকেব সিদ্ধান্ত।

জগৎ জানিল কেন বলেছিলেন দ্বীনেব পয়গম্বব,
মোব পবে যদি নবী হতো কেউ, জগৎ দেখিত 'ওমব'।

দ্বিতীয় ঘটনাটি—একবার এক ইহুদি ও এক মুসলমানেব মধ্যে কলহ

বাধলে মুসলমানটি বলে,'চলো আমরা মহানবীর নিকট যাই, তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন বা রায় দেবেন, আমরা তা মেনে নেবো।' ইহুদি তাঁর কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করে উভয়ে মহানবীর নিকট হাজির হয়ে সব কথা তাঁকে বিস্তারিত ভাবে জানালে মহানবী মুসলমানটির বিপক্ষে ও ইহুদির পক্ষে রায় দেন। উভয়েই মহানবীর নিকট হতে প্রস্থান করে পথিমধ্যে চলার কালে মুসলমানটি ইহুদিকে বলল, "এখন বিচারক মহানবী নন, হযরত ওমর বিচাবক, সুতরাং চলো আমরা তাঁর নিকট গিয়ে বিচার প্রার্থনা কবি।" ইহুদি সম্মত হলে উভয়েই ওমরের নিকট হাজির হযে কলহেব কথা ও মহানবীর বিচারেব কথা সবই জানালে ওমর তাদের কেবলমাত্র বললেন—"তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আসছি।" বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘর হতে আপন বিশাল তরবারিটি এনে মুখে শুধু বললেন—"এত বড় দুঃসাহস, মহানবীর বিচারকে অমান্য কর মুসলমান হয়ে—বলার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানটির মাথাকে এক চোটে দেহ হতে বিছিন্ন করে দিলেন। এবং বললেন—"এই-ই আমার বিচার। তুমি মুসলমান নও মুনাফেক"। সারা মদিনায় ছড়িয়ে পড়ল কথা। রটনা হয়ে গেল—ওমর মুসলমানদের হত্যা করছেন। মহানবীর কর্ণগোচর হলে ওমর বুঝিয়ে দিলেন—সে মুসলমান নয়ই, বরং মুনাফেক (প্রতারক)। সারা মদিনা, সারা আরব, স্বয়ং মহানবী বিচারক ওমরের বিচারের শতমুখে প্রশংসা করেছিলেন।

বিশ্ব বুঝিল—কেন বলেছিলেন শেষ নবীবর মহম্মদ
মোর পরে যদি নবী হতো কেউ—ওমর পাইত পদ।

স্বাধীন বিচার বিভাগ:

খলিফা ওমরের পূর্বে বিশ্ব-বিচার বিভাগের ইতিহাসে একটি জিনিস লক্ষ্য করার মতো, তখন বিশ্ব-বিচারাগার ছিল প্রশাসনের অধীনে, অর্থাৎ তথাকথিত স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীনে। বিশ্ব-বিচারের প্রবাদপুরুষ, মহানবী দ্বাবা নিযুক্ত মহাভাগ্যবান বিচারক হযরত ওমরের দৃষ্টিতে বিধৃত হল—যিনি বিচার করবেন, যিনি হবেন বিচারক, তাঁকে একেবারেই স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ হতে হবে। নচেৎ কোন পরাধীন ব্যক্তির নিকট হতে স্বাধীন মতামত কামনা করা যায় না। খলিফা তাঁর এই যুগান্তকারী চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি কবেই বিচার বিভাগকে প্রশাসন হতে একেবারেই মুক্ত বা পৃথক করে দিলেন। আমাদেব ভাবতেব পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দেড় হাজার বছব পর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধান কবেন তদানীন্তন যুক্তফ্রন্টের আইন বা বিচারমন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল। শ্রদ্ধেয ভক্তিবাবু নিজেও একজন সৎ গরিবদরদী ও চিন্তাশীল আইনজ্ঞ মানুষ। বিশ্ব-বিচাবেব ইতিহাসে এই অধ্যায়ের খলিফা ওমর তাই চির পথিকৃৎ।

বিচারের মূলনীতি:

স্বয়ং মহানবী ঘোষণা করেছিলেন—"আল্লাহর নিকট ৬০ বছরের 'নফল এবাদৎ' (অতিরিক্ত উপাসনা) অপেক্ষা একটি ন্যায় বিচার শ্রেষ্ঠ।"

খলিফা বলেন :

১। ন্যায় বিচার একটি অতীব জরুরি পালনীয় কর্তব্য।

২। বিচারকের উপস্থিতিতে, তাঁর বিচারাগারে, তাঁর বিচারে সকল মানুষ সমান ব্যবহার পাবে। মানুষে মানুষে কোনরূপই তারতম্য থাকবে না।

৩। দুর্বল যেন ন্যায় বিচারে আস্থা না হারায়, সবল যেন অনুকম্পার কোনই আশা না রাখে।

৪। প্রমাণের ভার বাদীর ওপর।

৫। অভিযোগ অস্বীকারকারীকে শপথসহ অস্বীকার করতে হবে।

৬। ন্যায়কে অন্যায়, এবং অন্যায়কে ন্যায় করে আপোস করা চলবে না।

৭। ভুল সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা ও পরিবর্তন করতে হবে।

৮। পবিত্র কোরআন ও হাদিসের বিরুদ্ধে কোন কিছু পাওয়া গেলে অবিলম্বে তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

৯। বিগত মামলার দৃষ্টান্তসমূহ দেখে রায়টিকে উপমা-নির্ভর হতে হবে।

১০। সাক্ষী বিহনে মামলা খারিজ হবে।

১১। সকল মুসলমানের সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য, তবে যে ব্যক্তি বিচারে বেত্রদণ্ড ভোগ করেছে ও মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে, সে নয়।

১২। নিকট-আত্মীয়ের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না।

খলিফা ওমর বিচারের মূলনীতি নির্ধারণ করে ধনী-দবিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মালিক-দাস, রাজা-প্রজার সমস্ত ভেদ রেখা রহিত করেই ক্ষান্ত হননি। কেননা তিনি ছিলেন আচার্য। তাই সকল কিছু করে দেখিয়ে দিতেন। তিনি স্বয়ং খলিফা হয়েও যে কোন একটি সাধারণ মানুষকেও তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করার সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাও নজির বিহীন দৃষ্টান্ত। কোন এক সময় উবাই নামক এক ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি যায়িদ বিন সাবিতের আদালতে খলিফার বিরুদ্ধে নালিশ করলে খলিফা যথাসময়ে বিচারকের আদালতে হাজির হলে বিচারক খলিফাকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর জন্য খলিফা বিচারককে সকলের সম্মুখেই তিরস্কার করেন—"এটি তোমার বে-ইন্‌সাফ্, তোমার নিকট আসামী-ফরিয়াদী সকলেই সমান।" অতঃপর বিচারক যিয়াদ বাদী উবাইকে সাক্ষী হাজির করতে নির্দেশ দেন, এবং উবাই তাঁর দাবির পক্ষে সাক্ষী হাজির করতে অসমর্থ হন। তখন খলিফার পালা পড়ে শপথ করে বাদীর দাবিকে অস্বীকার করার। ইতিমধ্যে বিচারক যিয়াদ স্বয়ং খলিফাকে যাতে শপথ করতে না হয়, তজ্জন্য বাদী উবাইকে তাঁর দাবি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। তখন খলিফা ওমর সঙ্গে সঙ্গে বিচারককে এই বলে তিরস্কার করেন—"যদি খলিফা ওমর ও একটি অতি সাধারণ মানুষ আপনার চোখে সমান না হয়, তাহলে আপনার বিচারাসনে বসার

কোন অধিকারই নেই।" এইভাবে ওমর বিচারের যে ১২ দফা মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন, সেগুলো তাঁর ব্যক্তিজীবন হতে সাধারণ মানুষের জীবনে পালন হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে তীব্রভাবে সজাগ ও সচেতন ছিলেন।

তব হাতে নাহি কোন ক্ষীণ পরাজয়
বিবেকেতে থাকে যদি ইন্‌সাফের জয়।
তোমাতে পশুতে করে সহস্র তফাৎ
ইন্‌সান্ তোমার নাম তব ইন্‌সানিয়াৎ।
ঈমান ইন্‌সাফ্-সহ তোমার আমান্
তোমাকে করিবে দান জগৎ-সম্মান।

কোরআন: ৩:৩১, ৩১:২১, ৩৩:২১, ৪১:৩৫, ৬০:৬, ৬৮:৪।

বিচারক নিয়োগ:

ওমর কাজী বা বিচারক নিয়োগে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন। তিনি বলতেন—ঐ ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করা উচিত হবে না, যে ব্যক্তি জনগণের চোখে সম্মানের পাত্র নন। যে ব্যক্তির প্রতি জনগণের আস্থা বা বিশ্বাস নেই। খলিফা মদিনায় বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন —যাবিদবিন-সাবিতকে, যিনি ছিলেন স্বয়ং মহানবীর ওহির বা ঐশীর লিপিকার। যিনি আরবী, হিব্রু ও সিরিয় এবং অন্যান্য ভাষাসমূহে ছিলেন সুপণ্ডিত। মহানবীর নিকট বহু বিদেশী এলে অনেক সময় তিনি দোভাষীর কাজও করতেন। একককথায় মহানবী নিযুক্ত তিনিই ছিলেন কোরআনের প্রথম লিপিকার। খলিফা বসরায় কাজী নিযুক্ত করেছিলেন—কাব্-বিন-সুর-আল-আযদীকে। যিনি সে যুগে ধ্যানে ও জ্ঞানে মহাজ্ঞানীর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্যালেস্তাইনে কাজী নিযুক্ত করেন—ইবাদা-বিন-সামাতকে, যিনি মহানবীর জীবিতকালে স্বনামধন্য পাঁচজন কোরআনের হাফেজের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। খলিফা প্রায়ই বলতেন—"যদি কেউ কোরআন শিখতে চাও, তাহলে ইবাদা-বিন-সামাতের নিকট গমন কর। কুফার কাজী ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ-বিন-মাসউদ। যাঁর জ্ঞান-গরিমা-সততা সত্যের পরীক্ষায় বহুবার জনসাধারণকে মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় মুগ্ধ করে তুলেছিল। কিছু বিচারক ছিলেন যাঁরা মহানবীর সান্নিধ্য লাভে তাঁর সাহাবী হওয়ার সুযোগ পাননি। যেমন বিচারক শুরাইহ্, যাঁকে মহাজ্ঞানী আলি 'আকদ্-উল-আরব' অর্থাৎ আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ বলে ভূষিত করেছিলেন। এইভাবে খলিফা ওমরের আমলে আরবের বিচারাকাশকে সে যুগের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলো কতই না শোভিত করে তুলেছিল।"

খলিফা বিচারকদের উচ্চহারে বেতন নির্ধারণ করেছিলেন, যাতে তাঁরা তাঁদের সংসার যাপনে কোন উৎকোচ বা অন্যায়মূলক কিছু গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ না হন। সাধারণভাবে তাঁদের বেতন ছিল পাঁচশো দিরহাম। তাঁরা

বিচার ব্যতীত অন্য কোন আয়ের পথ অবলম্বন করতে পারতেন না। এই নিয়োগে প্রধান নীতি ছিল—সৎ-বংশ, সাধুব্যক্তি, জ্ঞানীজন, জনগণের শ্রদ্ধাভাজন ইত্যাদি।

বিচার পদ্ধতি:

বিচার পদ্ধতি সম্পর্কেও খলিফা ওমর কতকগুলো নিয়মকানুন নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

১। যে আইন দ্বারা বিচার পরিচালিত হবে, সেই আইনের মধ্যেই যেন কোন ফাঁক-ফোঁকর বা দুর্বলতা না থাকে।

২। বিচারক নিয়োগের সময় এমন কিছু বিধিবিধান বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে অযোগ্য কোন ব্যক্তি বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করতে না পারে। (বর্তমানে আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও এসে উচ্চতর আদালতের বিচারক নিয়োগের কাঁচা ও স্বজন-পোষণ পদ্ধতি দেখে জনগণ কখন হতাশ, কখন হাসছে, সমালোচনা করছে ও বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে) খলিফা ওমরের সময় জনগণের এই দুর্ভাগ্য ঘটেনি।

৩। মামলার সংখ্যানুপাতে বিচারক নিয়োগ, যাতে জনসাধারণের বিচার পেতে বিলম্ব না হয়।

৪। বিচার বিভাগে আইনের মৌল উৎস ছিল যথাক্রমে—কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। সর্বশেষ ছিল বিবেকের প্রয়োগ।

৫। বিচারে সন্দেহবশত কেউই যেন শাস্তি না পায়, মুক্তি পেতে পারে।

৬। বিচারকে ব্যয়সাধ্য করা চলবে না, যাতে ধনী সুযোগ পাবে, নির্ধনী ন্যায় বিচারে বঞ্চিত হবে। খলিফার নীতি ছিল বিচারকে সহজলভ্য কবতে হবে।

৭। বাদীকে কোন ফি জমা দিতে হতো না। অনেক সময় মৌখিকভাবেও নালিশ করা হতো। বিবাদীকে সাক্ষী দ্বারা অভিযোগ খণ্ডন করতে হতো, এবং বাদীকে শপথ-সহ আবেদন করতে হতো। প্রয়োজনে বিচারক নিরপেক্ষ সাক্ষী নিজেই তলব করে নিতেন।

৮। প্রয়োজনে যে কোন মামলার চূড়ান্ত রায়দানকারী ছিলেন খলিফা নিজেই।

৯। বিচার বিভাগেও বিচার পদ্ধতি লক্ষ্য করার জন্য খলিফার গুপ্তচর বিভাগও ছিল। যাতে গরিব মানুষ ন্যায়বিচারে বঞ্চিত না হয় ও বিচারকের পদস্খলন না ঘটে।

পরামর্শদাতা:

সকল দেশেই একটি জিনিস সুপরিচিত যে, কোন অপরাধী আইন জানে না, এ কথা বললে তাকে রেহাই দেওয়া হয় না। আইন জানা তার কর্তব্য, এবং আইন মোতাবেক বিচার করা বিচারকের কর্তব্য। খলিফা ওমর সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্য প্রতিটি শহরে একজন করে আইনের পরামর্শদাতা

নিযুক্ত করলেন। একে বলা হতো 'ইফতা'। অর্থাৎ আইনের পরামর্শদাতা। পদাধিকারীকে বলা হতো 'ফকীহ' বা আইনজ্ঞ। এই পদে খলিফা প্রথমদিকে বিশেষ বিশেষ মানুষদের নিযুক্ত করেছিলেন; ওসমান, আলী, আব্দুর রহমান-বিন-আউফ, মুয়াজ বিন জবল, উবাই বিন কাব, যায়িদ বিন সাবিত, আবু দার্দ, আবু হোরাইরা প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এঁরা সকলেই জনসাধারণকে আইনের পরামর্শ দিতেন। কিন্তু প্রথমদিকে এঁদের ফতোয়া দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না। খলিফাই একমাত্র ফতোয়া দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। পরবর্তীকালে খলিফা জনসাধারণের সুবিধার্থে অনেককেই ফতোয়া দেওয়ার অধিকারও দান করেন। যাঁরা ফতোয়া দিতেন, তাঁদের বলা হতো 'মুফতী'। সে যুগে জনপ্রচারের তেমন কিছু উন্নতমানের ব্যবস্থা না থাকায় মুফতীকে জনসমাবেশে তাঁর ফতোযা জারি করতে হতো। এইভাবে খলিফা জনসাধারণকে নানাভাবেই আইনের সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন।

ফৌজদারী ও পুলিশ :

খলিফা ওমরের সময় ফৌজদারী আদালতও স্থাপিত হয়েছিল। এই বিভাগের প্রাথমিক বিচারের ভার ছিল পুলিশ বিভাগের ওপর। তখন পুলিশ বিভাগকে বলা হতো 'আহদাস'। এই বিভাগের প্রধানকে বলা হতো 'সাহিবুল আহদাস'। এই বিভাগের কাজ মূলত সীমাবদ্ধ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার পর। যাতে অসৎ ও অসাধু ব্যক্তি সমাজে কোন অত্যাচার করতে না পারে। সমাজ যাতে বিশৃঙ্খলায় ভরে না ওঠে। খলিফা ওমর শুধু মানব সমাজের ওপরই তাঁর বিচার বিভাগকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি তীব্র দৃষ্টি রাখতেন—প্রাণী জগৎ ও জীব জন্তুর ওপর। তিনি যদি কখনও শুনতে পেতেন কোন পশু-পক্ষী বা জীব-জন্তুর উপর অহেতুক নির্মম অত্যাচার চালনা হয়েছে, তাঁকেও কঠোর শাস্তি দিতেন। এটা ছিল দ্বীনের নবী মহানবীরই শিক্ষা। একবার খলিফা পথিমধ্যে কোন একটি দুর্বল পিপাসার্ত উটকে কর্মরত অবস্থায় অত্যন্ত প্রহার করতে দেখে রাগে ও ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে মালিককেও সম-প্রহার করে উটটিকে মুক্ত করে দিযে বলেন—"আল্লাহ্ তোমাকে ওর নিকট হতে উপকার নিতে বলেছেন ও গোনাহগার বা পাপী নয়, ও-কে শাস্তি দিতে বলেননি। দ্বীনের নবী সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য করুণা স্বরূপ ছিলেন, যে ভুলে যাবে তাকে আমি শাস্তি দেব।" ২১:১০৭।

জেলখানা দ্বীপান্তর :

খলিফা ওমরের পূর্বে জেলখানা বা দ্বীপান্তর বলে কিছু ছিল না। তিনিই প্রথম সাফওয়ান বিন উমাইয়ার বাসগৃহটিকে চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে প্রথম জেলখানা স্থাপন করেন। পরে ধীরে ধীরে প্রতিটি জেলাতে জেলখানা স্থাপিত হয়। জেলখানা স্থাপিত হওয়ার পর খলিফা কোন কোন পাপের শাস্তিকে কিছুটা লঘু করে দেন। খলিফা বলতেন—শাস্তি দেওয়াটা

জেলে পাঠিয়ে দিয়ে শুদ্ধ হওয়ার সুযোগ দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বিখ্যাত কাদিসিয়ারের যুদ্ধের বীর আবু মাহজান তদানীন্তন যুগের একজন বিখ্যাত কবিও ছিলেন। তিনি বারবার মদ্যপান দোষে বিধৃত হলে খলিফা তাঁকে দীর্ঘদিনের জন্য জেলে পাঠান শুদ্ধার্থে। এমনকি কোন এক সময় কোন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে তাঁকে দ্বীপান্তরও করা হয়েছিল।

স্বয়ং মহানবীর সময় খলিফা ওমর ছিলেন প্রধান বিচারক। তাঁর বিচারকার্যে মহানবী এতই খুশি হয়েছিলেন যে, তাঁকে তিনি 'ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন হতেই তিনি সারা বিশ্বে আজও পর্যন্ত 'ওমর-ফারুক' নামেই পরিচিত। ফারাক শব্দ হতে 'ফারুক' অর্থাৎ পৃথককারী বা ব্যবধানকারী। এটা অভিধানিক অর্থ। পরিভাষাগত অর্থে—ন্যায় ও অন্যায়ের সূক্ষ্ম ও সত্বর এবং সঠিক ব্যবধানকারীকে বলা হয় 'ফারুক'।

হযরত ওমরের শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞানচর্চা পদ্ধতি

কোরআন: * "হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।" ২০ : ১১৪।

* "আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের আলো"। ২৪ : ৩৫।
* "আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।" ২ : ৩২।
* "আল্লাহ্ অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।" ৫ : ১০৯।
* "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। ১৭ : ৩৬।
* "আমার নিকট হতে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছিলাম।" ১৮ : ৬৫।
* "তাদের প্রত্যেককে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম।" ২১ : ৭৯।
* "প্রত্যেক বিষয় তোমার দয়া ও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত আছে।" ৪০ : ৭।

* "প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির ওপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন।" ১২ : ৭৬, ১১১।
* "নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন আছে। ২ : ১৬৪, ২ : ৪৪।
* "তাদের গৃহসমূহ শূন্য পড়ে আছে, এতে জ্ঞানীগণের জন্য নিদর্শন আছে।" ২৭ : ৫২ ।
* "মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।" ২৯ : ৪৩।

কোরআন বলে—'আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের আলো।' মহানবী বলেন—'জ্ঞানই আলো' অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞান পেয়েছে, সে আলো পেয়েছে,

এবং যে আলো পেয়েছে, সে আল্লহ্‌কে পেয়েছে। সুতরাং ইসলামের আল্লহ্‌কেও জ্ঞান ব্যতীত পাওয়া যায় না।

মাগি কাতর প্রাণে করুণা তোমার
বৃদ্ধি কর বিদ্যাবল হে প্রভু আমার। ২০:১১৪

জাতির মহান কাণ্ডারী মহানবী:

মরুচারী আরব, বেদুঈন আরব, অসভ্য আরব, অভাবগ্রস্ত আরব, অনুন্নত আরব যখন অনাচারে-ব্যভিচারে, অত্যাচারে-অবিচারে, কুশিক্ষায়-কুকর্মে সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় ধ্বংসের পথে চরম প্লাবিত ও চূড়ান্তভাবে প্রবাহিত, হেনকালে জাতির কাণ্ডারী মহানবী অশিক্ষায়-কুশিক্ষায় অনুন্নত এই সমস্যা বিজড়িত, দারিদ্রজড়িত বিধ্বস্ত সমাজের জাতীয় তরীটিকে সুন্দরভাবে সুকৌশলে তীরে আনয়ন করলেন। অন্নহীন-বস্ত্রহীন-চিকিৎসাহীন, সভ্যতা ও সংস্কৃতিহীন জাতি তখনও ধুঁকে ধুঁকে মরছে। মহামারী ও মহাপ্লাবনের হাত হতে জাতিকে রুখে দিলেন ও রক্ষা করলেন মহানবী। অতঃপর ইসলামের প্রথম খলিফা জাতিকে এই বিপদসঙ্কুল কিনারা হতে তীরে উত্তোলন করে জাতির বা ইসলামের ত্রাণকর্তা উপাধিতে ভূষিত হলেন। তারপর ইসলামের কাণ্ডারী রূপে দেখা দিলেন—দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক।

খলিফার জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব:

ইসলামের শিক্ষা সত্য ও সুন্দরের পথে সমুন্নত জীবনব্যবস্থা। এটি কেবলমাত্র কতকগুলো ডিগ্রী বা সনদ ধরিয়ে দেওয়া ছিল না। মহানবী বলেন—"জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদের রক্ত অপেক্ষা মূল্যবান। যে জ্ঞানের পথে ভ্রমণ করে, আল্লহ্ তাকে স্বর্গের পথ দেখান। জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্যই কর্তব্য।" ইসলামের মহান শিক্ষা ও মহৎ আদর্শে মানুষকে আকৃষ্ট করা ও মানুষ করা, এটাও ছিল ইসলামি শিক্ষার মূল কথা।

খলিফা ওমর যেন এক নিমিষে অনুধাবন করলেন—এই দেশ ও জাতিকে, এই সমাজ ও তার প্রাচীন সভ্যতাকে একমাত্র বাঁচাতে পারে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো। খলিফা যেন তাঁর দিব্যচোখে দেখতে পেলেন, দিব্যজ্ঞানে বুঝতে পারলেন এক চিরন্তন ও সর্বজনীন শাশ্বত আদর্শের অনুশীলন, উন্নত হতে উন্নততর নৈতিক মূল্যবোধ, বিনীত ব্যবহার, মার্জিত ও উৎকর্ষিত আচরণ এবং সর্বোপরি মানুষের কল্যাণভিত্তিক, সমাজের আদর্শভিত্তিক সুশিক্ষার প্রবর্তন ও প্রচলনই এই জাতিকে একদিন বিশ্বের দরবারে সম্মান ও সম্পদ এবং মর্যাদা এবং মহিমার আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারে। তিনি যেন অক্ষরে অক্ষরে অনুধাবন করলেন মানব সভ্যতার বিকাশে ও প্রকাশে, জাতির ভাগ্য নির্ধারণে, জাতীয় আদর্শের বুনিয়াদ গঠনে, চরিত্র গঠনে, জাতীয় জীবনের,

সমাজ জীবনের উঁচু-নিচু সকল শাখার কোরকে সফল ও সজীব কুঁড়ি ও কমল, ফুল ও ফল ফোটাতে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম ও অসামান্য। প্রকৃতপক্ষে আপন আপন শিক্ষার ধারাতেই রচিত হয় ভাবী জাতীয় সত্তার মূল কাঠামোটি। যে কাঠামোটিতে একদিন গড়ে ওঠে জাতির ব্যক্তি প্রতিভার স্ফূরণ হতে সমষ্টি প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশ, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, মানবপ্রেম, সৃষ্টিপ্রেম, জীবপ্রেম, এককথায় কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণের প্রতিরোধ, সমস্ত কিছুই নির্ভর করে একটি জাতির সুশিক্ষা ও বহুমুখী জ্ঞানচর্চার ওপর। খলিফা বারবার ঘোষণা করেছিলেন—মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা, জ্ঞান-সাধনা-জ্ঞানচর্চাই মানুষকে একদিন আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাশীল করে তার মধ্যে নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলীর যথাযথ উন্মেষ ঘটায়, এবং জ্ঞানের এই উন্মেষই একদিন পাপী-তাপী ও ষড়রিপু পরিচালিত এবং প্রভাবান্বিত মানুষকে শুদ্ধ-শুচিময় গরিমাময়-মহিমাময় ফেরেশতার (দেবতা) ওপরও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। তাই শিক্ষাদরদী খলিফা তাঁর দেশের ও সমাজের সকল স্তরেই শিক্ষার গুরুত্বকেও অপরিহার্যভাবে স্বীকৃতি দান করে সমগ্র দেশ ও জাতিকে শিক্ষানুরাগী করে গড়ে তুলেছিলেন।

তুমি যে সৃষ্টির সেরা শ্রেষ্ঠ গরীয়ান
জ্ঞানে গুণে ফুটে যেন প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বিস্তার:

এইভাবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর জনশিক্ষা প্রচারে, প্রসারে, প্রবর্তনে ও প্রচলনে সর্বশেষ জোর দিলেন; এই বিষয়ে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ, এবং উদ্যম ছিল অপরিসীম। তিনি তাঁর সমগ্র দেশে ও সকল বিজিত রাজ্যে প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জরুরি নির্দেশ দিলেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রথম স্তর বা ভিত রচিত হতো। যেখানে নৈতিক শিক্ষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হতো। এইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথম স্তর হতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরে উন্নীত হতো। এই সমস্ত স্তর হতেই একদিন এমন সব খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই, যে শাখার উর্ধ্বতম শৃঙ্গ তাঁদের নিকট অকপটে ঋণ স্বীকার করে না, (দ্রষ্টব্য আব্বাসীয় খেলাফত —ইসলামের ইতিহাস, সপ্তম খণ্ড)

সমাজে যাঁরা জ্ঞানে-গুণে, আচারে-বিচারে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন, খলিফা তাঁদের মতো ব্যক্তিকেই শিক্ষক নিযুক্ত করার নির্দেশ দিতেন। তিনি শিক্ষকদের উচ্চহারে বেতন দিতেন। কেউ শিক্ষক নিযুক্ত হতে পারলে, নিজকে ধন্য মনে করে গর্ববোধ করতেন। খলিফা শিক্ষা বিভাগের জন্য পৃথক রাজস্ব বিভাগও পরিচালনা করতেন, শিক্ষকদের জন্য পৃথক বৃত্তি তালিকাও ছিল।

মদিনার শিক্ষকগণ মাসে পনেরো দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) বেতন পেতেন। আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ঐ বেতন সত্যিই আকর্ষণীয় ছিল। খলিফা শুধুমাত্র সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে শিক্ষক নিযুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাঁদের যোগ্য মান-মর্যাদাও দিয়ে সমগ্র শিক্ষাজগৎকেই তুলে ধরেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষকের মর্যাদা আজও তাই প্রবাদস্বরূপ।

খলিফার চোখে শিক্ষার সংজ্ঞা:

অচেনা-অজানাকে জানার নাম শিক্ষা। জীবন গড়ার সোপানগুলোকে সুষ্ঠুভাবে জানার নাম শিক্ষা। সকল সমস্যার সমাধানের পদ্ধতিকে জানার নামও শিক্ষা। মানুষ হিসাবে সংসারের সকল দায়-দায়িত্বকে মেনে নিয়ে জীবনকে পূর্ণভাবে গড়ে তোলার নামও শিক্ষা। আসল শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তুলে করে আদর্শভিত্তিক। এই আদর্শভিত্তিক শিক্ষাই একদিন আগামী দিনের বংশধর ও প্রজাতিকে করে তোলে আদর্শ সমাজপতি। যারা একদিন সমাজকে দেয় আগামী দিনের উন্নত ও নতুন পথের সন্ধান। এইভাবে কেবলমাত্র শিক্ষাই সমাজকে করে সুন্দর শোভাময় ও সমৃদ্ধময়। সকল সমাজেই স্বীকৃত—শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, মানুষের মানদণ্ড। মানুষ শুধুমাত্র জীব-জন্তু ও পশুপক্ষীর মতো দেহ সর্বস্বজীব নয়, তার পূর্ণতা দেহ ও আত্মার পূর্ণ বিকাশে ও সমন্বয়ে। ঠিক অনুরূপভাবেই তার জ্ঞান কোনদিনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না কেবল মাত্র জাগতিক জ্ঞান দ্বারা, প্রয়োজন সেখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানও। মানুষের জীবন শুধু ইহকাল-সর্বস্ব খণ্ডিত জীবন নয়, ইহকাল ও পরকালের সমন্বয়ে তাঁর জীবন অখণ্ডময়। এই অখণ্ডময় জীবনের জ্ঞানলাভই মানব জীবনের প্রকৃত ও পূর্ণ শিক্ষা। এতদ্ব্যতীত সব শিক্ষাই আংশিক বা অপূর্ণ। এটাই ছিল খলিফার সাধারণ শিক্ষা সংজ্ঞা। আধ্যাত্মিক কবি ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন অখণ্ডজীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে:

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্তে আনন্দ পায় গিয়ে স্তনান্তরে।[২]

মহানবী প্রবর্তিত ইসলামি শিক্ষার সংজ্ঞা ও মূলনীতি:

১। যে শিক্ষা মানুষকে—স্রষ্টার সাথে, সৃষ্টির সাথে ও মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়তে সাহায্য করে, জ্ঞানদান করে ও শিক্ষা দেয়; তাই-ই ইসলামি-শিক্ষা।

২। এই বিশ্বে দুর্লভ মানব জন্মে মানুষের দুটো প্রধান কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে। একটি স্রষ্টার প্রতি ও অন্যটি সৃষ্টির প্রতি। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্যকে বলা হয়—'হক্‌কুল্লাহ্', অর্থাৎ আল্লহর হক, যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো, যথা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি। অন্যটি 'হককুল খাল্‌ক', অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতি দায়-দায়িত্ব, এটা আবার দু'ভাগে

বিভক্ত, প্রথম ভাগে মানুষ, ও দ্বিতীয় ভাগে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টিকুল। মানুষ মানুষের প্রতি কতটা কর্তব্য বা দায়িত্ব পালন করল, এবং বাকি সৃষ্টিকুলের প্রতি কতটা পালন করল, যে শিক্ষা এই লালনে ও পালনে মানুষকে যথাযথ শিক্ষা দিতে পারে, তাই ইসলামি শিক্ষা।

৩। মহান আল্লাহ্ এই বিশ্বে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের মহান দায়িত্ব দিয়ে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছেন। যে শিক্ষা মানুষকে এই দায়িত্ব পালনে সার্থক ও সফল করতে পেরেছে, তাই ইসলামি শিক্ষা।

৪। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু-প্রাণী বা পদার্থকে মহান আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণেই সৃষ্টি করেছেন। যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ মহান আল্লাহ্‌র এই মহৎ ইচ্ছাকে অনুধাবন করে তার ব্যক্তিজীবনে এর যথার্থ প্রয়োগ করতে পারে, তাই ইসলামি শিক্ষা।

৫। যে শিক্ষা ইসলামি অনুশাসনের মধ্যে থেকেও মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে সততার সাথে সমুন্নত জীবন গঠনে সাহায্য করে, তাই ইসলামি শিক্ষা।

৬। যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ জীবনের সাথে জগতের ও জগতের সাথে জীবনের মধুর সম্পর্কটিকে আবিষ্কার করতে শেখে, সহজ ও সাবলীল করতে শেখে, তাই ইসলামি শিক্ষা।

৭। যে শিক্ষা ইসলামি অনুশাসনকে বাস্তবজীবনের পটভূমিকাতে তার মূল উদ্দেশ্যে ও আন্তরিকতায় উত্তীর্ণ করতে পারে, তাই ইসলামি শিক্ষা।

৮। মানব-জীবন ত্রিস্তরে বিভক্ত—জন্মের পূর্বাধ্যায়, জন্মের পরাধ্যায় ও মৃত্যুর পরাধ্যায়। যে শিক্ষা মানুষকে এই ত্রিস্তর সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সাবলীল জ্ঞানদান করে, তাই ইসলামি শিক্ষা।

৯। পবিত্র কোরআনে বিশ্বজগৎকে-সৃষ্টজগৎকে জানার ও চেনার জন্য জ্ঞানার্জনের পথে কঠিন ও কঠোর গবেষণার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। যে জ্ঞান মানুষকে এই পথের পথিক করতে পারে, তাই ইসলামি শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা।

১০। ইসলামে ইবাদতের (উপাসনার) প্রধানত দুটো পথ;—(১) আনুষ্ঠানিক ইবাদত, যেমন নামাজ-রোজা ইত্যাদি। (২) ব্যবহারিক জীবনে কর্মজাত ইবাদত, যেমন ভাল কাজ, সৎকাজ ইত্যাদি। মহানবী বলেন—'মানুষের প্রতিটি ভাল ও সৎ কাজ এক-একটি উত্তম ইবাদত।' যে শিক্ষা, যে জ্ঞান মানুষকে ভাল কাজে ও সৎপথে উৎসাহিত করে উত্তম ইবাদতে অনুপ্রাণিত করে, তাই ইসলামি শিক্ষা।

১১। এককথায় যে শিক্ষা বিশ্ব-চরাচরকে এক ও অভিন্ন করতে পারে, দেহ ও আত্মার সমন্বয় সাধন করতে পারে, ইহকাল ও পরকালের সমন্বয় করতে পারে, জীবন ও মৃত্যুর সন্ধি ঘটাতে পারে, যে অনুধাবন, যে উপলব্ধি ক্ষুদ্র মানুষকে অনন্তের সাথে অসীমের সাথে ভেদাভেদ শূন্য করে জীবন ও মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে এক ও অভিন্ন করতে পারে, তাই-ই ইসলামি শিক্ষার শেষ সংজ্ঞা।

মহানবী প্রবর্তিত ইসলামের এই শিক্ষা ধারাগুলোকে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক তাঁর আপন দেশ ও বিজিত দেশগুলোর মধ্যে যথাযথভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করলেন। এখন আমরা অতি সহজেই অনুমান করতে পারলাম, বুঝতে পারলাম ইসলামের শিক্ষাধারা মূলত কোন্ নদে-কোন্ মুখে কোন্ উদ্দেশ্যে কোথায় প্রবাহিত।

প্রবাহিত আত্মতীরে যে-জীবননদী
সেই নদীর নব্যরূপ আস্‌রার্-ই-খুদী।

সংসারের নানা অধ্যায়ে শিক্ষা ধারা :

অতঃপর খলিফা তাঁর ইসলামি শিক্ষাধারাকে সংসারের কঠিন পথে কষ্টি পাথরের প্রয়োগে বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তুলে ধরলেন মহাজীবনের দৃঢ় সংকল্পময় প্রত্যয়-সহ।

ধর্মীয় জগতে শিক্ষা :

ইসলামের শিক্ষাধারা সংসারের সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন ও পরিব্যাপ্ত করেছে। এই দিক থেকে ধর্ম ইসলামি জীবন ব্যবস্থার একটি শাখা মাত্র। ইসলামের এই ধর্মকে নিয়ে অনেক অজ্ঞানী ও জ্ঞানপাপী কতই না অকথ্য কথা বলেছেন। তাঁদের কথামতো ইসলাম প্রচার হয়েছিল এক হাতে কোরআন ও অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে। ইসলামের মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন। আমরা এখানে অন্য কারো কথায় কর্ণপাত না করে কেবলমাত্র পবিত্র কোরআন এই সম্পর্কে কি বলে তাই দেখব। "ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই।" ২ : ২৫৬। আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করেছি, যা তারা পালন করে।"২২ : ৬৭। "তারা যাদের বন্দনা করে, তুমি তাদের পূজ্য বস্তু সম্পর্কে দুর্বাক্য বলো না।" ৬ : ১০৮। "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।" ১০৯ : ৬। মহানবী বলেন—"তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।" খলিফা ওমরের আজীবন ব্যক্তিগত সেবক ছিলেন খ্রীস্টান আসতিক। স্বয়ং মহানবীর বিধবাপত্নী বিবি মরিয়ম ছিলেন—খ্রীস্টান মহিলা, এবং বিবি রায়হানা ছিলেন ইহুদি মহিলা। জীবনে কোনদিনই তিনি তাঁদের একবারও ধর্মান্তরিতা হতে বলেননি। জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁরা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মীয় জগতে ইসলামের শিক্ষা এইরূপই উদার ও আদর্শভিত্তিক। খলিফা এর যথাযথ প্রয়োগ করেছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে

যখনই খলিফা ওমর কোথাও সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন, তখনই তিনি সিপাহসালারকে নির্দেশ দিয়েছেন—"অক্ষরে অক্ষরে যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবীর যুদ্ধনীতিকে মেনে চলবে।" মহানবী যুদ্ধক্ষেত্রকে আল্লহর ইবাদতগার বা উপাসনালয় ও বিচারাগারে পরিণত করেছিলেন। খলিফা মহানবীর ঐ শিক্ষাকে অবিচল চিত্তে অটুটভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। বিশ্ববিজয়ের পূর্বে এই বিশ্বমানব কোনদিনই বিশ্বাস করতে পারেনি যে, মাত্র কয়েক হাজার মরুচারী আরব বেদুঈন তদানীন্তন বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তিকে (রোম ও পারস্য) পোড়া ছাইয়ে ফুঁক দেওয়ার মতো বাতাসে বিলীন করে উড়িয়ে দেবে। এই অবিশ্বাস্য জয়ের পেছনেও ছিল ইসলামের অবিশ্বাস্য শিক্ষা। যখন নিরুপায় পারস্য সম্রাট খসরু চীন সম্রাটের সাহায্য চাইলেন, তখন চীন সম্রাট মুসলিমদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন—এমন কোন পাগল আছে যে, ঐ জাতির বিরুদ্ধে লড়তে যাবে। বিখ্যাত কাদিসিয়ারের যুদ্ধে আবু রেজা ফারসীর পিতামহ উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন—"আরবদের তীরগুলোকে আমার মনে হয়েছিল ছুঁচের মতো দুর্বল, পরে লক্ষ্য করলাম ঐ দুর্বল ছুঁচগুলোই বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল।" অনুরূপভাবেই মিশর অভিযানকালে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ কপটদের উপদেশ দিয়েছিলেন—"রোম সাম্রাজ্য নির্বাণলাভ করেছে, তোমরা মুসলিমদের সাথে যোগ দাও।" বিশাল রোম সাম্রাজ্য যেন জীবন্ত একটি নেকড়ের মুখে অচল হস্তীরূপে দেখা দিয়েছিল।

ইসলাম যদি তার শিক্ষা ও আদর্শে বিশ্ব-মানবকে আকৃষ্ট করতে না পারত, তাহলে কতিপয় মরুচারী আরব, যাযাবর আরব, বেদুঈন আরব বিশ্ববিজয়ে সাহসী হতে পারত না। যখনই যে কোন জাতি মুসলমানদের সংস্পর্শে এসেছে, দেখেছে তাদের ন্যায় ও সততা, দেখেছে তাদেব অকৃত্রিমতা ও অকপটতা, দেখেছে তাদের সাধুতা ও সরলতা, দেখেছে তাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার জীবন; সঙ্গে সঙ্গে তারা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। কখনও বা আপ্লুত প্রাণের আবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িযেই ইসলামকে হৃদয়ে বরণ করে জীবনকে করেছে ধন্য। সত্য কথা বলতে এই জয় কোন বীরের তরবারিতে সাধিত হয়নি, এই অসাধ্য কাজ সাধিত হয়েছিল ইসলামের মহান শিক্ষাতে, মহানবীর মহান আদর্শে। সেনাপতিগণ ছিলেন নিমিত্তমাত্র। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মহানবীর যুদ্ধনীতি — 'মহানবী' গ্রন্থের চরিত্রে মহানবী অধ্যায়ের ২২ নং 'সেনাপতি মহানবী ও তাঁর সমর নীতি।') । এইভাবে সমাজ জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই তুলে ধরেছিল ইসলাম তার শিক্ষার আদর্শগত দিকটাকে।

ইসলামি শিক্ষার পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস:

ইসলামি শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শ্রীবৃদ্ধি যা কিছুই গড়ে উঠেছিল, সমস্ত

কিছুর মূলে ছিল পবিত্র কোরআন-চর্চা। এই কোরআন শরীফ হতেই সেদিনের মরুচাবী আরবগণ লাভ করেছিল শত শত সোনার সিন্ধুকের চাবিমালা। তাই কোরআনই ছিল তাদের সবকিছুর মাথার মণি। এবং এই কোরআনকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল তাদের জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, এককথায় সমাজের সকল অধ্যায়েরই বিশ্ববিজয়ী পাঠ্যক্রম। পরবর্তীকালে এই কোরআনকে কেন্দ্র করেই পুণ্যাত্মা খলিফাগণ যুগের প্রয়োজনে, কালের আবর্তনে, সমাজের বিবর্তনে মূল পাঠ্যক্রম পবিত্র কোরাআনের সাথে সুসঙ্গত রেখেই নিম্নরূপে কিছু কিছু সংযোজন ও সম্প্রসারণ করেছিলেন।

১। পবিত্র কোরআন: ইসলামি শিক্ষার মূল ও মৌলিক পাঠ্যক্রম ।

২। পবিত্র হাদিস—মহানবীর বাণী ও সম্মতিমূলক কাজ, এবং তাঁর জীবনধারা।

৩। ফেকাহ্ শাস্ত্র—ইসলামের আইন বা নীতিশাস্ত্র, এটা বিশেষ করে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের অবদান।

৪। কিয়াস—ইসলামের আইনশাস্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টান্তানুযায়ী বিচার করা, অনুমান করা ঐ দুটোকে লক্ষ্য করে। এরও জন্মদাতা হযরত ওমর।

৫। ইজমা—কোরআন ও হাদিসে না মিললে তখন ইজমার (সম্মিলিত মত) ওপর নির্ভর করা হতো। এটা ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকরের সময় প্রচলিত ছিল। তখনও কিয়াসের জন্ম হয়নি।

৬। ইজ্তিহাদ—বিবেকের প্রয়োগ। একবার মহানবী মুয়ায্ বিন জাবলকে ইয়ামেনের গভর্নর করে পাঠান। এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'তুমি কিভাবে বিচার করবে?' তিনি বলেন—'কোরআন হতে।' মহানবী উত্তরে বলেন—"যদি কোরআনে না পাও, তাহলে কি করবে?" উত্তরে তিনি বলেন—"হাদিস হতে।" মহানবী বলেন—"হাদিসেও না মেলে?" উত্তরে তিনি বলেন—"তখন আপন বিবেক হতে।" এই উত্তর শুনে মহানবী আনন্দে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন—"হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে এমন উম্মত (শিষ্য) দিয়েছ, যে তার আপন বিবেকের প্রয়োগ করতে চায়।" এখানে ইসলামের মহানবী মানুষের বিবেককে অতি উচ্চে স্থান দিয়ে সমগ্র মানব সমাজকেই বিবেক-বিবেচনা সম্পর্কে এক মহান শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

ইসলামের মহান খলিফা ওমর দেশ ও জাতিকে কয়েকটি ডিগ্রী বা চমকপ্রদ কিছু উপাধি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কোন শিক্ষার প্রবর্তন করে আপন জাতিকে ধোঁকা দেননি। তিনি মানুষকে মানব সন্তানকে ভাবীকালের জন্য যোগ্য মানুষ

করার নিমিত্তই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম গড়ে তুলেছিলেন। খলিফা ওমরের পাঠ্যক্রম সকল শিক্ষাখাতে পূর্বতন বীজরূপে না রয়ে গেলে আগামী দিনের উমাইয়া যুগে ও আব্বাসীয় যুগের মুসলিম জগতের গগনচুম্বী দিগন্ত বিস্তৃত শিক্ষার সবুজ শালবন সারা বিশ্বকে জ্ঞান-গরিমায় স্তম্ভিত করে দিতে পারত না।

খলিফা ওমরের স্থাপত্য বা পূর্তবিভাগ :

খলিফা ওমরের শাসনামলে উন্নতির যে বিরাট পটভূমিকা আমরা দেখতে পাই, পূর্তবিভাগ তাদের অন্যতম। একথা সহজেই অনুমেয় যে মরুচারী আরব বেদুঈন, যাযাবর জাতি আরবের কোন বিশেষ ঘরবাড়িই ছিল না। আজ এখানে, কাল ওখানে। তাঁবুর পর তাঁবু। বিশেষ কোন স্থানের প্রতি বিশেষ কোন মায়াবন্ধন তাদের নেই। সুতরাং গড়ে ওঠেনি বিশেষ কোন মনোরম শহর। অধিকন্তু তাদের কোন রাজা-বাদশা বলেও কোন কিছুই ছিল না। তাই গড়ে ওঠেনি কোন রাজ-বালাখানা, নামকরা রাজপ্রাসাদ। সবই যেন অস্থায়ী, সবই যেন ক্ষণিকের। স্থায়ী বলতে ছিল যুগ-যুগান্তের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গোষ্ঠীকলহ। এই হতোভাগ্য জাতির জীবনে একদিন মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) এনে দিলেন পূর্তবিভাগ, খলিফা ওমর যার প্রাণপুরুষ। মদিনার মসজিদে-ই-নববী ছিল পূর্তবিভাগের প্রথম ও পবিত্র ধন। এই ধনভাণ্ডারটিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী যুগে গড়ে উঠল এমন একটি পূর্তবিভাগ,, যা সমগ্র বিশ্বকে দান করল কয়েকটি সপ্তমাশ্চর্য, যা আজও বিশ্বের পূর্ত দরবারে অতুলনীয়-অভাবনীয়, যেমন স্পেনের আলহামরা, ভারতের তাজমহল।

"কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

বসরা :

বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামের ইতিহাসে বিশ্ব মানবের সভ্যতার ইতিহাসে, সংস্কৃতির দরবারে, বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্পের দরবারে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের স্থান চির অম্লান চির উন্নত। খলিফা ওমর যে সমস্ত শহরগুলোর জন্ম দিয়েছিলেন—বসরা, কুফা, ফুস্তাত, মুসাল, জাযিরা, প্রভৃতি তাদের অন্যতম।

ওমরের চরিত্রে কয়েকটি জিনিস খুবই লক্ষনীয় ছিল, তার মধ্যে অনাক্রমণাত্মক মনোভাব একটি। মহানবীর পদাঙ্কানুসরণকারী ওমর তাঁর জীবনে আক্রমণকে অতীব ঘৃণা করতেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতির নিরাপত্তাকেও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই দেখতেন। এই নিরাপত্তার কারণেই একদিন গড়ে উঠেছিল বসরা নগর। পারস্য ও ভারতের জলজাহাজগুলো পারস্য উপসাগর বেয়ে আবালাহ বন্দরে নঙর করতো। যেখান হতে আরবকে আক্রমণের আশঙ্কা সবসময়ই দেখা

যেত। খলিফা ওমর এই ভাবী আক্রমণকে প্রতিরোধ করার নিমিত্ত ১৪ হিজরীতে (৬৩৬ খ্রীঃ) উৎবা-বিন খানওয়ানকে ঐ বন্দর হতে অনতিদূরে একটি শহর গড়ে তুলতে নির্দেশ দিলেন। তখন ঐ স্থানটি ছিল কঙ্করময় মুক্ত প্রান্তর, কোথাও কিছু কিছু পানির সংস্থান, কোথাও চারণভূমি। এ দুটোই ছিল আরব চরিত্রের আকর্ষণীয় বস্তু।

খলিফা ওমর নিজ হাতে শহরের ম্যাপ ও যাবতীয় পরিকল্পনা তৈরি করে দেন। কিভাবে বাড়িঘরগুলো তৈরি হবে, কোথায় কোন গোত্র বসবাস করবে, কোথায় জামে-মসজিদ ও সরকারি দপ্তরখানা তৈরি হবে। এ সবই ছিল খলিফার চিন্তাপ্রসূত বস্তু। প্রথম দিকে রাস্তা-ঘাট-ঘরবাড়ি সবই ছিল কাঁচা মাটির তৈরি। কিন্তু ১৭ হিজরীতে যখন এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শহরটির অত্যন্ত ক্ষতি হল, তখন খলিফার নির্দেশবলেই পাকা বাড়িঘর প্রস্তুত করতে থাকল। কিন্তু কাউকেই বিশালাকারে বাড়িঘর প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। দজলা (তাইগ্রিস) নদী বসরা হতে বেশ কিছু দূরে অবস্থান করত, খলিফার নির্দেশে একটি খাল যোগে শহরের সাথে তার যোগাযোগ রক্ষা করে শহরবাসীদের জলকষ্ট দূর করা হয়। পরবর্তীকালে এই শহর ইসলামের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্বনামধন্য খলিল বসরী কর্তৃক এখানেই প্রথম আরবী অভিধান 'কিতাবুল-আইন' রচিত হয়, আরবী ছন্দ ও সঙ্গীতচর্চার প্রথম জন্ম দেয় বসরা নগর। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম আবু হানিফা এই শহরেই জন্মগ্রহণ করে হানাফী মজহাবের সৃষ্টি করেন। তাঁর দুই স্বনামধন্য শিষ্য আবু ইউসুফ ও ইমাম মহম্মদ এবং আরো বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি তাঁদের অভ্রান্ত জ্ঞানচর্চায় এই শহরকে অলঙ্কৃত করে গেছেন।

আরবী 'বসরা' শব্দের অর্থ কঙ্কর বা কাঁকর মাটি। স্থানটি ছিল কঙ্করময়, তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই ওখানে গড়ে ওঠা শহরটির নাম করণ হল—বসরা। ঐ শহরের এক লক্ষ শহরবাসী সৈনিক হিসাবে তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করেছিলেন। খলিফা ওমরের তৈরি বসরা আজও উন্নত শিরে বিদ্যমান।

কুফা :

১৭ হিজরীতে (৬৩৯ খ্রীঃ) কুফা শহরের জন্ম। জন্ম-ইতিহাসের অন্তরালে দেখতে পাওয়া যায়, পারস্যের মনোরম শহর রাজধানী মাদায়েন অধিকৃত হল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আরব সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যে ভাঙন দেখা দিল। কেননা ওখানকার আবহাওয়া বা জলবায়ু আরবদের পক্ষে অনুকূল ছিল না। সেনাপতি সাদ-বিন-ওক্কাস খলিফাকে এই কথা অবগত করার পর খলিফা হুদায়ফা ও সালমন নামক দুই বিজ্ঞ ব্যক্তিকে একটি শহরের পত্তনের নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর স্থান নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন। হুদায়ফা ও সালমন ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী হতে দু'মাইল দূরে একটি বালু ও কঙ্করময় স্থানকে নির্বাচিত করে

খলিফাকে অবগত করলে খলিফা ঐ স্থানটিতে আজকের 'কুফা' শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। স্থানটিতে প্রচুর আরবী ফুল ফুটত। তাই আরবরা তাকে অতি আদরের সাথে 'খাদ-উল-আয্‌রা' (প্রেমিকার গণ্ডদেশ) বলে অভিহিত করত।

এই শহরটিতে কমবেশি চল্লিশ হাজার কাঁচা মাটির বাসগৃহ তৈরি হয়। বসরার মতো এই শহরটিকেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত করা হয়। খলিফা সমস্ত পরিকল্পনা স্বচক্ষে দেখে স্বহস্তে সম্পাদন করতেন। বড় রাস্তাগুলো চল্লিশ হাত চওড়া, দ্বিতীয় শ্রেণীরগুলো ছিল ত্রিশ হাত, তৃতীয় শ্রেণীর কুড়ি হাত ও গলি রাস্তাগুলো ছিল সাত হাত চওড়া। খলিফার নির্দেশক্রমে একটি উঁচু টিলার ওপর নির্মিত হয়েছিল—জামে-মসজিদ, যেখানে এক সাথে চল্লিশ হাজার মুসল্লী বা নামাজী নামাজ আদায় করতে পারতেন। মসজিদের সম্মুখভাগে যাতে আরো বহু মানুষ সভা-সমিতিতে যোগদান করতে পারে, তার জন্য একশো গজ লম্বা একটি আটচালা আকারের মণ্ডপ তৈরি হয়। এই মণ্ডপ হতে মাত্র একশো গজ দূরে জামে-মসজিদ-সন্নিকটে তৈরি হয়—রাষ্ট্রীয় ভবন। পাশে ছিল বিশাল এক অতিথিশালা। এই অতিথিশালার ব্যয়ভার সরকার বহন করত। সাতশো বছর পরও দূর অতীতের নীরব সাক্ষী রূপে কুফার এই রাষ্ট্রীয় ভবনটির অস্তিত্ব বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার সজাগ দৃষ্টি এড়ায়নি।

এই শহরটিতে সর্বমোট কুড়ি থেকে পঁচিশ গোত্রের অধিবাসীদের বসবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাঁদের মধ্যে আরবরাই ছিলেন প্রধান। খলিফার জীবিতকালেই কুফা নানা দিক থেকে এতই সমৃদ্ধি লাভ করে যে, তার গুরুত্ব ইসলামের ইতিহাসে তখন হতে আজও পর্যন্ত লক্ষ্যণীয় বস্তু।

ফুস্‌তাত :

ফুস্‌তাত শব্দের অর্থ তাঁবু, একটি তাঁবুকে কেন্দ্র করে এই শহরের নামকরণ ও উৎপত্তি। সেনাপতি আমর-বিন-আস আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্যে অভিযান কালে পথিমধ্যে কসর-উল-সামা নামক স্থানে তাঁবু ফেলেন। পরে যাত্রা কালে লক্ষ্য করেন তাবুঁতে একটি কবুতর বাসা বেঁধেছে। তখন তিনি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন—তাঁবুটিকে অক্ষত রাখতে, যাতে অতিথির (কবুতর) কোন অসুবিধা না হয়। পরে খলিফার অনুমতিক্রমে ঐ তাঁবুটিকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একদিনের ইতিহাস বিখ্যাত ফুস্‌তাত শহর। গড়ে উঠল কয়েক হাজার কাঁচা ঘর, বহু রাস্তাঘাট, জামে-মসজিদ, রাষ্ট্রীয় ভবন ইত্যাদি। তখন ছিল ২১ হিজরীর (৬৪৩ খ্রীঃ) শেষ ভাগ।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আজেকজান্দ্রিয়ার স্থলাভিষিক্ত হল ফুস্‌তাত। মিশরের

প্রাণকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠল বিশাল শহর ফুস্‌তাত। আলেকজান্দ্রিয়া হারাল তার অতীতের গৌরব ও বর্তমানের নাম-যশ। এই শহরটি পাশ্চাত্ত্যের ধনাগার ও ইসলামের গৌরব। এখানকার মসজিদে এত বেশি সংখ্যক আলেমের সমাবেশ, যা পৃথিবীর অন্য কোন মসজিদে লক্ষ্য করা যায় না। এখানে বন্দরের এত বেশি জাহাজের সমাগম যা অন্য কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। যদিও তখন পৃথিবীর স্বর্গপুরী বাগদাদ (১০৪৩ খ্রীঃ) পুরাদমে প্রতিষ্ঠিত। ফুস্‌তাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বহু বর্ণনাকারী বহু বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কারো হাতে বাড়িঘরের অপূর্ব বর্ণনা, কোথাও রাস্তাঘাটের চমকপ্রদ কাহিনী, কোথাও রাষ্ট্রীয় ভবনের জামে-মসজিদের স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব কলাকৌশল পাঠক চিত্তকে অভিভূত করে তোলে।

মুসাল :

মুসাল একটি প্রাচীন শহর। কিন্তু খলিফা ওমরের সময় তাঁর শহর বলতে বা বোঝাতে আর কোন কিছুই বাকি ছিল না। বড় জোর তখন তাকে একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বলা যায়। একটি পড়ো গির্জা, একটি অরক্ষিত অবলুপ্তপ্রায় দুর্গ, ও একটি ভগ্নপ্রায় মঠ দূর অতীতের সকরুণ ইতিহাসের মৃতপ্রায় সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে ছিল। খলিফা ওমর স্থানটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই হারসামা-বিন-আরফজাকে ঐ মৃতপ্রায় শহরটিতে পুনরায় প্রাণ সঞ্চারে নির্দেশ দিলেন। স্থানটির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত ভৌগোলিক ইয়াকুত হামবী বলেন—"পৃথিবীতে তিনটি শহর আছে, নিশাপুর প্রাচ্যের প্রবেশদ্বার, দামেস্ক পাশ্চাত্যের প্রবেশদ্বার, এবং মুসাল পাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনপথ। যদি কেউ পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে চায় তাকে মুসালের ধূলি ধারণ করতেই হবে।" এই কারণে শহরটির রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পরবর্তীকালে মুসাল ইসলাম জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের গৌরব অর্জন করে।

জাজিরা :

ফুস্‌তাত শহরটি নীলনদের যেপারে, জাজিরা ঠিক তার বিপরীত পারে অবস্থিত। শহর আলেকজান্দ্রিয়াকে রাজধানী রূপে পরিত্যক্ত করার পর মুসলমানদের জন্য নদীর ঐ পারটি অরক্ষিত ও বিপদজনক হয়ে ওঠে। তখন ওখানে রোমানদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্যই খলিফা সেনাপতি আমরকে নির্দেশ দিলেন একটি সুদৃঢ় কেল্লা বা দুর্গ নির্মাণের জন্য। কয়েক বছরের মধ্যেই এই দুর্গটিকে কেন্দ্র করে একটি শহর গড়ে ওঠে, যার নাম জাজিরা। কালক্রমে এই জাজিরাই ইসলামধর্মের শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই জাজিরা বহু জগদ্বিখ্যাত আলেমের জন্মভূমির গৌরব অর্জন করেছিল। বিশ্ব-সভ্যতায়, বিশ্ব জ্ঞান-গরিমায় জাজিরা কত যে- মনীষাকে দান করেছিল, সে সম্পর্কে কালজয়ী গ্রন্থ "মুজমা-উল-বুলদান" মহাকালের চির নীরব সাক্ষী।

মসজিদ :

হযরত ওমরের যুগ ইসলামের স্বর্ণযুগ। এই স্বর্ণযুগকে খলিফার যে কয়েকটি কাজ মহিমামণ্ডিত ও গৌরবান্বিত করেছিল, মসজিদ তাদের অন্যতম। স্বনামধন্য মুহাদ্দিস জামালুদ্দীন তাঁর 'রওযাতুল-আহবাব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে হযরত ওমরের খেলাফতকালে চার হাজার মসজিদ নির্মিত হয়। প্রতিটি সেনাবাহিনীকে তিনি কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন যুদ্ধক্ষেত্র যেন আল্লাহর উপসনালয় ও মানুষের বিচারালয়ে পরিণত হয়। প্রতিটি সেনাপতি এই নির্দেশ মানতে বাধ্য ছিলেন। যার ফলে মসজিদ প্রকল্পের স্বর্ণযুগ দেখা দিয়েছিল।

পবিত্র কাবা :

ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হজের মৌসুমে হাজীগণের সমাগমও বহু গুণে বেড়ে যেতে থাকায় কাবাগৃহের আয়তন নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হলে খলিফা ওমর কাবা গৃহের চারিদিকের গৃহগুলো ক্রয় করে তার আয়তন বৃদ্ধিতে মনোসংযোগ করেন। এইভাবে কাবার আয়তনকে তিনি বহু গুণে বাড়িয়ে তোলেন। এবং ঐ বর্ধিত এলাকাকে প্রাচীর যোগে সংরক্ষিত এলাকায় পরিণত করেন। রাত্রিকালে যাতে এ সমস্ত এলাকা অন্ধকার না থাকে, তার জন্য আলোর বন্দোবস্ত করেন। অতি প্রাচীনকাল হতেই কাবাগৃহটি মূল্যবান কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত থাকত। তখনকার দিনে 'নৃতা' নামক বস্ত্রে ঐ আচ্ছাদনটি প্রস্তুত করা হতো। খলিফা ওমরের সময় হতে মিশরের 'কাবাতি' নামক এক প্রকার মূল্যবান কাপড় দ্বারা গিলাফ-ই-কাবা তৈরি হতে আরম্ভ হল। আজও ঐ গৌরবময় কাজটি মিশরের হাতছাড়া হয়নি।

মসজিদ-ই-নববী :

অনুরূপভাবে মসজিদ-ই-নববীও খলিফা ওমরের দ্বারা বর্ধিত ও সুসংস্কৃত হয়। খলিফা ওমরের সময় মদিনার জনসংখ্যা বহু গুণে বেড়ে যাওয়ায় মসজিদের আয়তন বৃদ্ধিরও প্রয়োজন দেখা দিলে খলিফা ১৭ হিজরীতে মসজিদের চারিপাশের বাড়িগুলো ক্রয়মূল্যে অধিগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে জনৈক আব্বাস নামক এক ব্যক্তি খলিফার বিরুদ্ধে ওবাই বিন কাবের আদালতে মামলা দায়ের করলে খলিফা আদালতের বিচারে হেরে যান। পরিশেষে আব্বাস খলিফার সৎ উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করে আপন বাড়িটিকে মসজিদের জন্য দান করলে মসজিদটি দৈর্ঘ্যে একশো গজ হতে একশো চল্লিশ গজ হয়, প্রস্থও কুড়ি গজ বেড়ে যায়। তবে মহানবীর সময় মসজিদের যে কাঠামোটি ছিল, তার বিশেষ কোন তারতম্য করতে দেওয়া হয়নি। এতদ্ব্যতীত খলিফা মসজিদে আলো ও সুগন্ধীর স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। খলিফা ওমরের সময় পর্যন্তও মদিনার মসজিদে কোন মূল্যবান কার্পেট বা গালিচার প্রচলন ছিল না। সাধারণ মাদুরই যথেষ্ট ছিল। খলিফা এই সাধারণ মাদুরে বসে প্রদীপ জ্বেলে তাঁর রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

রাস্তাঘাট ও কূপ খনন:

খলিফা ওমরের সময় বহু দেশ রাজ্য জয় হয়েছিল, তাঁর সৈনিকগণ দেশের মাটিকে জয় করেছিলেন বাহুবলে, এবং তিনি দেশের মানুষের মনকে জয় করেছিলেন আপন কর্ম বলে। তিনি যে দেশকেই জয় করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মানুষের সুখ-সুবিধার দিকে চরমভাবে মনোসংযোগ করেছিলেন। খলিফা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করতেন রাস্তাঘাট ও কূপ। রাস্তা বিহীন অঞ্চলগুলোকে তিনি জঙ্গল সদৃশ মনে করতেন। খলিফা ১৭ হিজরীতে (৬৩৯ খ্রীঃ) মক্কা গমন করত মক্কা ও মদিনার ২৭০ মাইল পথকে উত্তমভাবে প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দেন, এবং পথিপার্শ্বে পথিকগণের সুবিধার জন্য কূপ খনন ও সরাইখানার ব্যবস্থাও করেন। খলিফার দৃষ্টি ছিল সর্বময় ও সার্বিক উন্নতির দিকে তৎপরময় পদক্ষেপ।

খাল-খনন:

কৃষি-ব্যবসা ও পানীয় জলের সুবিধার জন্য খলিফা প্রচুর ছোট-বড় খাল বা ক্যানেল খননের জন্য নির্দেশ দেন। আবু মুসার নির্দেশক্রমে মাকাল-বিন-ইয়াসার দজলা নদী হতে নয় মাইল খাল খনন করে বসরাবাসীদের জলকষ্ট নিবারণ করেন। কুফার শাসক সাদ অনুরূপভাবে খাল যোগে অনারববাসীদের বহুদিনের পানির কষ্ট দূর করেন। খলিফার যুগে সর্বাপেক্ষা ঐতিহাসিক খাল—সুয়েজ খাল। ১৮ হিজরীতে আরবে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে খলিফার নির্দেশক্রমে মিশরের নীলনদ হতে লোহিত সাগর পর্যন্ত একটি সত্তর মাইল খাল খনন করে আরব-দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করা হয়। এইভাবে নানা খাল সংযোগে দেশের কৃষি ব্যবস্থা, ব্যবসা ও পানীয় জলের চরম উন্নতি সাধিত হয়।

খলিফা ওমরের যুগে আজকের দিনের মতো গালভরা নামকরণ 'পূর্তবিভাগ বলে তেমন কিছু ছিল না। তবে দেশবাসীর নিকট তাঁর ঐ কাজগুলো ছিল বড়ই প্রাণভরা। এখানেই ছিল ওমরের কৃতিত্ব।

খলিফা ওমরের খেলাফতে জিম্মি, জিজিয়া ও দাস-দাসী:

কোরআন: সমগ্র মানবমণ্ডলী সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বারবার ঘোষণা করেছে—"মানব জাতির মূলে ছিল একটি সম্প্রদায়।" ২:২১৩, ১০:১৯, ১১:১১৮, ১৬:১৩, ২১:৯২, ২৩:৫২।

যখনই নিবিড় প্রাণে নিখিলেরে ছুঁই
দেখি না মানব শিশু এক ভিন্ন দুই।
ইসলামের মূলমন্ত্র করিলে মন্থন্
একই পিতার পুণ্যে মোরা ভাই বোন।
কোরআন-হাদিস মূলে শিক্ষা যেটি পাই
একই মায়ের কোলে মোরা ভাই ভাই।

হাদিস :

"আজকের দিনে আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার বা মানুষের সর্বাপেক্ষা ভাল প্রিয় কাজ—একটি দাস বা দাসীকে আজাদ বা মুক্ত করে দেওয়া।"

—মহানবী (সাঃ)

এই হাদিসটি হতে দাস-দাসীদের মুক্তির ব্যাপারে অসংখ্য মুসলিম নরনারী পেল অফুরন্ত অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও অকৃত্রিম উদ্দীপনা। এইভাবে মহানবীর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত একটি মাত্র বাণীর দ্বারা অসংখ্য দাস-দাসী পেল অভাবনীয় মুক্তির স্বাদ। বিশ্ব ইতিহাসে দলে দলে এ হেন মানব-মুক্তি মহানবীর পূর্বে নজিরবিহীন ঘটনা ও দৃষ্টান্তবিহীন উপমা। মহানবীর এই একটি মাত্র বাণী সেদিন বিশ্ব-সমাজে বিশ্ব ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দিয়েছে।

মানবতার কাণ্ডারী মহানবী :

ইসলামই প্রথম দাস-মুক্তি আন্দোলনের জন্মদাতা। সমগ্র পৃথিবীর অত্যাচারিত ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি মহানবীর স্নেহ-মায়া-মমতার কোন শেষ ছিল না। মানুষের মনুষ্যত্বের উত্তরণে তাঁর প্রচেষ্টার কোন শেষ ছিল না। সমগ্র মানবমণ্ডলীকে একটি বাঁধনে বাঁধতে তার ইচ্ছার কোন অবধি ছিল না। পরবর্তী যুগে তাঁর অকৃত্রিম চার খলিফার তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের কোন শেষ ছিল না। একটি দুটি দেশ নয়, সারা বিশ্বজুড়ে মানবতা যখন মৃতপ্রায়, মনুষ্যত্ব যখন পশুত্বকেও হার মানাচ্ছে, তখনই এলেন মহানবী, মানবতার দুর্জয় সাধক ও মনুষ্যত্বের মহান কাণ্ডারী। ইসলামের প্রথম দাস-মানুষের মুক্তিদাতা।

হে সম্রাট নবী
হে বিশ্ব রবি
বিশ্ব-জোড়া মানবতার রুখে দিয়ে মৃত্যুবাণ—
মরণমুখী মনুষ্যত্বে সঞ্চারিলে বীরের প্রাণ।

ইসলামের আগমন ও অভ্যুত্থানের পূর্বে এই পৃথিবীতে দুটো মহাশক্তি বিরাজ করছিল—রোম ও ইরান। এদের অধীনে যত জিম্মি ও দাস ছিল, তাদের সকরুণ অবস্থা তুলে ধরা এক অসম্ভব ব্যাপার। এই মানব সমাজেই চলছিল—এক অচিন্ত্যনীয় ঘটনা, অভাবনীয় কাহিনী, লোমহর্ষক বিবরণ। ইসলামের মহানবী এসেছিলেন মানব সমাজে এই জঘন্যতম প্রথাকে রহিত করতে, কোন সাম্রাজ্য গড়তেও নয়, ভাঙতেও নয়। গড়তে এসেছিলেন মানবতার সাম্রাজ্য ও মনুষ্যত্বের রাজ্য।

দেখিয়াছ ঘৃণাভরে রাজ্য ভাঙাগড়া
দেখনি মানুষ, তার মনুষ্যত্ব ছাড়া।

ওমরের বক্তব্য :

মহানবী ইসলাম সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, দুটি জিনিসের দ্বারা—একটি সাম্য ও অন্যটি ভ্রাতৃত্ব। এই দুটোই ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের

আসমান ও জমিনস্বরূপ। ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রাণ ছিল মানবতা ও মনুষ্যত্ব, এবং যার দেহ ছিল—জাগতিক ঐশ্বর্যমালা। ইসলামি সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের সময় হতে। সূচনা যার আবুবকরে, সমাপ্তি তার ওমরে না হলেও, প্রকৃত ইসলামি সাম্রাজ্য খলিফা ওমরেব দ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপরও সাম্রাজ্য বহু গুণে বিস্তার লাভ করেছে, কিন্তু তাকে ইসলামি সাম্রাজ্য বলা যাবে না, তাকে বলতে হবে মুসলিম সাম্রাজ্য।

খলিফা ওমর খেলাফতে সমাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহানবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঘোষণা করলেন—তিনটি জিনিস ও মূলনীতিকে সম্মুখে রেখে ইসলামি সাম্রাজ্য পরিচালিত হবে আপন দুর্বার লক্ষ্যে—(১) ঈমান (এক আল্লাহ্ বা মহাসত্যে বিশ্বাস), (২) ইনসাফ (ন্যায় বিচার), (৩) ইন্‌সানিয়াৎ (মনুষ্যত্ব-মানবতা), যেখানে বিজিত-বিজেতা, স্বধর্মী-বিধর্মী, স্বদেশী-বিদেশী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, প্রভু ও দাসের মধ্যে মানুষ হিসাবে কোন রূপ পার্থক্যই থাকবে না। মানুষ কোনদিনই কোন মানুষের দাস হতে পারে না, সে একমাত্র আল্লাহর দাস। মালিক শুধু আল্লাহ্।

অতঃপর আমরা লক্ষ্য করবো খলিফা ওমর তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত বিজিত দেশগুলোতে তাঁর বক্তব্যকে কতখানি সেখানকার জনগণের জন্য বাস্তবায়ন করলেন। ১৫ হিজরী (৬৩৭ খ্রীঃ) জেরুজালেমের পতন বিশ্ব ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। খলিফা ওমর এই পতনের পর যে সন্ধিপত্রটি সেখানকার দেশবাসীর জন্য স্বহস্তে লিখে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন, ঐ সন্ধিপত্রটি হতেই আমরা সম্যকভাবেই বুঝতে সক্ষম হবো খলিফা ওমর বিজিত দেশগুলোর জিম্মি অধিবাসীদের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন ও তাদেরকে কোন্ চোখে দেখতেন। (জের= স্থান + সালেম = শান্তি = শান্তিনিকেতন)।

"আল্লাহর বান্দা, আমিরুল-মোমেনিন, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর, আইলিয়ার (স্থানীয় নাম) সমস্ত অধিবাসীবৃন্দকে এরূপ আশ্রয় দান করছেন; এই আশ্রয় হবে তাদের জান-মালের, তাদের গির্জা ও ক্রুশসমূহের, তাদের শিশু ও স্বাস্থ্যবানদের জন্য। তাদের গির্জাসমূহ অন্য কারো প্রার্থনাগার বা বাসগৃহ রূপে ব্যবহৃত হবে না, সেগুলোকে ধ্বংস করা হবে না, তাদের কোন অংশের আঙিনার বা ক্রুশসমূহের কোনরূপ ক্ষতি করা হবে না। তাদের কোন সম্পত্তি জবর দখল করা হবে না। ধর্ম বিষয়ে তাদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপ জবরদস্তি করা হবে না, কিংবা ধর্মকে শিখণ্ডি করে তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না। ইহুদি ও রোমকগণকে আইলাবাসীদের সাথে বসবাস করতে বাধ্য করা হবে না। আইলাবাসীগণ জিজিয়া দিতে ও ওদেরকে শহর হতে বহিষ্কার করতে অঙ্গীকার করছে।

যে সমস্ত রোমক ও ইহুদিগণ শহর ত্যাগ করবে, তারা কোন নিরাপদ স্থানে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সমস্ত কিছুই নিরাপদ থাকবে। ওদের মধ্যে যদি কেউ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দিয়ে শহরে বসবাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাকেও শহর হতে বিতাড়িত করা হবে না। অধিকন্তু যদি কোন আইলাবাসীও রোমকদের সাথে শহর ত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতে চায়, তাকে বাধা দেওয়াও হবে না। বরং তারও নিরাপত্তা থাকবে, যতক্ষণ না সে কোন নিরাপদ স্থানে উপনীত না হবে। এতদ্বারা যা কিছু লিখিত হল, সে সবই আল্লাহর নিকট দেওয়া অঙ্গীকারে, এবং তাঁর রসুলের খলিফাদের ও মুসলমানদের দায়িত্বে দেওয়া হল, যতক্ষণ আইলাবাসীগণ জিজিয়া আদায় দেবে।” এই ঐতিহাসিক সন্ধিপত্রে সাক্ষী ছিলেন—খালিদ-বিন-অলিদ, আমর-বিন-আস, আব্দুর-রহমান-বিন-আউফ, এবং মুয়াবিয়া বিন-আবু সুফিয়ান। মহানবী মদিনাতে খ্রীস্টান ও ইহুদিদের আশ্রয়দানের জন্য যে সনদ দান করেছিলেন, খলিফা ওমরের দেওয়া এই সনদটি ছিল তারই প্রতিচ্ছবি।

হযরত ওমরের জীবনে কেবলমাত্র এই একটিই সন্ধি ঘটেনি, বহু সন্ধি ঘটেছে, যেমন জুরজানের সন্ধি, আজারবাইজানের সন্ধি, মুকানের সন্ধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম। এই সমস্ত সন্ধিপত্র হতে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি জিম্মি বা বিধর্মীদের ধন-প্রাণ, ধর্মমত, ধর্মস্থান, ধর্মচিহ্ন, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মানুষ্ঠান, ঘণ্টা বাজানো, শোভাযাত্রা, ক্রুশ বহন, ধর্মীয় মেলা, তীর্থ দর্শন ইত্যাদি কতখানি নিরাপদে মর্যাদার সাথে, সসম্মানে ও স্বগৌরবে রক্ষিত ও পালিত হতো। ইসলাম বিজয়ের পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মযাজক মহামান্য বেনজামিন রোমানদের অত্যাচারে ও ভয়ে সুদীর্ঘ তেরো বছর বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকার পর ২০ হিজরীতে (৬৪২ খ্রীঃ) আমর-বিন-আস কর্তৃক মিশর বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নির্ভয়ে ও সসম্মানে আপন লুপ্তপদে ধর্মীয় যাজকতায় প্রতিষ্ঠিত হন। এতদ্ব্যতীত খলিফার ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি, তিনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কেমন ব্যবহার করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত একজন কর্মচারী ছিলেন, যাঁর নাম আতিক, জাতিতে খ্রীস্টান। কিন্তু খলিফা সমগ্র জীবনে তাঁকে একবারও ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেননি, বা তাড়িয়েও দেননি। বিজিতের প্রতি বিজেতা কর্তৃক এতখানি ন্যায়পরায়ণতা, এতখানি উদারতা, এতখানি সম্মান প্রদর্শন, এতখানি আস্থা, এতখানি সহনশীলতা ও সহ-অবস্থান বিশ্ব-রাজা-বাদশার দরবারে আর দ্বিতীয়টি আছে কি? জিম্মিদের প্রতি ওমর ছিলেন সেই অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

খলিফা ওমর শুধু সনদ-বক্তৃতা বা ভাষণ দিয়েই তাঁর মহান কর্তব্য শেষ করেননি। মহানবীর ন্যায় তিনিও জীবনে এমন কথা বলতেন না, যা কাজে প্রয়োগ করতে পারতেন না। আচারে-বিচারে, আইনে-আদালতে, সভা-সমিতিতে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে সকল কিছুতেই তিনি জিম্মিদের সাধারণ

মানুষের সম-মর্যাদা দান করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভাধর ইমাম শাফী বলেন—"বকর-বিন-ওয়াইন-গোত্রের একজন মুসলমান একজন খ্রীস্টান জিম্মিকে হত্যা করলে খলিফা ওমরের বিচারে খুনী মুসলমানকে মৃত জিম্মির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণ করা হয় এবং জিম্মিগণ তাকে হত্যার বদলে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" তিনি আরো বলেন—"কোন জিম্মিকেই তার ভূমি হতে কখনও বেদখল করা হতো না। এবং তাদের প্রতি ভূমিকর ও অন্যান্য সাধারণ ও স্বাধীন মানুষের মতোই ছিল। শাসন বিষয়েও তাদের মতামত গ্রহণ করা হতো, তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে তাদের মতামতই প্রাধান্য পেত। ওমরের খেলাফতকালে তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত স্থানেই ঐ একই নীতি অনুসৃত হতো।" সিরিয়ার জনৈক জিম্মি চাষীর খেত একবার সেনাবাহিনী কিছুটা নষ্ট করলে খলিফা তাকে দশ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন। একবার সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে খলিফা একজন জিম্মির প্রতি অত্যাচারের কথা জানতে পারলে তার কারণ নির্দেশ করে জানতে পারলেন—সে জিজিয়া দিতে পারেনি বা দেয়নি, খলিফা তৎক্ষণাৎ তার জিজিয়া মাফ করে দেন।

খলিফা ওমর তাঁর অন্তিম শয়নেও উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন—"আমার পর যিনি ইসলামের বা রসূলের খেলাফতে বসবেন, তিনি যেন জিম্মি ও তাঁর আশ্রিত জনগণের প্রতি তাঁর দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাদের যেন আক্রমণ ও অত্যাচার হতে রক্ষা করেন, এবং তাদের ওপর যেন কষ্টকর বা সাধ্যাতীত কোন কর অর্পণ না করেন।"

এহেন পুণ্যাত্মা খলিফা ওমরের কাজের মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য না করেই কিছু কিছু বিদেশী ঐতিহাসিক অন্ধের মতো ঈর্ষা ও বিদ্বেষবশত, জ্ঞানের স্বল্পতাবশত খলিফার প্রতি দোষারোপ করেছেন। তাঁদের দোষারোপগুলো—

১। খলিফা ওমর জিম্মিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন—তারা মুসলমানদের পোশাক পরতে পাবে না।

২। তাদের কোমরবন্ধ ও লম্বা টুপি পরতে হবে।

৩। তারা নতুন গির্জা গড়তে, ঘণ্টা বাজাতে ও ক্রশ বহন করতে পারবে না।

৪। বনি তগালিব গোত্র তাদের সন্তানদের খ্রীটান ধর্মে দীক্ষিত করতে পারবে না।

৫। আরব ভূমি হতে খ্রীস্টান ও ইহুদিদের বিতাড়িত করেছিলেন।

উত্তর—

১। খলিফা ওমর জিম্মিদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তাদের বাধ্য করা হবে না মুসলমাদের পোশাক পরতে, তারা স্বাধীনভাবে তাদের জাতীয় পোশাক পরতে পাবে। এতে কেউ কোনরূপ বাধা দিতে পারবে

না। জিজ্ঞাসা করি জ্ঞানপাপী ইংরেজ লেখকদের, এটা মানুষের উদারতা, না অনুদারতা?

২। জিম্মিগণ কোমরবন্ধ ও লম্বা টুপি পরতে খুবই ভালবাসত, খলিফা তাদের অবাধ অনুমতি দিয়েছিলেন ঐগুলো ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে। এর নাম বাধ্য করা নয়।

৩। খলিফা সারা সাম্রাজ্যে শান্তি-সহ-অবস্থান ও সহ-মিলনকে অক্ষুণ্ন ও অটুট রাখার জন্য সাধারণ ফরমান জাবি করেছিলেন যে, কেউ কারো অঞ্চলে বা এলাকায় তাদের ধর্মমতের বিরুদ্ধে যায়, এমন কোন কাজ করতে পারবে না। এখানে কেবলমাত্র জিম্মিদের কতকগুলো নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়নি, সম নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল সকলকেই। শান্তির স্বার্থে আজকের দিনেও কি ঐ নীতিই বাঞ্ছনীয় ও অনুসরণীয় নয়?

৪। বনি-তগলিব গোত্রে কিছু মুসলিম এতিম সন্তান ছিল, যার জন্য খলিফা ব্যাপকভাবে একটি ফরমান জারি করেছিলেন যে, যে সমস্ত এতিম শিশুর মাতা-পিতা যে ধর্মাবলম্বী ছিল, তাদেরকে সেই ধর্মবিশ্বাস হতে যেন বিচ্যুত করা না হয়। তারা তাদের সাবালকত্বে স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা তাই করবে। "ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই।"— ২:২৫৬। ১০৯:৩।

৫। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা সামান্যতম খোঁজ-খবরও রাখেন, তাঁরা সকলেই জানেন ইহুদি ও খ্রীস্টানগণ, বিশেষ করে ইহুদিগণ মহানবীর সাথে কতবার বিশ্বাসঘাতকতা করে মদিনা হতে বিতাড়িত হয়েছিল খাইবারে—তাদেরই বিচারক সাদ-বিন-মায়াজের বিচারে। একদিন সেখান হতেও তাদের বিতাড়িত হতে হল তাদের আপন কর্মদোষে। পরে খলিফা ওমর যখন বুঝলেন কয়লা ধুলে ময়লা যাবে না, তখন তিনি শান্তির জন্য তাদেরকে তাদের আপন জাতির সাথে শান্তিতে বসবাস করার জন্য সিরিয়াতে প্রেরণ করেন। এখানে খলিফা তাদের বিতাড়িত করেনি। বরং তারা যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বারবার, তার জন্য খলিফা ওমর, মহামানব ওমর তাদের প্রাণদণ্ড না দিয়ে চরম কৃপাবশত প্রেম দিয়ে, প্রীতি দিয়ে চরম ভালবাসাবশত দু'বছরের জিজিয়া কর মাফ করত অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে জগৎ-ইতিহাসে নজির রেখে গেছেন—কিভাবে চরম শত্রুকেও ক্ষমা করতে হয়, লালন করতে হয়, পালন করতে হয়। এটা ছিল খলিফা ওমরের মনুষ্যত্বের জয়, মানবতার বিজয়; সর্বোপরি ইসলামের আদর্শের জয়। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ লেখকদের চির পরাজয়।

ওমরের খেলাফতে ইসলামের জিজিয়া কর:

ইসলাম জিজিয়া করের জন্মদাতাও নয়, প্রতিষ্ঠাতাও নয়। এর প্রকৃত জন্মদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা রোম ও ইরান। ইসলাম এই কর আদায়ের জন্য বিশেষ একটি শর্ত আরোপ করেছিল, যে সমস্ত অমুসলমান সামরিক বিভাগে

ইচ্ছাকৃত ভাবে যোগদান করবে না, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদেরকে জিজিয়া কর আদায় দিতে হবে। অন্যথায় দিতে হবে না। অমুসলমানদের জন্য এই পছন্দ-অপছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলেও মুসলমানদের জন্য এর বিন্দু-বিসর্গও ছিল না। তারা যে কোন প্রকারের কর দিয়েও যুদ্ধে যোগদান থেকে রেহাই পেত না। এটা কোন প্রকারেরই বিদেশী বা 'বিধর্মী' কর ছিল না। এটা ছিল রক্ষণাবেক্ষণের সামরিক কর। এর কারণ স্বরূপ বা জ্বলন্ত প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একবার ইয়ারমুকেব যুদ্ধ কালে সিরিয়াবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন মুসলমানদের জন্য একটু অসুবিধাজনক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওমর তাদের নিকট হতে 'কর' নেওয়া কেবলমাত্র বন্ধই করেননি, পূর্বের নেওয়া 'কর'ও ফেরত দিতে নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হয়।

এই তথ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে,

(১) ১৭ হিজরীতে (৬৩৯ খ্রীঃ) খলিফা ওমর ইরাকের সেনাপতিকে নির্দেশ দেন, অশ্বারোহী জিম্মিগণ যারা সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছায় যোগদান করেছে, তাদের ওপর কোন জিজিয়া কর থাকবে না।

(২) ২২ হিজরীতে (৬৪৪ খ্রীঃ) আজারবাইজানেব অমুসলমান নাগরিকগণ সম্পর্কে খলিফা নির্দেশ দিলেন—যারা বছরে একবার মাত্রও সেনা বাহিনীতে যোগদান করেছে, সারা বছর তাদের কোন জিজিয়া কর লাগবে না।

(৩) আরমেনিয়া, জুরজান ও আরো কয়েকটি শহরের অমুসলমান নাগরিকগণ স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করত জিজিয়া পালন হতে মুক্তি পান।

এবাব আমরা ধীর ও স্থিরভাবে খলিফা ওমরের খেলাফত কালে জিজিয়া সম্পর্কে কয়েকটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

১। জিজিয়া কোন বাধ্যবাধকতা মূলক কর ছিল না।

২। এই কর কেবলমাত্র সামরিক কাজের বিনিময়েই ব্যবহৃত হয়।

৩। যারা সামরিক বিভাগের যোগদানের অনুপযুক্ত তাদের এই কর দিতে হতো না। যেমন নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ণ ব্যক্তি ইত্যাদি।

৪। জিজিয়া খাতে আদায়কৃত কর কেবলমাত্র সৈনিক বিভাগেই ব্যয় হতো।

৫। প্রথম দিকে জিজিয়া নগদ টাকা ও উৎপন্ন ফসলে আদায় হতো, পরবর্তীকালে সরকারি পক্ষ হতে সৈনিকদের জন্য রসদ বিভাগের প্রবর্তন করা হলে জিজিয়া শুধুমাত্র নগদ টাকাতেই আদায় করা হতো।

হযরত ওমর ও দাসপ্রথা :

দাসপ্রথা ও দাসদের সম্পর্কে হযরত ওমর মহানবীর দাসমুক্তি সম্পর্কে ঐ ঐতিহাসিক ঘোষণাটি অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখে দাসপ্রথা নামক জন্তুটির চারটি পা-ই পরিষ্কার কেটে দিয়ে প্রথাটিকে একেবারেই নির্জীব করে দিয়েছিলেন।

যুগের হাওয়া একেবারেই প্রতিকূল না থাকলে তিনি প্রথাটিকে একেবারেই মাটিতে পুঁতে দিতেন। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুধাবন করে নিম্নলিখিত ধারায় প্রথাটিকে একেবারেই পঙ্গু করে দিয়েছিলেন, প্রাণহীন করেছিলেন।

১। খলিফা ওমর ফরমান জারি করলেন—"যে সমস্ত দাস আবুবকরের সময় স্বধর্মী ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারা আজ স্বাধীন।" এই ফরমানের বলে অসংখ্য দাস এক সাথে মুক্তি পেল, স্বাধীন হল।

২। "কোন আরব দাস হবে না।" ফলে সমগ্র আরবে দাসপ্রথা রহিত হল।

৩। পূর্বে যুদ্ধে পরাজিত হলে সকলেই দাসে পরিণত হতো। কিন্তু খলিফার ঘোষিত ফরমান বলে এই প্রথা রহিত হল। যার ফলে ইরাক ও মিশরের বহু পরাজিত সৈনিক দাসপ্রথার গ্লানি হতে মুক্তি পেল।

৪। অন্যান্য সকল দেশের জন্যও একই ফরমান জারি করে খলিফা অগণিত মানুষকে দাস-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দেন। যেমন—ফারস, খোজিস্তান, কিরমান, জাজিরা, জুন্দিসাবুর, শিরাজ, বসরা, দামেস্ক, হিমস, হামাদ প্রভৃতি স্থানে একই ফরমান জারি হল। এককথায় খলিফা ওমর তাঁর ইসলামি সাম্রাজ্যেব সকল স্থানেই দাসপ্রথাকে একেবারেই খতম তালিকায় স্থান দিলেন।

৫। ফরমান জারী হল—কোন দাসীর সন্তান হলে ঐ দাসী সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পাবে। অথচ আমরা ইতিহাসে প্রমাণ পাই, দাসীর মালিক তার দাসীকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করে অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করে তাদের হাটে-বাজারে বিক্রি করত।

৬। কোন দাস-দাসী যদি চুক্তি অনুযায়ী মালিকের পাওনা শোধ করে দিতে পারে, সেও মুক্তি পাবে।

৭। ফরমান জারি হল—দাস-দাসীগণকে তাদের অতি নিকট আত্মীয় হতে পৃথক রাখা চলবে না। এই ফরমান বলে স্বামী-স্ত্রী, দুই ভাই, মাতা-সন্তান প্রভৃতিরা মুক্তি পেয়ে গেল।

৮। দাসগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করণার্থে খলিফা অন্য ফরমান জারি করলেন—মহানবীর সাথে যে সমস্ত দাস বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রভুদের সমান বৃত্তি নির্ধারিত হল। এই ফরমান বলে তাঁরা শুধু অর্থই লাভ করলেন না, সম্মানও লাভ করলেন।

৯। খলিফা ওমর প্রতিটি প্রদেশের শাসনকর্তাগণকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন—প্রতি মাসে দাসদের সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। খলিফা মসজিদ-ই-নববীতে সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

১০। একবার একজন দাস কোন এক নগরবাসীদের নিরাপত্তা দান করেছিল, খলিফা মুসলমানদের ওপর সেই নিরাপত্তার নির্দেশকে কার্যকরী করেছিলেন।

১১। খলিফা নিজে দাসগণের সাথে একই আসনে এক সাথে আহার করে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বলেছিলেন, যারা দাসদের সাথে বসে আহার করতে লজ্জা বোধ করে, আল্লাহ্‌র রসুল তাদের সাথে বসতেও লজ্জা বোধ করবেন।

১২। দাসগণের প্রতি খলিফার এই অসাধারণ আচরণ ও বাবহারের সুদূর প্রসারী ফল দেখা দিয়েছিল। দাসদের মধ্য হতেই একদিন দেখা দিল বহু জগদ্বিখ্যাত প্রতিভা—ইমাম ও ফকীহ ইফরামাহ্‌, বিশ্ববিখ্যাত ইমাম মালেকের শিক্ষক মহামতি নাফী এবং আবুবকরের পৌত্র কাসিম, ওমরের পৌত্র সালিম, ইমাম জয়নুল আবেদিন। প্রত্যেকেই দাসী-পুত্র হয়েও জগৎকে জ্ঞানে ও গুণে বহু আলো দান করেছিলেন।

দাস-দাসী
(হাদিস-ভাবানুবাদ)

বলেন দ্বীনের নবী মহম্মদ-অচিরে
মিটাও শ্রমের দাম ঘর্মাক্ত শরীরে।
খেতে দাও ভৃত্যগণে যা ভোজন কব
পরতে দাও চাকরেব যে-কাপড় পর।
দশবার নিজ ভুলে ক্ষমার আশে
একবাব ক্ষমা কর তোমার দাসে।
না করে তোমার দাসে তিক্ত তিরস্কার
লও তুমি স্রষ্টার-সহস্র পুরস্কার।
আজীবন ভৃত্য যায়েদ বলিয়াছে যা—
'কখনও বলেনি মোরে উহ্‌ কিংবা আহ্‌।
বিরক্তির বিন্দু-সহ কখনও ফোটেনি—
একাজ করেছ কেন? ও কাজ করোনি?
প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কও মানুষ সমান
মহম্মদ-রসুল তার করেছেন প্রমাণ।
ধরিয়াছ ধরাধামে, বলোনি বারবার—
অতুচ্চ জীবনের ব্যক্তি ব্যবহার।
দ্বীনের কাণ্ডারী ছিলে গরিবের প্রাণ
কোন দিন রাখ নাই কোন ব্যবধান।
আচারে-বিচারে তব আহারে-বিহারে
সমাজে শাসনে তাদের রেখে সমহারে
বলিলে বিদায় কালে মানব-কুলে
তোমরা কখনও ওদের নাহি রও ভু'লে।

দীন-গরিবের যদি কর গরীয়ান—
আল্লাহ্র আরশে তুমি অতি মহীয়ান
মানুষেরে দাও তুমি মানুষের মান
আল্লাহ্ই তোমারে দেবে ফেরেশতার-সম্মান।
গরিবেরে ভালবাস, গরিব মেনে
আল্লাই বাসিবে ভাল, ভাল লোক জেনে।
এপারে দাসেরে যদি দাও উচ্চাসন—
ওপারে প্রস্তুত তব শ্রেষ্ঠের আসন।
'আল্লাহ্র অভিষ্ট যা অতি প্রিয়তর—
তোমরা সকলে আজ দাস-মুক্ত কর।'

নিশ্চয় প্রাতঃস্মরণীয় খলিফা ওমর জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্বদেশ-বিদেশ নির্বিশেষে দুর্গত মানবতার সেবায় মহানবীর অনুসরণে ও অনুকরণে জিম্মির উন্নতি ও দাস-মুক্তিতে যে মর্মস্পর্শী, যে অকৃত্রিম অনুরাগ ও আন্তরিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যে সরল ও সহজ পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে সক্রিয় ভূমিকা সজোরে গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে জল ঘোলা করাব জন্য দ্বন্দ্ব-অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের কোনই অবকাশ ছিল না, আজও তা অগণিত বিশ্ব-গরিবের অন্তরে ও অনুভূতিতে, বিশ্ব গরিব-দরদী মানুষের দেহ ও মনে, নিপীড়িত-নির্যাতীত, নিষ্পেষিত নিরাশ্রয় নর-নারীর পলকে পলকে নিষ্পন্দিত প্রাণের পাতায় পাতায় চির বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে আগামীকালে অনাগতকালের শিশুদের জন্য নিত্য-নতুন চেতনার নতুন পথে দেহ ও প্রাণে আন্দোলনের নিবিড় শিহরণ জাগিয়ে তুলবে।

সুতরাং খলিফা ওমরের জীবনের বহু শ্রেষ্ঠ কাজেব এটিও একটি শ্রেষ্ঠতম কাজ—জিম্মিদের প্রতি, দাস-দাসীদের প্রতি তাঁর অচিন্তনীয় সদ্ব্যবহার এবং দাস-মুক্তি তথা মানব-মুক্তি। ইসলাম দাস-মুক্তি আন্দোলনের জন্মদাতা, হযরত ওমর যার প্রাণপুরুষ, স্বয়ং মহানবী যার প্রতিষ্ঠাতা ও পথিকৃৎ। এককথায় ইসলাম নির্যাতিত মানুষের, নিপীড়িত মানুষের চিরদরদী বন্ধু, আবার ঐ একই সাথে অত্যাচারীর জন্য আপসহীন 'চিরসংগ্রামী মোজাহিদ। ২:৪,১১, ৮৪:২৭৯, ১৩:৩৪, ১১:১৮, ১৬:১২৬, ৪২:৩৯।

বিশ্ব ইতিহাসের বিরলতম রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক, প্রাজ্ঞ ও প্রশাসক

কর্মনিষ্ঠ লৌহ মানব, খরদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, তেজদীপ্ত মনস্বী, ইসলামের মহান স্থপতি, সেকাল হতে একালের, একাল হতে ভবিষ্যতের ইসলাম তথা মানব সমাজের মহান দিশারি---**হযরত ওমর ফারুক**।

কোরআন: "নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচার ও সৎকর্ম করতে এবং গরিব আত্মীয়-স্বজনদের দান করতে নির্দেশ দেন। তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন।" ১৬:৯০।

"আমি এদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।" ২২:৪১।

রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রনায়ক খলিফা ওমর ফারুকের জীবনে একটি অসাধারণ জিনিস সবার ওপর দৃষ্টি কেড়ে নেয়। খলিফা ওমরের জীবনে এক আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল ব্যতীত কোন কিছুই অপরিহার্য ছিল না। এমনি ছিল তাঁর নীতির মানদণ্ড ও এক আল্লাহতে অবিচলিত নিষ্ঠার নিরুপম নজির। এই নজির তাঁর পূর্বে অন্য কোন রাষ্ট্রনায়কের জীবনে আমরা লক্ষ্য করিনা। এক আল্লাহ্ হতে একটি মানুষ কতটা নির্ভরশীল হতে পারলে, তবেই তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তারেও তার বিচিত্রময় প্রশাসনেও একটি মাত্র বিন্দুতে আমরণ অবিচল থাকতে পারেন, নিখিল বিশ্বে তার একটি মাত্র অনুপম দৃষ্টান্ত রাষ্ট্রনায়ক ওমর ফারুক। অতীতের বিশ্ববিজয়ী আলেজাণ্ডারের গতি পথে দিকনির্ণয়ের যন্ত্র ছিল এরিস্টটলের জ্ঞান-গরিমা, উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা ছিল---আমর-বিন-আল-আস, মুগিয়া বিন শুবাহ্, যিয়াদ বিন আবুসুফিয়ান প্রমুখ আব্বাসীয়া রাজত্বে দেখি—বারমেকী বংশের বিদ্বজ্জন, সম্রাট আকবরের ছিলেন—আবুল ফজল, মানসিংহ। হযরত ওমর ফারুকের ছিলেন—একমাত্র আল্লাহ্। তিনি তাঁর যাবতীয় ব্যাপারেই এক আল্লাহ্ ও তাঁর নবী, এবং কোরআন ও হাদিস ব্যতীত কিছুই বুঝতেন না। তিনি তাঁর সকল কাজেই মনে প্রাণে বলতেন---

প্রশংসা তোমারই, তুমি বিশ্বের পালক
সমস্ত দায়িত্ব সহ সৃষ্টির চালক।
দেখাও সরল পথ, কর সা'লেহীন
কখনো করো না মোরে বেহুদা বেদ্বীন। ১:১-৭

বিদ্রোহ দমনে ওমর-নীতি:

বিদ্রোহ দমনেও বিশ্ব বাষ্ট্রনায়কদের দববাবেও দেখি ওমব এক বিবল ব্যতিক্রমময অধ্যায বচনা কবলেন। খলিফা ওমব ছিলেন বডই রুক্ষ মেজাজেব মানুষ, বডই কঠিন ও কঠোব প্রকৃতিব চবিত্র। তিনি খলিফা হওযাব সঙ্গে সঙ্গে অনেকেবই ধাবণা হযেছিল—হযতো বা ক্ষবদীপ্ত খলিফা কাবণে-অকাবণে দিনান্তে-নিশান্তে বহু নিবপবাধ ব্যক্তিবও অমূল্য প্রাণকে অবলীলায লুটিযে দেবেন, সৃষ্টি কববেন এক সকরুণ পবিবেশ, পৈশাচিক দৃশ্য, নৃশংস তাণ্ডবলীলা, এককথায নাবকীয জগৎ। কিন্তু কার্যত দেখা গেল ঠিক বিপবীত। ব্যক্তি ওমবেব খবদীপ্ত ও তেজদীপ্ত প্রাণ খলিফা-ওমবে এসে যেন পূর্ণত্ব লাভ কবলো দযা ও মাযাতে। সেদিনেব ও এদিনেব ওমব দেখা দিলেন দুযেবই সংমিশ্রণে স্বর্গেব স্নিগ্ধালোকে, আজ আচবণে বিচবণে মহানবীব একান্ত অনুসাবক। ২:৮৩, ৩:১৫৯, ২৪:২৭, ২৮।

খলিফা ওমবেব খেলাফতেব বিদ্রোহ ছিল ঘবে ও বাইবে। অভ্যন্তবীণ বিদ্রোহ একদিনেব ছিল না। শতাব্দীব পব শতাব্দীব ইতিহাসে আবব ধমনীতে মিশে ছিল বিদ্রোহেব আগুন, যে আগুন নেভাতে এই পৃথিবীব যে কোন শক্তিধব সম্রাটও সাহস পাননি। স্বাতন্ত্রবোধ তাদেব শিবায শিবায বিদ্যুতেব ন্যায প্রবাহিত হতো, স্বাধীনতা বোধ ছিল আবব সমাজেব সর্বাপেক্ষা প্রিয ধন। তাদেব এই প্রিয ধনকে তদানীন্তন বিশ্বেব কোন বাজা বাদশাই লুটে নিতে পাবেনি, পাবেনি তাদেব অদ্যম মনোবলকে পবাস্ত কবতে, পবাধীন কবতে, কিন্তু এইসবই বোধ ছিল উচ্ছৃঙ্খলতায ভবপুব। এই উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কবলেন মহানবী। তখন আবাব বিদ্রোহেব নদী প্রবাহিত হল বিনীত ও বিনযেব স্রোতে। মহানবী ও আবুবকবেব পব জাতিব কর্ণধাব রূপে এলেন—ওমব ফারুক। আবুবকব ছিলেন 'তাইযেমী' গোত্রেব, ওমব ছিলেন 'আদি' গোত্রেব। কিন্তু হাশেমী ও উমাইযা গোত্র ঐ দুই গোত্রেব দুই ব্যক্তিব নেতৃত্বকে একটা ভাল নজবে হৃদযেব সাথে ববণ করতে পাবেনি। যাঁবা বাববাব চেষ্টা কবেছেন খেলাফতে সঙ্কট সৃষ্টি কবতে। এমনকি আমব-বিন-আসেব মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি মাঝে মাঝেই ক্ষোভভবে বলতেন—"আজ আমাদেব ভাগ্যেব কি নিষ্ঠুব পবিহাস! আমাব পিতা কত জাঁকজমক কিংখাবেব মূল্যবান জামা পবে ঘুবে বেডাতেন, আব ওমবেব পিতা খাত্তাব মাথায করে জ্বালানি কাঠ বিক্রি কবে খাবাব সংগ্রহ কবত। সেই খাত্তাবেব ছেলে ওমব আজ আমাদেব ওপব হুকুম চালাচ্ছে। কি বদ নসিব।" এমনকি জুবাযেব ও অন্যান্য কিছু সাহাবী বিবি ফাতেমাব গৃহে প্রাযই জটলা কবত খেলাফতেব বিরুদ্ধে। এগুলো ছিল ঘবেব বিপদ ও খেলাফতেব মাবাত্মক পীডা। এই বোগেব মূলে ছিল অন্ধ আত্মসম্মানবোধেব বাডাবাডি।

বহিঃবিদ্রোহ ছিল আবো প্রবল। তদানীন্তন বিশ্বেব দুই বৃহৎ শক্তি পাবস্য

ও রোম কোনদিক থেকেই আরব প্রাধান্য ও প্রতাপকে একটিবারও মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা জীবনের সমস্ত কিছুকেই বিসর্জন দিয়েছেন, বিদ্রোহ করেছেন বুকের সমস্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে, তবুও ক্ষণিকের জন্যও মেনে নিতে পারেননি মরুচারী আরব বেদুঈনের বশ্যতা।

এইরূপ ক্ষেত্রে চলমান পৃথিবীর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা-বাদশাগণ সন্ত্রাসের পর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ন্যায় ও নীতির মাথায় পদাঘাত করে সৃষ্টি করেন এক বিভীষিকাময় রাজ্য, কোথাও মহাশশ্মান, কোথাও নিরপরাধ লক্ষ মানবের বধ্যভূমি। যাতে সমগ্র দেশবাসী ভয়ে ও সন্ত্রাসে বিদ্রোহের নাম-নিশানাও ভুলে যায়। অতীতের ইতিহাসে এই পৃথিবীতে বারবার লক্ষ্য করা যায় গুরুগম্ভীর অত্যাচারী নিষ্ঠুর শাসকের সৃষ্টি রক্তস্রোত প্রকৃতির কোলে চির প্রবাহিত নদীর স্রোতকেও হার মানিয়েছে, ম্লান ও মলিন করে দিয়েছে। খলিফা ওমরের বিশাল খেলাফত, সুবিশাল দেশ, ঘরে-বাইরে বিদ্রোহের বহ্নি ও প্রবলভাবেই প্রজ্বলিত । কিন্তু ধীরমতি ওমর তাঁর প্রাজ্ঞকে অতি ধীরভাবেই পরিচালনা করে পৃথিবীর ইতিহাসে রেখে গেলেন বিদ্রোহ দমনের এক অভিনব অদ্বিতীয় ধারা।

খলিফা ওমর ধীর ও স্থিরভাবে প্রতিজ্ঞা নিলেন, যদি অগণিত মানুষের হৃদয়কে জয় করতে না পারেন, তাহলে সে দেশ তিনি জয় করবেন না। ধীরমতি ওমর বুঝতে পেরেছিলেন—সেনা দিয়ে, সৈন্য দিযে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখাকে জয় করা যায়, কিন্তু সেই দেশবাসীকে জয় করা যায় না, এবং যতক্ষণ কোন দেশবাসীকে জয় করতে না পারা যায়। ততক্ষনে সে জয়-পরাজয়ের নামান্তর মাত্র। খলিফা ওমর বিদ্রোহ দমন ও ক্ষমতা দখলের জন্য উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার ন্যায় কুখ্যাত নীতি ও সেদিনের রাশিয়ার 'কি-জে-বি'-র প্রতিষ্ঠাতা ও লেলিনের প্রধান সহচর কোলিন্স্ জারঝিনসির মতো এক কোটি মানুষকে বন্দীগারে না খেয়ে মারার মত ও লেলিনের অন্য এক প্রধান সহচর কমিউনিস্ট নেতা সোয়াজলভের (মেট্রোপল হোটেলের পাশে) দিবালোকে অতীব নৃশংস ও নিষ্ঠুরভাবে সেদিনের 'জার' পরিবারের বৃদ্ধ ও শিশু-সহ আপামর সকলকে হত্যা করার মতো জগৎজোড়া অভিশপ্ত নীতি গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর ক্ষমা-দয়া-মায়-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা, ও চির কল্যাণময়ী নীতির দ্বার সকলকে জয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিদ্রোহ দমনের নামে অগণিত মানুষকে অনির্দিষ্ট কাল ধরে বন্দীগারে মারা তো বহু দূরের কথা পুরে রাখারও ঘোর বিরোধী ছিলেন। এককথায় ঘরে বাইরে বিদ্রোহ দমনে তিনি যে বিরল বন্ধুসুলভ নীতির প্রয়োগ করেছিলেন, তার পরিণতি হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। খলিফা ওমর বিদ্রোহ দমনে অসংখ্য মানুষকে বন্দী না করায় অগণিত মানুষ তাঁকেই একদিন বন্দী করল তাদের

আপন আপন ভক্তি ও ভালবাসার হৃদয়-দুর্গে। এইখানেই রাষ্ট্রনায়ক খলিফা ওমরের দেশজয় নয় নীতির জয় ছিল শাশ্বত। এরই নাম সত্যের জয়, সুন্দরের জয়। মানুষ ওমর মানুষেরই হৃদয়ে হলেন—চিরবন্দী। আজও বন্দী, তাই ওমর নিখিল মানবের চিরবন্দিত ও নন্দিত মানুষ।

'মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরিগো সর্বদাই'।

—নজরুল

সিদ্ধান্তে অবিচল ওমর:

পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা বিশ্ববিজয়ী বীরও তাঁদের আপন আপন সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। কিন্তু ওমরের অবিচলতা ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র ধরনের। পৃথিবীর অন্যান্য অধিকাংশ বীরগণ ন্যায় হোক, অন্যায় হোক আপন আপন লক্ষ্যকে জয় করার জন্য ন্যায় ও অন্যায়ের কোন ব্যবধান রাখেন নি। এই ব্যবধানশূন্য জয়ই আপামর জনসাধারণের জন্য ছিল চূড়ান্ত অভিশাপ। যার ফলে নিখিল বিশ্বের অগণিত নিরপরাধ মানুষ একজনের পাপে করেছে বহুজনের প্রায়শ্চিত্ত। কেঁপে উঠেছে দুরু-দুরু বুকে দূর প্রান্তের নিরীহ গ্রামগুলোও। কিন্তু রাষ্ট্রনায়ক ওমরের জীবনে এই দুর্ভাগ্য কোনদিনই ঘটেনি। পাহাড় টলেছে, পর্বত টলেছে, নদী-নালা তার স্রোত হারিয়েছে, কিন্তু খলিফা ওমরের ন্যায়-নীতি কোনদিনই টাল খায়নি। খলিফার পায়ের তলে ছিল এই ন্যায়-নীতির অপরিবর্তনশীল পাথর। বিশ্বজোড়া বিশাল আরব সাম্রাজ্য ক্ষণে ক্ষণে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে ওমরের ন্যায়-নীতির নামে। বিশাল সাম্রাজ্যের অসংখ্য মানুষ নিশ্চিত মনে জানত ওমরের খেলাফতে অন্যায়ভাবে একটি মশাও মার খাবে না। আবার একথাও জানতো—ন্যায়ের বিচারে বিশ্ববিজয়ী, অজেয় বীর খালিদ, দেশের মহাপ্রতাপশালী আমর-বিন-আস, ঘাসসানি গোত্র প্রদান জাবালা, ইরাক ও ইরান বিজয়ী সাদ-ওয়াক্কাস, আরো কত শত গভর্নর ওমরের বিচারে কোন ক্রমেই রেহাই পাননি। খলিফার যে কোন আদেশ ও নিষেধে সাধারণ হতে অসাধারণ, শাসন হতে প্রশাসনের একটি প্রাণীও কি ও কেন বলে ঘাড় তুলে, এ শক্তি কারোরই ছিল না। এ যেন একটি ফকির মানুষ বহু স্বর্ণখনির মালিক। যাঁকে দেখে সারা দুনিয়া স্তম্ভিত, চমকিত। মানুষের ক্ষতি না করে, কোন অন্যায়ের আশ্রয় না নিয়ে, আপন সিদ্ধান্তে অটল থেকে ভয় ও ভালবাসার মাঝখান হতে মানুষ ওমর মানুষের ভালবাসা লাভ করেছিলেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে আজও নজিরবিহীন। রাষ্ট্রনায়ক ওমরের রাষ্ট্রকৌশল ও প্রশাসনিক প্রতিভার জয় এখানেই।

প্রশাসনে স্বজনপোষন হীনতা:

সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ওমর, শত-তালি শোভিত জীর্ণজামা পরিহিত ওমর, নিশীথ

রাতের বিজন প্রান্তরে নিরস্ত্র একাকী বসা ওমর, যাঁর নামোচ্চারণে আরব, মিশর, ইরাক, ইরান, সিরিয়া সদাই শিহরিত প্রকম্পিত। খলিফা ওমর তাঁর প্রশাসনে স্বজনপোষনের গন্ধ মাত্র রাখেন নি। তাঁর আপন পরিবারে, আপন গোত্রর একজনকেও প্রশাসনের কোন বড় পদ দান করেননি। হাশেমী ও উমাইয়া গোত্র পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। রাজনৈতিক নানা কারণে হাশেমী গোত্রের মানুষকে আপন প্রশাসনে খুবই কম নিতেন। আরবের কোন গোত্রের কোন লোকের যোগ্যতা কতখানি, তা খলিফার নখদর্পনে ছিল। তিনি ঠিক সেই অনুপাতে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যপদে নিয়োগ করতেন। বিশাল সাম্রাজ্য এমন একটিও নর-নারী ছিলেন না, যিনি অকুতোভয়ে খলিফার নিকট কারো হয়ে স্বজনপোষনের তদবির করতে পারতেন। ওমর চরিত্র ছিল এমনি উচ্চাঙ্গের, এমনি সম্ভ্রমময়। শাসনবিভাগে, সামরিকবিভাগে, শিক্ষাবিভাগে ও অন্যান্য নানা বিভাগে যাঁরা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, খলিফা তাঁদেরকেই নিয়োগ করেছিলেন, যেমন প্রশাসনে মুয়াবিয়া, আমর, যিয়াদ, মুগিরা, সেনাবিভাগে খালিদ, সাদ ওয়াক্কাস, শিক্ষাবিভাগে—মুয়াজ, আব্দুল্লাহ, বিচার বিভাগে—আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ ছিলেন এমন বিচারপতি।

ওমরের শাসননীতিতে আরো একটি বস্তু খুবই লক্ষণীয়। তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সকল দেশে একই নীতির প্রয়োগ করেন নি। স্থিতধী, তীক্ষ্ণধী ওমর প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া, আইন-কানুন, আচার-বিচার, চাল-চলন সবকিছুকে গভীরভাবে অধ্যায়ন ও আলোচনা করেই সে দেশের শাসন-যন্ত্রকে সুদৃঢ় করার নির্দেশ দিতেন। প্রশাসনকে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো পরিচালনা করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রতিটি দেশের প্রয়োজনমাফিক সেই দেশের প্রশাসনের পাতায় পাতায় রেখেছিলেন মানুষের কল্যাণময় নীতির প্রয়োগ। যারা একদিন ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন, ওমরের রাষ্ট্রনীতির ফলে আজ তাঁরাই হলেন ইসলামের চিরদরদী বন্ধু, যেমন মিশরের রোমক রাজপ্রতিনিধি সাইরাস, সিরিয়ার রোমক-কর-জর্জরিত কৃষক ও নাগরিকগণ। ইরাকের মরজ-মান ও ইরানের দেহকান নামক বিশাল প্রতাপশালী জমিদারগণ। বিশেষ কথা খলিফা ওমর এঁদের ওপর একদিনও তাঁর নীতির প্রয়োগ ব্যতীত কোন রূপই শক্তির প্রয়োগ করেননি। তাঁদের বন্দী করেছিলেন শত্রুরূপে নয়, বন্ধু রূপে, লোহার শিকলে নয়, প্রাণের ভালবাসায়। রাষ্ট্রনায়ক ওমর কোনদিনই কোন রূপই স্বজন-পোষণ করেন নি, তবে সদাই করেছিলেন সর্ব-পোষণ, সাধারণ পোষণ। এখানেই তাঁর পোষণ নীতির চির জয়।

উত্তম বস্তুর গুণগ্রাহী ওমর :

রাষ্ট্রনায়ক ওমর জীবনে বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন। একটি মানুষের জীবনে এত গুণের সুন্দর সমাবেশ খুবই কম লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই সমস্ত

গুণরাশির মধ্যে একটি ছিল সংস্কারমুক্ত মন। একটি ভাল জিনিস কোন চণ্ডালের মধ্যেও যদি লক্ষ্য করতেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতেন। যেটি ভাল, যেটি সুন্দর, সেটিকে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট হতেই গ্রহণ করতেন। এই সংস্কারমুক্ত মনই একদিন রাষ্ট্রনায়ক ওমরকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে সাহায্য করল সকল দেশের বাছাই করা শ্রেষ্ঠ মানব-কল্যাণকর নীতিগুলোকে। যদিও যে কোনো নীতি নির্ধারণে পবিত্র কোরআন ও হাদিস তাঁর চিন্তাজগতে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় বিরাজ করত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন যে, পবিত্র কোরআন হাদিসের একটি নোক্তাও নেই যা মানব কল্যাণ্যের ইঙ্গিত দেয় না। সুতরাং রাষ্ট্রনায়ক ওমর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বজ্জনদের আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁর দরবারে তাঁদের দেশের শ্রেষ্ঠ নীতিগুলোকে আপন দেশে প্রয়োগ করার জন্য। ইরাক, ইরান, মিশর ও সিরিয়া বিজিত হল, এই দেশগুলো দেশের রাষ্ট্রনায়কের কোন দুর্বল নীতির জন্য বিজিত হল, খলিফা ওমর সেগুলোকে প্রথম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করতেন তাদের ভাল জিনিসও কি ছিল। এইভাবে তিনি তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনায় মানব কল্যাণের নিরিখে বরণ করতেন ও বিসর্জন দিতেন। ন্যায়-অন্যায়ের ব্যবধানকারী রূপে মহানবী কর্তৃক 'ফারুক' উপাধি লাভ তাঁর জীবনে সার্থক রূপ লাভ করেছিল। প্রাক-ইসলামি যুগের অন্ধ কুলগৌরব, বংশ গৌরব, মদ-ভাঙ-জুয়া-যৌনলীলা ইত্যাদি, যে জিনিসগুলোকে যে কোন উন্নত জাতিকেও একদিন চরম অধঃপতনের পথে ঠেলে দেয়, রাষ্ট্রনায়ক ওমর অতি নির্মম হস্তে সেগুলোকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। দেশের কল্যাণে মানুষের কল্যাণে খলিফা ওমর অতীব সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে এক হাতে অনেক কিছুকে বরণ করেছিলেন, আবার অন্য হাতে বহু কিছুকে বর্জন করেছিলেন।

খলিফার গোয়েন্দা বিভাগ:

রাষ্ট্রনায়ক ওমর তাঁব বিশাল সাম্রাজ্যের দূর হতে দূরান্তের নিখুঁত সংবাদ সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা ও গুপ্তচর বিভাগের প্রবর্তন করেন। আরব ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই বিভাগটি খলিফার খুবই প্রিয় ছিল। খলিফা এই বিভাগটির দ্বারাই বিশাল রাজত্বের নাড়ি পরীক্ষা করতেন। এই বিভাগের কাজকে যথাযথভাবে চালনা করার জন্য অতীব সন্তর্পণে কিছু কিছু মহিলাকেও নিযুক্ত করা হতো। এই সমস্ত মহিলাগণ সাধারণ পরিবার হতে অসাধারণ পরিবারেরও ছিলেন। মায়সনের গভর্নর বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিলে মহিলা গুপ্তচর তাঁর বেগমের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করে খলিফার গোচরীভূত করলে গভর্নরের প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতসহ চাকরি যায়। এই বিভাগের

দ্বারা ন্যায়পরায়ণ খলিফা কেবলমাত্র শাস্তিই দিতেন না, বহুজনকে তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠার ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্য অনতিবিলম্বে পুরস্কৃতও করতেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়কের জীবনেই আমরা লক্ষ্য করি শুধু তিরস্কার, পুরস্কারের কোন বালাই নেই। রাষ্ট্রনায়ক ওমর ছিলেন এর বিরল ব্যতিক্রম; যাঁর একহাতে ছিল পুরস্কার, অন্য হাতে ছিল তিরস্কার, এক চোখে ছিল পাপী, অন্য চোখে ছিল নিষ্পাপী। যার ফলে সাম্রাজ্যের চতুঃসীমাও নীরবে কেঁপে উঠত। বনের বাঘও যেন অন্যায়ভাবে জঙ্গলের বকরী খেতেও ভয় পেত, দুরাচার কোন একাকী সুন্দরীকে দেখেও সঙ্গে সঙ্গে সম্বিৎ ফিরে পেত। সেদিনে পৃথিবীর শক্তিকেন্দ্র মদিনা ছিল সমগ্র সাম্রাজ্যের মৌচাক, গোয়েন্দা ও গুপ্তচরগণ ছিলেন রাষ্ট্রনায়কের বিশ্বাসী মধুকর, যে মৌচাকটি, যে মসজিদে-নববী হতে সে দিনের বিশ্বশক্তি গতি লাভ করেছে, বিশ্ব নীতি-নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

সম-আচরণে রাষ্টনায়ক ওমর:

রাষ্ট্রনায়ক ওমর তাঁর প্রশাসনে ইসলামেব সম-আচরণের যে চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, জগৎ আজও সেখানে চমকিত, বিশ্ব আজও সেখানে বিস্মিত, জগৎ-রাষ্ট্রনায়ক আজও সেখানে শ্রদ্ধানত। ওমবের রাষ্ট্রনীতিতে তাঁর সাম্রাজ্যে ছিল একটি মাত্র জাতি, যার নাম মানব জাতি। সেখানে ছিল না কোন জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ, মালিক-দাস, ঘর-পব, আত্মীয়-অনাত্মীয় প্রভৃতি। তাঁর জীবনের সামান্য দু'একটি ঘটনা হতে পর্বত প্রমাণ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভেসে ওঠে।

(১) ঘাসসানি গোত্রের প্রধান যুবরাজ জবালা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এবং কাবা প্রদক্ষিণ কালে একজন ক্রীতদাস অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর কাপড়ে পা দিলে, তিনি তাকে চপেটাঘাত করেন, দাসও সমভাবেই উত্তর দেয়। জবালা খলিফার নিকট নালিশ জানালে, খলিফা রায় দেন, বিচার হয়ে গেছে। তখন জবালা বলেন, আমার দেশে এরূপ করলে ওব মৃত্যুদণ্ড হতো। খলিফা বলেন, ইসলামের পূর্বে এদেশেও হত। তুমি জেনে বেখ ইসলাম সকল মানুষকেই মানুষ হিসাবে একই স্তরে বসিয়েছে। তখন জবালা ইসলামও দেশ উভয় ত্যাগ করলেন।

(২) কোরেশ প্রধানরা প্রায়ই খলিফার সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থী হতেন। একবার কয়েকজন কোরেশ প্রধান ও কয়েকজন স্বাধীন-দাস তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে খলিফা প্রথম আজাদ গোলাম হযরত বেলালকে ডাক দিলে কোরেশ প্রধান আবু সুফিয়ান অতি আক্ষেপ ভরে বলে ওঠেন—প্রভুরা থাকে প্রতীক্ষায়, গোলামরা পায় প্রথম সাক্ষাৎ। অদৃষ্টের ও ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস।

(৩) বিখ্যাত কাদিসিয়ার যুদ্ধের পর বৃত্তিদান কালে আরব গোত্রের

মধ্যে কোনরূপ কৌলিন্য বা বংশ-মর্যাদার মহিমাকে খলিফা এতটুকুও পাত্তা না দিয়ে ইসলামের সেবার মানদণ্ডে সবকিছুর নীতি নির্দ্ধারণ করেন। এই সারিতে যাঁরা পর পর ছিলেন (১) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীগণ, (২) প্রথম জেহাদে অংশকারীগণ, (৩) নবী বংশ, (৮) অতঃপর অন্যান্য দল। এই বৃত্তি প্রদানে প্রভু-ভৃত্যে কোন রূপই পার্থক্য থাকিত না, কর্ম গুণে গোলাম প্রভু অপেক্ষা বেশি বৃত্তি পেতেন।

(৪) স্বয়ং খলিফার পুত্র আব্দুল্লাহ্ ক্রীতদাস জায়েদের পুত্র উসামা অপেক্ষা কম বৃত্তি পেয়ে পিতার নিকট অনুযোগ করলে পিতা পুত্রকে তিরস্কার কবে বলেন—"রাসুলুল্লাহ্ উসামাকে তোমার চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন।"

(৫) মিশরের গভর্নর আমর-বিন-আস জামে-মসজিদে নিজের জন্য উঁচু একটি মিনার তৈরি করলে, খলিফা অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ভর্ৎসনা-সহ্ ওটিকে ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। এবং জানিয়ে দেন মসজিদে তোমার আসন সবার সঙ্গে।

(৬) একবার স্বয়ং খলিফা আদালতে হাজির হলে বিচারক তাঁকে একটু সম্মান দেখানোর জন্য খলিফা বিচারককে বলেন—"তুমি তো প্রথমেই বাদী-বিবাদীর মধ্যে অবিচার করে বসলে।"

(৭) স্বয়ং খলিফার আপন হাতেই আপন পুত্র আবুশামা পানাদোষের জন্য আশিটি বেত্রাঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর অসংখ্য বিচারের এই একটি মাত্র বিচারই বিশ্ব-বিচারাগারকে চিরধন্য করেছে।

সমাজে শাসনে বিচারে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে রাষ্ট্রনায়ক খলিফাব সবার প্রতি ভেদাভেদশূণ্য সম-আচরণ বিশ্ব ইতিহাসে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে আছে। খলিফা ওমর নিপীড়িত-নিষ্পীড়িত মানব সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে সম-আচরণের চিরপ্রবাদ পুরুষ।

মানব সমাজ লাগি বড় পরিতাপ
বংশ-কুলের দাবি জাতের প্রলাপ।
জিজ্ঞাসা করে না প্রভু কোনদিন রোষে
কোন্ বংশে জন্ম নিলে কাহার ঔরসে।
কর্ম যার নাহি জ্বালে জীবন বাতি
শুধাবে না কেহ তারে সে কোন জাতি।

—২: ৪৮, ৪: ৩৪, ৪৯: ১৩।

দীন-দরিদ্রের বন্ধু রাষ্ট্রনায়ক ওমর:

রাষ্ট্রনায়ক ওমর ছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দীন-দরিদ্র ও অসহায় মানুষের চিরদরদী বন্ধু। তাঁর অন্তরের ঐ দরদটা মাঠে-ময়দানে-বক্তৃতাতে ফুটে ওঠেনি, ঐ দরদ প্রাণ পেয়েছিল গরিবের দেহে ও প্রাণে। ওমর

ঘোষণা করেছিলেন—তাঁর রাজ্যে মুসলিম-অমুসলিম যে কেউ বসবাস করুক, সরকার তাকে পালন করতে বাধ্য। আজও আমাদের মতো দেশ বেকার যুবক-যুবতীদের কিছুই করে উঠতে পারেনি। কিন্তু আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে হযরত ওমর বেকারদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। খলিফা দেশের সমস্ত এতিম-অনাথ শিশুদের জন্য বার্ষিক একশো দিরহাম বৃত্তি ধার্য করে দিয়েছিলেন, বাজার দর ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের বৃত্তিও বৃদ্ধি পেত। খলিফা অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও বিধবাদের জন্য পৃথক একটি বিভাগের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তিকে ওমর চিরদিনই ঘৃণার চোখে দেখতেন। এবং এই বৃত্তিকে তিনি মানব সমাজের জন্য অভিশাপ বলে মনে করতেন। খলিফা ওমর কথায় কথায় সকল মানুষকে গরিবদের সম্পর্কে মহানবীর অন্তিম শয়নের সেই সাবধান বাণীটি প্রায়ই শুনিয়ে দিতেন—"সাবধান গরিব মানুষ, সাবধান গরিব মানুষ।"

খলিফা ওমর ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। অনেকে জাঁকজমকপূর্ণ কাজ করতে ভালবাসতেন। কিন্তু খলিফার বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি সমাজের এমন কোন ছোট কাজ নেই, যাকে করতে ভালবাসতেন না। পরিশ্রমী ওমর, তাঁর খেলাফত লাভের পরও তাঁর জীবনের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোন রূপই পরিবর্তন হয়নি।

আমিরুল মু'মেনিন ওমর:

খলিফা আবুবকর তাঁর অন্তিম শয়নে ওমরকে ডাক দিলেন এবং অনুরোধ করলেন—খেলাফতের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। ওমর বারবার তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করলে—আবুবকর তাঁকে ধমকের স্বরে কথা বললে ওমর নিরুপায় হয়ে আদবের খাতিরে নীরব হয়ে যান এবং এই মৌনতা বা নীরবতাই ছিল তাঁর সম্মতিজ্ঞাপক উত্তর। এই সম্পর্কে ইমাম মহম্মদ বলেন—খলিফার আপন বক্তব্য যা ছিল, "আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক হতো, যদি আমি জানতে পারতাম আমার অপেক্ষাও যোগ্যতর ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে এই গুরুভার পালন করার জন্য।" খলিফা খেলাফত লাভের পর একটি কথাতে তাঁর ভাষণ শেষ করেন—"যদি আমি জানতাম, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ উপকারী হতে পারবো না, তাহলে এই পদ গ্রহণ করতাম না। আগে আপন আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছি, পরে এই পদ লাভ করলাম।"

খলিফা ওমর কিভাবে আমিরুল মু'মেনিন হলেন। তখনকার দিনে সমগ্র আরব দেশজুড়ে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল—দল ও গোষ্ঠীপতিদের 'আমির' বলা হতো। এই প্রথাটি ইরাক বা কুফাতে আরো বেশি প্রচলিত ছিল। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক-ঐতিহাসিক ইবনে খালদূনের মতে, একদা কুফার লবিদ-বিন

রাবিয়া ও আদি-বিন-হাতিম মদিনায় আগমন করে খলিফা ওমরের সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে খলিফার দরবারে আমর-বিন-আসকে বলেন—"আমরা আমিরুল মু'মেনিনের সাক্ষাৎ চাই, আপনি একটু ব্যবস্থা করে দিন। তখন আমব খলিফার নিকট গমন করে তাঁকে জানান দু'জন কুফাবাসী আমিরুল মু'মেনিনেব সাক্ষাৎ চান। উত্তরে খলিফা বলেন—'আমিরুল-মু'মেনিন কে? আমর তৎক্ষণাৎ বাইরে গিয়ে ঐ একই কথা তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন—'আমিরুল-মু'মেনিন কে?' উত্তরে কুফাবাসীগণ বলেন—'মহামান্য খলিফা'। আমর তৎক্ষণাৎ ভিতবে গিয়ে খলিফাকে অবগত করান বিষয়টি। খলিফা মৃদু হেসে ঐ সম্বোধনটি সাদরে গ্রহণ করে তাদের সাক্ষাৎ দিলেন। তখনকার দিনে 'আমির' শব্দটি 'জল ভাতের' মতো আরব দেশে ব্যবহৃত হতো। তাই খলিফা ঐ 'আমিব' সম্বোধনকে গ্রহণ করাতে মিশরের গভর্নর কিছুটা ক্ষুন্ন হলেন। তাঁর মনে হল—এটা তুচ্ছ একটা উপাধি, এটাকে খলিফা গ্রহণ না করলেই ভাল করতেন। বিচক্ষণ খলিফা আমরের উদ্দেশ্যটি বুঝতে পেরে তাঁকে বুঝিযে দিলেন, উপাধিটি উচ্চ পর্যায়ের হলে তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান কবতেন। যেহেতু নিম্ন পর্যায়ের তাই গ্রহণ করলেন।

অনেক সময় পদ বা পদবী সাধাবণ মানুষকে বড় কবে, আবাব অনেক সময় অসাধারণ মানুষই পদ বা পদবীকে চিব গৌবব দান কবে বড কবে। অতুলনীয় মানুষ মহান খলিফা ওমর ঐ সম্বোধনটিকে গ্রহণ কবে 'আমিব' শব্দটিকে চিরগৌরব দান করে গেছেন।

ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ওমর:

৫৮২ খ্রীস্টাব্দে মা খানতামার কোলে শিশু ওমর জন্মগ্রহণ কবেন। কে জানত কালে একদিন এই শিশু হবেন ইসলামি সাম্রাজ্যেব প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, মহানবীর প্রধান সাহাবী, প্রথম 'আমিরুল মু'মেনিন', ইসলামেব দ্বিতীয় খলিফা, জগদ্বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক, সারা বিশ্বের ব্যতিক্রমবিহীন বিচাবক, আরো বহু কিছু।

ওমর পিতা খাত্তাবের অভাবী সংসারে জন্মগ্রহণ করাব জন্য তাঁকে শিশুকাল হতেই পরিশ্রম করতে হতো। কৈশোরে দাজনানের মরুপ্রান্তরে উট চরান, যৌবনে সিরিয়া ও পারস্যের মধ্যে ব্যবসা পরিচালনা, কখন মক্কাব মাটিতে চাষ-আবাদে ব্যস্ত, ইসলাম গ্রহণের পর মদিনার মাটিতেও আপন রুজি-রোজগাবে স্বাবলম্বী ওমর। ওমরের মুখ ও মন কোনদিনই দুটো ছিল না। মনে যেটা বিশ্বাস করতেন, মুখে তার বহিঃপ্রকাশ ছিল, কর্মে তাকে রূপায়ণ করতেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের আজন্ম নীতি। সারা জীবনই আডম্ববিহীন জীবন পছন্দ করতেন, বিলাসিতাকে তিনি শুধু ঘৃণাই করতেন না, মানব জীবনের সুন্দরের পথে কণ্টক মনে করতেন। যখন সারা বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি ইরান ও রোম তাঁর পদানত, তখনও ওমর দাজনানের মরুপ্রান্তরে উট চরানোর

জীবন অতিবাহিত করছেন। মহামান্য খলিফার পদগৌরব, ইরান ও রোমের বিশাল ধনরাশিও ওমরের সরল জীবনে কোনদিনই তিলার্ধ পরিমাণ ও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনতে পারেনি। এইটাই ছিল হযরত ওমরের পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের চির উজ্জ্বল মহিমাময় শাশ্বত ছবি।

হায়রে অর্ধেক ধরার মালিক আমিরুল মু'মেনিন
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন।
সাহারা পারায়ে! ঝুলিতে দ'খানা শুকনো খবুজ-রুটি,
একটি মশকে একটু পানি খোর্মা দু'তিন মুঠি।
আসিলে প্যালেস্টাইন, পারায়ে দুস্তর মরুভূমি,
ভৃত্য তখন উটের উপরে, রশি ধরে চল তুমি!
জর্ডন নদী হও যবে পার, শত্রুরা কহে হাঁকি—
"যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথিবী, এই সে ওমর নাকি?"

—নজরুল ইসলাম

পারিবারিক জীবন:

(১) খলিফা ওমর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে কয়েকটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নাম জয়নাব, ইনি ওসমান বিন মাজুনের ভগ্নি, ওসমান স্বয়ং মহানবীর খুব প্রিয় ছিলেন। জয়নাব স্বামী ওমরের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং তাঁর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে—আব্দুল্লাহ ও হাফসা। দু'জনেই ইসলামের ইতিহাসে অমর। আব্দুল্লাহ ছিলেন সুপণ্ডিত, বিখ্যাত কোরআন ও হাদিস বিশারদ। হাফসা ছিলেন মহানবীর স্ত্রী।

(২) দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন কারিবা, উমাইয়াতুল মাঘজুমির কন্যা এবং মহানবীর স্ত্রী উম্মে সালমার ভগ্নি। কারিবা ইসলাম গ্রহণ না করায় হোদাইবিয়ার সন্ধির পর ওমর তাঁকে পরিত্যাগ করেন।

(৩) তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন—মালায়কা বা উম্মে কুলসুম, ইসলাম গ্রহণ না করায় স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হন।

(৪) চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন—আসিম বিন সাবিতের কন্যা জমিলা। জমিলার প্রথম নাম ছিল আছিয়া, মহানবী তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করে ঐ নতুন নামে ভূষিতা করেন। স্বামী-স্ত্রী বনিবনা না হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

(৫) পঞ্চম স্ত্রী অসামান্য সুন্দরী যায়েদ তনয়া আতিকা। আতিকা প্রথম ছিলেন আবুবকরের পুত্র আব্দুল্লার স্ত্রী, আব্দুল্লাহ তয়েফের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করলে হযরত আলীর অনুরোধে ওমর তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করেন।

(৬) ষষ্ঠ স্ত্রী হারিস-বিন-হিশামের কন্যা উম্মে হাকিম।

(৭) খলিফা ওমরের বড়ই ইচ্ছা ছিল—মহানবীর বংশের সাথে সরাসরি একটা সম্পর্ক স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি হযরত আলী ও বিবি ফাতেমার কন্যা উম্মে কুলসুমের পাণিপ্রার্থী হন। পিতা আলী উভয়েরই বয়সের দিক

চিন্তা করে প্রথম না করে দিয়েছিলেন। পরে বহুজনের অনুরোধে সম্মতি জ্ঞাপন করলে ১৭ হিজরীতে (৬৩৯ খ্রীঃ) এই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

ওমরের পুত্রসন্তান সর্বমোট ছ'জন। আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ্, আসিম, আবু শামা, যায়েদ ও মুজির। আব্দুল্লাহ পাণ্ডিত্যে ও বীরত্বে খুবই খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। মহাত্রাস হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফের মুখের ওপর তিনি কড়া জবাব দেওযাব জন্য কুচক্রী হাজ্জাজ-কর্তৃক নিযুক্ত এক দুরাচারের হাতে বিষাক্ত তরবারিব আঘাতে প্রাণ হারান। এই আব্দুল্লাহ্ একদিন স্বেচ্ছায় খলিফার পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উবাইদুল্লাহ একজন খ্যাতনামা বীর ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁব শৌর্যবীর্যের কোন তুলনা ছিল না। আসিম একজন প্রতিভাধর পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। এই আসিমের কন্যার পুত্র ছিলেন উমাইয়া বংশের গৌরবরবি (আব্দুল আজিজের পুত্র) দ্বিতীয় উমর। যাঁর মাহাত্ম্যে ও কর্মগুণে মুগ্ধ হযেই সমগ্র আরব তাঁকে 'পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এখানে ওমরের চরিত্রে একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করি। তিনি স্ত্রীদেব ঘৃণাও করতেন না, আবার মাথাতেও চাপাতেন না। রাষ্ট্র পরিচালনায় স্ত্রী-পুত্র কাউকে কোনরূপ হস্তক্ষেপই করতে দিতেন না, এমনকি রাষ্ট্রশাসনে কোন পুত্রকেই কোন পদেই নিয়োগ করেননি। বরং মৃত্যুশয্যায নির্দেশ দিযেছিলেন—তাঁব পুত্রদের কারো নাম যেন খলিফার পদের জন্য না ওঠে। এমনি ছিল তাঁর নিষ্ঠার মাপকাঠি।

একটি আদর্শ মানুষ

"পয়গম্বর নবী ও রসুল—এরাঁ তো খোদার দান।
তুমি রাখিয়াছ, হে অতি-মানুষ, মানুষের সম্মান।
কোরআন এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়েছে প্রাণ,
তুমি রূপ—তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।
ইসলাম—সে তো পরশ-ম্যাণিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি!
পরশে তাহার সোনা হ'ল যার তাদেরেই মোবা বুঝি।
আজ বুঝি—কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর—
"মোর পরে যদি নবী হত কেউ, হত সে এক উমর!"
অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখতে বসি'
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারেবারে গেছে খসি'
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুটীর তুমি পড়নি ক' নুয়ে
ঊর্ধ্বের যারা পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে!
কেঁদে কহে যত ঈসাই ইহুদি অশ্রু-সিক্ত আঁখি—
"এই যদি হয় ইসলাম—তবে কেহ রহিবে না বাকি,
সকলে আসিবে ফিরে
গণতন্ত্রের ন্যায় সাম্যের শুভ্র এ মন্দিরে!" —নজরুল

ধার্মিক ওমর :

ওমরের সংসার জীবনে মহানবীর একটি কথা খুবই তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। মহানবী বলেন—'ইসলামে বৈরাগ্য নেই।' অর্থাৎ ইসলাম সংসারধর্মী মানুষের ধর্ম। ইসলাম অর্থ শান্তি, আবার সংসারে একবার পা দিলে, আর যাই কিছুর অভাব-অনটন থাক, অশান্তির কোন অভাব-অনটন থাকে না। তা হলে ইসলাম কি একদিকে শান্তির কথা বলে, আর অন্যদিকে অশান্তির দিকে ঠেলে দেয়। আসলে ইসলাম বলতে চায়—এই সংসারের সমস্যা ও সংঘর্ষহীন জীবনের (অর্থাৎ বৈরাগ্যময় জীবনের) যে শান্তি, সেটা ঠিক মনুষ্য জীবনের বা কোন দায়িত্বশীল মানুষের জীবনের শান্তি নয়, বরং এই সংসার স্রোতের সমস্যা ও সংঘর্ষময় পরিস্থিতি বা পরিবেশকে শান্তিময় পরিবেশে রূপান্তরিত করাটাই দুর্লভ ও দায়িত্বশীল মনুষ্য জীবনের প্রকৃত শান্তি। ইসলামের চোখে পিতা-মাতা, দারা-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, গরিব-দ্বীন-দুঃখী এবং অন্যান্য সকলের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব, সেটাকে যথাযথভাবে পালন করাটাই মনুষ্য জীবনের মূল ও মুখ্য ধর্ম। মহানবীর ঐ ছোট্ট বাণীটির তাৎপর্য এখানেই । এবং হযরত ওমর ছিলেন মহানবীর বাণীর মহান তাৎপর্যময় নিরিখেই ইসলামের একজন প্রকৃত ধার্মিক মুসলমান।

মহানবী তাঁর জীবিতকালেই দশজন (আশারা-ই-মুবাশ্‌শরাহ) সুসংবাদ প্রাপ্ত ভাগ্যবানদের মধ্যে ওমরকে একজন বলে উল্লেখ করেছিলেন: বাকি ন'জন—আবুবকর, ওসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, সাদ-বিন-আবি-ওক্কাস, আব্দুর রহমান-বিন-আউফ, উবাইদাহ-বিন-জররাহ্ ও সায়িদ-বিন-যায়েদ।

খলিফা ওমর তাঁর জীবনের শেষ দু'বছর প্রত্যহ রোজা রাখতেন। এবং প্রতি বছর হজ সমাপন করতেন, হজে তিনিই ইমামতি বা নামাজ পরিচালনা করতেন। শেষের বছর মক্কা হতে মদিনাতে ফেরার পথে (২৩ হিজরী ৬৪৪খ্রীঃ) আবতার নামক কঙ্করময় প্রান্তরে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন ও দু'হাত তুলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানান—"হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্! আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, আমার সব অঙ্গই আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে, আমার যাবার সময় আগতপ্রায়।" এর দেড় মাসের মধ্যেই খলিফা তাঁর জীবনের সব দায়ভার মিটিয়ে দিয়ে সেই এক মহান আল্লাহর নিকট ফিরে যান। মহাজীবন মহাপ্রস্থান লাভ করল। মানব সমাজ হারাল তার শ্রেষ্ঠ জন, শ্রেষ্ঠ ফসল, যে ফসল আজও চির শ্যামল, চির সবুজ।

বিজিত ও বিধর্মীদের প্রতি ওমর :

খলিফা ওমর ছিলেন চির সংস্কারমুক্ত মন। তিনি কতখানি সংস্কারমুক্ত ছিলেন, সেটা তাঁর কর্মধারা হতেই বোঝা যায়। যে কোন রকমের অন্ধবিশ্বাসকে তিনি শুধু প্রত্যাখ্যানই করতেন না, সভ্যতার পথে শত্রু বলে মনে করতেন। কাবা শরিফের হাজরে আসোয়াদ পবিত্র কালো পাথরটি সম্পর্কে তিনি

বলেছিলেন—'এটাকে স্বয়ং মহানবী চুম্বন না করলে তুলে ফেলে দেওয়া হতো।' আবার হজের সময় মুসলমানগণ তিনবার মৃদু দৌড়-সহ কাবা শরিফ প্রদক্ষিণ করেন। একে বলা হয় 'রমল'। এর পেছনের ইতিহাস—মহানবী যখন মদিনা হতে মুসলমানদের নিয়ে মক্কাতে হজ সমাপন করতে আসেন, তখন অমুসলমানগণ তাঁদের ঠাট্টা করে বলেছিল—'ওরা অভাবে-অনাহারে রোগা ও দুর্বল হয়ে গেছে।' এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন মৃদু দৌড়-সহ তওয়াফ্ বা প্রদক্ষিণ করতে। সেই হতে এটা প্রথাতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে ওমর বলেন—'রমল আর বাধ্যকর নয়, কেননা সেই পরিস্থিতি বা পরিবেশ কোনটাই নেই।' শাহ্ ওয়ালীউল্লার মতে, "মহানবীর পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত থাকায় খলিফা ওমর ওটাকে বন্ধ করেননি।" আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, "মানুষ 'রমল'-কে সুন্না মনে করে, কিন্তু তা নয়।" এককথায় খলিফা ধর্মের গোঁড়ামিকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন। খলিফা সংস্কারমুক্ত মনেই ধর্মকে গ্রহণ করতেন।

খলিফার এই সংস্কারমুক্ত মনই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে ভালবেসেছিল। বিজিত ও বিধর্মীদের প্রতি খলিফার আচরণ কেমন ছিল, তা তাঁর সামান্য কয়েকটি কাজের দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাবে। সারা বিশ্বের অজেয় বীর মুসলিম জাহানের 'সাইফুল্লাহ' খালিদ বিন ওয়ালিদকে খলিফা পদচ্যুত করেছিলেন, যে কয়েকটি কারণে, তার অন্যতম কারণ ছিল—খালিদ বিজিত ও বিধর্মীদের প্রতি একটু নির্মম ও নিষ্ঠুর ছিলেন। দ্বিতীয় খলিফার আপন ভৃত্য ছিল খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী আসতিক। তৃতীয়,—মদিনায় ভূমি-রাজস্বের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন খ্রীস্টান। চতুর্থ,—বিশাল সাম্রাজ্যের ভূমি-রাজস্বের নথিপত্র লেখার জন্য অধিকাংশই খ্রীস্টান ও অগ্নিপূজকদের নিযুক্ত করেছিলেন। ইমাম বুখারী ও শাফী বলেন,—খলিফা ওমর নির্দ্বিধায় খ্রীস্টান রমণীর কুজার পানি দ্বারা ওজু করতেন। বাগাবী বলেন,—খলিফা ওমর খ্রীস্টানদের তৈরি পনীর খেতে ভালবাসতেন। সূরা মায়েদা ৫ : ৫। এককথায় জিম্মি, বিজিত-বিধর্মী মানুষদের প্রতি খলিফাব দয়া ও মায়ার কোন শেষ ছিল না। আজকের দিনে খলিফা ওমর সারা বিশ্বেরই সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের জন্য প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ।

জ্ঞানী-গুণীদের গুণগ্রাহী ওমর :

খলিফা ওমর চিরদিনই অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। যার জন্য তিনি মহানবীর প্রবীণ ও জ্ঞানী সাহাবীগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যে কোন কঠিন সমস্যা ও বড় মাপের কোন কাজ করতে হলে খলিফা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মজলিশ-ই-শুরার সভা ডাকতেন, যে সভাতে সভ্য ছিলেন বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি, যেমন ওসমান, আলী, উবাই-বিন-কাব, যায়েদ-বিন-সাবিত, আব্দুল্লাহ-বিন-মাসুদ, আব্দুর রহমান, তালহা, যুবাইর প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এখানে একটি কথা পরিষ্কার

হওয়া প্রয়োজন যে, খলিফা কোনদিনই মানুষের জ্ঞান গরিমাকে মানুষের বয়ঃসীমাতে আবদ্ধ করেননি। যখনই তিনি কোন তরুণ জ্ঞানীর পরিচয় পেতেন, তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে শতবার শতদিকে উৎসাহিত করে দরবারে স্থান দিতেন, যেমন জ্ঞানবীর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ। যাঁকে তিনি 'জ্ঞানের জাহাজ' বলে অভিহিত করেছিলেন, যাঁর অকাল মৃত্যুতে তিনি শোক ভরে বলেছিলেন—"মুসলিম-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষ আজ বিদায় নিল।" আবু-যর গিফারীর মতো মহান বিপ্লবীকে তিনি অন্তরের সাথে শ্রদ্ধা করতেন। এককথায় যে কোন জ্ঞানী ও গুণীকে শ্রদ্ধা দর্শনে কোন দুর্বলতা কোনদিনই খলিফাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এমনি ছিল তাঁর অসাধারণ গুণগ্রাহী মননশক্তি ও মানসিকতা।

কাব্যপ্রেমিক ওমর :

খলিফা ওমর চিরদিনই ছিলেন কাব্যপ্রেমিক ও কবি-ভক্ত মানুষ। তিনি নিজেও ছিলেন কবি-সাহিত্যিক ও সুবক্তা। তাঁর সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন—মুতাম্মিম। কবির ভ্রাতা মালিক খালিদের হাতে যুদ্ধে মারা গেলে কবি এমনি এক মর্মস্পর্শী ভাষায় শোকগীতি রচনা করেন, যা শুনে খলিফা অভিভূত মনে কবিকে আপন দরবারে ডেকে সম্মান জানিয়ে বলেন, "তোমার মতো আমার শক্তি থাকলে, আমিও আমার পুত্র যায়েদের জন্য অনুরূপ শোক গীতি রচনা করতাম।" তাঁর সমকালীন সকল সাহিত্যিকই এক বাক্যে স্বীকার করেছিলেন—ওমর ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ কবিতা-সমালোচক। ওমরের চোখে ইমরুল-কায়েস ছিলেন কবি-সম্রাট। খলিফা তাঁর বাল্যকাল হতেই যখনই কোন ভাল কবিতা পেতেন, সঙ্গে সঙ্গে মনের আবেগে সেটাকে মুখস্থ করে ফেলতেন। এইভাবে অজস্র কবিতা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে, সমস্যায়-সমাধানে খলিফা বিভোর মনে কবিতা আবৃত্তি করে কখনও মনে শান্তি পেতেন, কখনও সমস্যার সমাধান করতেন, কখনও আপন মনে, অবচেতন মনে কোন এক স্বর্গীয় লোকে, অজানা লোকে গমন করতেন। ক্ষণিকের মধ্যে দুঃখময় সংসারের, কঠিন সমস্যার সকল যন্ত্রণাকে ভুলে যেতেন। তখন খলিফা ওমর ভাবময়, ভক্তিময় ও প্রেমময় ওমর রূপে দেখা দিতেন।

কবিতা জগতে খলিফা ওমরের আরো দুটো বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি প্রবলভাবে কবিদের উৎসাহিত করতেন—মনুষ্যত্ব-মহত্ব, স্বাধীনতা-আত্মসচেতনতা, পরোপকার, সাহিষ্ণুতা-উদারতা ইত্যাদির ওপর কবিতা রচনার জন্য। যা মানব চরিত্রের উত্তরোত্তর উত্তরণ ঘটায়। এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন অশ্লীল কবিতা রচনা, যা মানব চরিত্রকে কলুষিত করে একদিন সমগ্র মানব সমাজকে করে ক্ষতবিক্ষত ও মহাক্ষতিগ্রস্ত।

বাগ্মী ও লেখক :

খলিফা ওমর ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী ও ক্ষুরধার লেখক। তাঁর অসাধারণ বাক্‌শক্তি ও ব্যক্তিত্ব মহানবীর ইন্‌তেকালের পরই খেলাফতের মহাসঙ্কটকালে ইসলামের ডুবন্তপ্রায় তরীকে তীরে এনে যে তুলনাবিহীন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ইসলামের ইতিহাসে কোনদিনই মলিন হওয়ার নয়। তিনি এমনি উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিতে পারতেন, যেন মৃত ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পেত, তাঁর খেলাফতের প্রথম ভাষণ—"হে মহিমাময় আল্লাহ্! আমি জন্মগত কঠোর, আমাকে কোমল করো, আমি দুর্বল, আমাকে সবল করো। আরববাসীরা এখনও বিশৃঙ্খল উটের মতো, কিন্তু তার নাকের দড়ি আমার হাতের মুঠিতে, তুমি আমাকে সাহায্য করো তাকে সরল পথে সঠিকভাবে চালাতে।" খলিফা জীবনে একবারও লিখিত ভাষণ দেননি। আরবে রাজনৈতিক বক্তা বলতে ওমরই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। যত বড়ই সভা-সমিতি হোক, তাঁর গুরু-গম্ভীর ভাষণ, তাঁর অকৃত্রিম ও আন্তরিক আবেদন সমাগত বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীকে ক্ষণিকের মধ্যেই স্তব্ধ করে দিতেন, জয় করে নিতেন তাদের অন্তর ও আত্মাকে। বর্তমান রাশিয়া ও চিনের মতো কোটি কোটি মানুষকে বন্দুকের নলে বধ করে একটি মানুষকেও বশ করার মতো দুর্ভাগ্য তাঁর সমগ্র জীবনে একটিবারও ঘটেনি। এমনি ছিল তাঁর বক্তৃতা, বাগ্মীতা ও সহৃদয় ব্যক্তিত্ব।

এরই নাম মানব-মহত্ত্ব, এরই নাম আচরণের জন, মনুষ্যত্বের জয়, মানবতার জয়। খলিফা ওমর সেই মনুষ্যত্বের মহা আচার্য বিজয়ী বীর বাগ্মী। খলিফা ওমর লেখক হিসাবেও যে যশ-মান-খ্যাতির পরিচয় রেখে গেছেন, তা আজও বিশ্বের বুকে চির বিস্ময়।

হযরত ওমরের কৃতিত্ব : (Achievement of Omar-I)

সূচনা: বিশ্বের ইতিহাসে হযরত ওমরের খেলাফত, রাজত্বকাল একটি চির সমুজ্জ্বল অধ্যায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে, যে কয়েকজন মানুষ কৃতিত্বের স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন, হযরত ওমর তাঁদের অন্যতম। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন, অসাধারণ চরিত্রের আধার খলিফা ওমর ছিলেন একাধারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজেতা, প্রথিতযশা প্রশাসক, সমাজ-সংস্কারক, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, দূরদর্শী সংগঠক, অসাধারণ বিচারক, প্রজাবৎসল শাসক ও ন্যায়পরায়ণ খলিফা। একটি মানুষের চরিত্রে এতগুলি গুণের সমন্বয় খুবই কম দেখা যায়।

সমরকুশলী ওমর (রাঃ):

অধ্যাপক হিট্টি বলেন,—"আবুবকরের আমলের বিশ্বজয়ের উদ্দীপ্ত প্রেরণা ওমরের খেলাফতে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। শূন্য হতে আরম্ভ করে আরবীয় মুসলিম খেলাফত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হল।" নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র মহানবীর ওফাতে নিদারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এমনকি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের সময় রিদ্দা যুদ্ধে ইসলামের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠল। সেই দোদুল্যমান শিশুরাষ্ট্রকে হযরত ওমর শুধু প্রতিষ্ঠিতই করলেন না, সমগ্র আরবের দুরন্ত শক্তিকে বিশ্বজয়ের দুর্বারগতিতে পরিণত করলেন। নির্ভীক, দুর্দান্ত আরব বেদুঈনের উচ্ছৃঙ্খল মহাশক্তিকে হযরত ওমর মোড় ফিরিয়ে বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমর শক্তিতে পরিণত করলেন। হযরত ওমরের সামরিক দূরদর্শিতায় একদিন অসভ্য আরব ভূমিতে জন্ম নিল বিশ্ববিখ্যাত বীর খালিদ-বিন-ওয়ালিদ, আমর-বিন-আল-আস, সাদ-বিন-আবি-ওয়াক্কাস, ওকবা বিন নাফি প্রমুখ। যাঁদের নির্ভীক যুদ্ধ-তৎপরতায় বিরাট শক্তিধর পারস্য ও রোমের পতন সম্ভবপর হয়েছিল।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান:

অনেকে না জেনে কটাক্ষ করে থাকেন, কোরআন নয়, কৃপাণের শক্তিতে ইসলামের বিস্তার। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত খুবই অমূলক। বস্তুত হযরত ওমরের শাসনকালে অনেক বিধর্মী স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন। এর মূলে ছিল পবিত্র কোরআনের শিক্ষা এবং হযরত ওমরের অতুলনীয় ব্যবহার। সৈন্যবাহিনীর সুযোগ-সুবিধার জন্য হযরত ওমর যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পারসিকগণ মুসলমানদের জন্য সেতু নির্মাণ করেন। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত কাদেসিয়ারের যুদ্ধে ডাইলামার নেতৃত্বে বহু পারসিক মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন। মুসলিম খলিফার অসাধারণ ব্যবহারে অতি মাত্রায় মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত রোমান

যোদ্ধা জর্জ ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁদের এই যুদ্ধ ছিল মানুষের মুক্তিতে মানবতার বিকাশে একজন অতি মানুষকে (খলিফাকে) সাহায্য করা।

ইসলামের সহিষ্ণুতা ও সাম্যে ওমর (রাঃ):

ইসলামের সাম্যাবাদ ও সহিষ্ণুতায় মুগ্ধ বিধর্মীগণ স্বেচ্ছায় ইসলামের পতাকাতলে যোগদান করেন। বস্তুত মুসলিম বিজেতাগণ পূর্বের তুলনায় ওমরের (রাঃ) আমলে অনেক কম কর আদায় করতেন এবং বিজিতগণ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্ম পালন করতে পারতেন। অকৃত্রিম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান সকল মানুষকেই ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। বিজিতগণ লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিজেতাগণ সত্যিকারের মানবতার পূজারী এবং হযরত ওমর ঐ মানবতার মূর্ত প্রতীক।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম প্রশাসক ওমর (রাঃ):

সাম্রাজ্য জয় অনেকেই করেছেন, কিন্তু সাম্রাজ্য সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার মতো প্রতিভা সকলের মধ্যে দেখা যায় না। হযরত ওমর এর ব্যতিক্রম। তিনি শুধু বিশাল ইসলাম রাজ্য গঠন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি শান্ত হয়েছেন, শান্তি পেয়েছেন সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে। তিনি এমন এক সর্বজনগ্রাহ্য শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, যা আজও যে কোন প্রশাসকের নিকট অনুকরণীয়। তাঁর শাসনব্যবস্থায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সম-সুযোগ পেয়েছিলেন। কেননা, হযরত ওমরের মূলনীতি ছিল, মানুষের সেবা, মানবতার উত্থান, এক আল্লাহর জয়গান। মহানবীর এই মহান ব্রত ও লক্ষ্য হতে তিনি কোনদিন এক পা-ও সরে যাননি। যার ফলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সুখে বাস করেছে তাঁর খেলাফতে। অধিকন্তু অনেকেই মুগ্ধচিত্তে যোগদান করেছে তাঁর বাহিনীতে। এইভাবে ওমর একটি বিশাল আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে যান, যার মূলে ছিল—শান্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সংহতি, এককথায় বিশ্ব-মানবের সেবা ও বিশ্ব-স্রষ্টার বন্দনা।

তাঁরই প্রতিভাপ্রসূত আরব জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনী। আরব সেনাবাহিনীকে নিখুঁত ও অক্ষত রাখার জন্য শত্রুভাবাপন্ন ইহুদি ও খ্রীস্টানদের ভূসম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্য দান করে আরব ভূখণ্ড হতে বিতাড়িত করেন। এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে জায়গীরদার প্রথার বিলোপ সাধন করেন। এই সকল সিদ্ধান্তে সমরকুশলী ওমরের সামরিক পারদর্শিতার ও বিচক্ষণতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।

হযরত ওমরের প্রতিষ্ঠিত 'মজলিস-উস-শুরা' পরামর্শসভা (Parliament House) আজও বিশ্ব-গণতন্ত্রের সূর্যের সম্মান লাভ করছে। তিনি এক বাক্যে ঘোষণা করেছিলেন—"পরামর্শ ব্যতীত কোন খেলাফত চলতে পারে না।" অর্থাৎ গণতন্ত্র ব্যতীত কোন রাজ্য চলা উচিত নয়। স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রকে

তিনি অন্তরের সাথে ঘৃণা করে গেছেন। রাস্তার সামান্য দীনাতিদীন ভিখারিকেও তিনি ভোটের সুযোগ দিতেন। অতি সামান্য একজন মহিলারও প্রকাশ্যে সমালোচনার সুযোগ ছিল। হযরত ওমর ছিলেন এমনি একজন গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক, যা পৃথিবী আজও জন্ম দিতে পারেনি।

হযরত ওমর যে শুধু একজন প্রশাসনিক প্রতিভাধর পুরুষ (Administrative Genius) ছিলেন, তাই নয়। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক। মহানবীও প্রথমে ছিলেন একজন সমাজ-সংস্কারক, পরে একজন নবী-রসুল। তাই তাঁর যোগ্যতম শিষ্য (উম্মৎ) খলিফা ওমরও (রাঃ) ছিলেন একজন দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক। তাঁর এক হাতে ছিল সমাজের শাসন এবং অন্য হাতে ছিল সমাজের সংস্কার।

হযরত ওমর কোনদিনই ক্ষমতালোভী ছিলেন না। তাই তিনি সবসময় সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ পছন্দ করতেন। কেন্দ্র হতে গ্রাম স্তর পর্যন্ত তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন। এবং তাঁর শাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলিত শিকলের মতো যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিল। বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর বিশ্বের বুকে তিনিই প্রথম অনুভব করলেন—নিখুঁত ও ন্যায়বিচার পেতে হলে বিচারবিভাগকে স্বাধীন করতে হবে, সাধারণ প্রশাসন থেকে বিচারবিভাগকে পৃথক করতে হবে। বিচারবিভাগ পৃথকীকরণে তিনিই পথিকৃৎ।

সমাজের দুর্বল, অসহায়, অন্ধ, খোঁড়া, বেকার, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অনাথ প্রভৃতি সকলের জন্যই তিনি সরকারি ভাতার ব্যবস্থার প্রচলন করেন। হযরত ওমরের পূর্বে বিশ্বে কোথাও এই ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়নি। এই ব্যবস্থাকে নিখুঁত করার জন্য এবং শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য তিনি বিশ্বে প্রথম আদমসুমারীর (লোকগণনা) প্রবর্তন করেন।

বর্তমান মুসলিম জাহানে আজ হিজ্‌রী সন প্রচলিত। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) মক্কা হতে ইয়াস্‌রেবে (বর্তমান মদিনায়) হিজরত (গমন) করেন, তখন হতে হিজরী সন গণনা করা হয়। কিন্তু এই হিজ্‌রী সনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হযরত ওমর (রাঃ), পরামর্শদাতা ছিলেন হযরত আলী।

সরকারি কোষাগার স্থাপন ওমরের (রাঃ) অমর কীর্তি। সাম্রাজ্য বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে আয়ও প্রভূত পরিমাণে বেড়ে উঠল। তখন খলিফা বায়তুল মাল বা সরকারি কোষাগার স্থাপন করলেন। এর মালিক ছিল শুধু জনসাধারণ। পরবর্তীকালে কুখ্যাত আমির মুয়াবিয়া নির্লজ্জভাবে একে আপন ব্যক্তি-সম্পত্তিতে পরিণত করেন।

এছাড়াও খলিফা বাণিজ্য ও কৃষি উন্নয়নের জন্য বহু খাল খননের ব্যবস্থা করেন। তাইগ্রিস হতে বসরা খাল, লোহিত সাগর হতে নীলনদের খাল,

এবং আরো ছোটখাটো বহু খাল (ক্যানাল) খনন করে কৃষি ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। অতঃপর পথঘাট ও শহর, বহু রাস্তা, বহু স্নানাগার ইত্যাদি তাঁর খেলাফতে নির্মিত হয়।

বিশ্ব-মানবের মুক্তিদূত, জগৎ স্রষ্টার শেষ দূত, শ্রেষ্ঠ দূত মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) দুর্গত মানবতার সেবায় মানুষের মুক্তিতে ঘোষণা করেছিলেন—"দাস মুক্তি আজ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ।" মহানবীর মুখে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত উম্মত, যাঁদের কাছে যতগুলি দাস ছিল তাদের মুক্ত করে দিলেন! অতঃপর মহানবী ধনীর নিকট যখন একই বাণী ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর ধনী উম্মতগণ বিধর্মীর নিকট হতে দাস কিনে আজাদ করতে আরম্ভ করলেন। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) কর্তৃক অত্যাচারী উমাইয়া বিন খালাফের নিকট হতে ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রাঃ)—কে ক্রয় করে মুক্তিদান এর জ্বলন্ত প্রমাণ। পরবর্তীকালে খলিফা ওমর (রাঃ) মহানবীর এই মহান বাণীকে মর্মে মর্মে অনুধাবন করে সমগ্র ইসলামি রাজ্যে দাসত্ব প্রথার বিলোপ সাধন করে মানবতার ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। খলিফা ওমর শুধু এখানেই ক্ষান্ত ছিলেন না, যে কোন যুদ্ধবন্দীকে দাস রূপে বিক্রি করা বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তি ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি হিসাবে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক-জীবন, সমাজ-জীবন কোন রকমেই বিঘ্নিত হতো না। এর পরিবর্তে তারা তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জিজিয়া নামক কর দিত। এর জন্য তারা মুসলমানদের ন্যায় ভাতা ও সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।

মহানবী নারী জাতিকে অসামান্য সম্মান দান করেছিলেন। খলিফা ওমরও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের সেবায় যেমন আরব নারীদের নিযুক্ত করা হতো। তেমনি সকল শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের সম মর্যাদা দান করা হয়েছিল। এমনকি কতিপয় বিবাহিত নারীর অনুরোধেই খলিফা প্রতিটি সৈনিকের তিন হতে চার মাস পর পর বাড়ি ফেরার অনুমতি দেন ও পরবর্তীকালে প্রথাটিকে কানুনে পরিণত করেন। মায়ের জাতিকে তিনি সত্যিকারেই মাতৃ-মর্যাদা দান করেছিলেন।

সবের পর খলিফা একটি বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। সেটা ছিল তাঁর দারুণ শিক্ষানুরাগ। শহর হতে গ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি স্থানে তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার জন্য মনঃসংযোগ করেন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিটি মসজিদ সংলগ্ন স্থানে মক্তব স্থান পেল, যা আজও সারা মুসলিম জাহানের প্রবাদ বাক্য "মসজিদ মক্তব" নামে পরিচিত। এই মক্তবগুলো ছিল শিক্ষার আদি কেন্দ্র। এইভাবে প্রজাবৎসল খলিফা রাজ্যের নানা স্থানে

স্কুল, হাসপাতাল, মাদ্রাসা, সড়ক, নগর, মসজিদ প্রভৃতি স্থাপন করেন। উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য সে যুগের জ্ঞানী-গুণীদের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেন। যেমন প্রখ্যাত পণ্ডিত নীতিশাস্ত্রবিশারদ ইবাদাতকে হিমসে, সায়াদ বিন জাবোলকে প্যালেস্টাইনে, আবু দারদকে দামেস্কে নিযুক্ত করেন। জোসেফ হেল বলেন—"মুসলমানগণ কেবলমাত্র আরবেই নয়, বরং সমগ্র বিজিত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এমন সমস্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যার দৃষ্টান্ত প্রাচীনকালে অথবা খ্রীস্টান রাজ্যেও পাওয়া যায় না।" খলিফা ওমর এমন সব বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, যা বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম খেলাফতকে পৃথিবীর রাজশক্তিতে পরিণত করেছিল। শুধু তাই নয়, সমগ্র ইউরোপকে জ্ঞানের আলো দান করে। ইউরোপের 'রেনেসাঁ' বহু অংশে মুসলিম খেলাফতের নিকট ঋণী। ইসলামের আলো বিকীরণ ব্যতীত তদানীন্তন ইউরোপের রেনেসাঁ কোনদিনই সম্ভব হতো কি না কে জানে।

সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র রূপে কুফা, ফুসতাত ও বসরা শহর গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই তিনটি শহরে জগদ্বিখ্যাত মনীষীগণ জন্মগ্রহণ করেন, যেমন—বসরার ইমাম হাসান বসরী, কুফার আবু হানিফা ও তাঁর যোগ্যতম শিষ্য আবু ইউসুফ প্রভৃতি। শিবলী নোমানী বলেন—"আমর-ইবন-আল-আসের শাসনকালে ফুসতাত, কুফা ও বসরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়।" পারস্য, রোম ও মিশর ইসলামি শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত হলে ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ক্রমবিবর্তন ধারা লক্ষ্য করা যায়। তাই ভেরহোভেন বলেন—"এর ফলে অকৃত্রিম আরবী ইসলাম আন্তর্জাতিক ইসলামের মর্যাদালাভ করে এবং প্রাচীন সভ্যতার সম্পদগুলো আহরণ করে।" এখানে কোন রকমের ভণ্ডামি ছিল না। বরং চিন্তার মুক্তি যথেষ্টভাবে কাজ করেছে। তাই সেদিনের মুসলিম সমাজ প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহকের দাবি রাখে। এই কথাকেই পূর্ণ সমর্থন করে বেকার বলেন—"ইসলামের বিচ্ছিন্নতা হতে মুক্তি পেয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার উত্তরাধিকারী হল"।

হজরত ওমরের সাফল্য বা বিজয়ের প্রধান কারণ :
(Casuses of Success of Omar-I)

১. অসংখ্য যোদ্ধার স্বর্ণযুগ : আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর (রাঃ) কেন এত সাফল্যলাভ করেছিলেন? কেন তাঁর সময় ইসলামের শান্তি-পতাকা সাম্যের বাণী এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ সারা বিশ্বে প্রায় অর্ধেক স্থানে আসন লাভ করল? নিঃসন্দেহে বলা যায় ওমর চরিত্র তার প্রধানতম কারণ। কিন্তু এছাড়া আরো কিছু কারণও ছিল। অধ্যাপক হিট্টি বলেন,--"মহানবীর পরলোক গমনের পর অনুর্বর আরব দেশ কোন এক যাদুমন্ত্রের স্পর্শে যেন অসংখ্য বীর ও অতুলনীয় যোদ্ধা উৎপাদনের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হল, যাঁদের সংখ্যা ও গুণাবলীর সমকক্ষ আর কোথাও পাওয়া দুষ্কর ছিল।" তাই তাদের সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী গতির মুখে সারা পৃথিবী যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। ঠিক অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন এইচ.জি.ওয়েলস—"আরব ভূমি সহসা একটি অতুলনীয় যোদ্ধাদের বাগানে পরিণত হল। এবং তাঁরা যে সামবিক অভিযান আরম্ভ করলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়। খালিদেব ন্যায় দক্ষ রণকুশলী এবং কর্তব্যপরায়ণ যোদ্ধাগণ যেন তারকামণ্ডলে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।" হযরত ওমরের ন্যায় প্রশাসক সারা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি তাঁর মাত্র দশ বছর খেলাফতকালে (৬৩৪-৬৪৪খ্রীঃ) বিশ্বের ইতিহাসে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার কোন তুলনা নেই। এই অতুলনীয় কাজ করতে যাঁরা তাঁকে দিবারাত্র দেহ ও প্রাণ দুই-ই দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা আরবের অসংখ্য অমর যোদ্ধা। যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন আরবের স্বর্ণযুগ।

ধর্মীয় কারণ : সমগ্র আরব জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, সংঘবদ্ধ করা, সুসভ্য করা এবং একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা, সমস্ত কিছুর মূলে ছিল এক অনাবিল আপোসহীন ধর্মীয় চেতনা। যে চেতনার বীজ বুনে গিয়েছিলেন মহানবী নিজ হাতে। তাই আজ মহীরুহ, তাই আজ সবুজ শালবন, শ্যামল শস্যক্ষেত্র। আরবের মাটি তখনও মরূদ্যান, মরুভূমি, কিন্তু আরববাসীর মনের মাটি তখন আর ঊষর মরু প্রান্তর নয়, জাগ্রত জীবনের জীবনগাথায় জয়ী বীর সন্তানদের সূতিকাগৃহের স্বাক্ষর ভূমি। এই ধর্মীয় চেতানাতেই আরব মুসলমানগণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সাড়া দেন। কোন লোভ, কোন ভয় তাঁদের পরাস্ত করতে পারেনি। তাঁরা যেন অনিবার্যভাবে তাঁদের প্রিয় রসুলে আকরাম হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট হতে এমন দুটো বীজমন্ত্র পেয়েছিলেন, যা আজও বিশ্বের কোন সেনাবাহিনীই পাননি। যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান জয়ী হলে,

তাঁরা 'গাজী' হবেন; এবং মৃত্যুবরণ করলে তাঁরা হবেন 'শহিদ'। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্র হতে কোন মুসলমান সেনাই খালি হাতে বাড়ি ফেরেননি। ইহকালে পেলেন গাজীর মর্যাদা, পরকালে পেলেন শহিদের সম্মান। মুসলমানগণ কোনদিনই ধর্মপ্রচারের জন্য যুদ্ধ করেননি। যে কোরআনকে ভিত্তি করেই তাঁরা পেয়েছিলেন অসীম অনুপ্রেরণা, সেই কোরআনই ঘোষণা করেছে—'ধর্মে বল প্রয়োগ নেই।' সুতরাং যাঁরা বলেন ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, এক হাতে কোরআন ও অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে, তাঁরা ইসলামের আদি-অন্তের কোন খোঁজ না রেখেই কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো বিভ্রান্তিকর বর্ণনা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেন। যেখানেই মানবতার পতন ঘটেছে, সেখানেই মুসলমানেরা ছুটে গেছেন। সেই দুর্বার গতির মূলে ছিল ইসলামের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। ইসলাম ধর্ম শুধু আল্লাহ্‌ভিত্তিক নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে কর্মভিত্তিক, সংসারভিত্তিক, সমাজভিত্তিকও বটে। সমাজের 'শান্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব' তার আপোসহীন চাহিদা। এই চাহিদা সংগ্রামে ইসলাম সম্প্রসারিত হল এবং অর্জন করল আন্তর্জাতিক খ্যাতি। যাতে শক্তি ও সাহস দিল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা।

অর্থনৈতিক কারণ : বিশ্ব-সমাজের যে কোন বড় ঘটনার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল থাকে। মহানবীর প্রথম যে বিপ্লব, তা ছিল আরবের বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব। সুতরাং সেখানেও দেখা যায় অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান। আবার হযরত ওমরের সময় আরব যখন সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পেল, বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন আরব বিশ্বের সাথে মিলিত হল, তখনই অনুর্বর আরবের অসংখ্য মুসলমান জানতে পারলেন খাদ্যের সন্ধান আছে অন্য কোথাও। তখন তাঁদের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা অর্থনৈতিক তাগিদে আরো প্রবল হয়ে উঠল। তাঁরা দলে দলে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করলেন সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা দেশের সন্ধানে। তাই ইসলামের ইতিহাসের প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ ইসলাম সম্প্রসারণের মূলে তার ধর্মীয় কারণ যতটা আছে, তার অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণ অনেক বেশি আছে বলে মনে করেন। ধর্মীয় কারণে আরব অভিযানের আরম্ভ এবং অর্থনৈতিক কারণ সেই অভিযানকে সুসংহত করেছে প্রয়োজনের তাগিদে। সুতরাং ধর্মান্ধতা নয়, অর্থনৈতিক কারণেই আরব বেদুইন অনুর্বর অঞ্চল হতে উর্বর ভূখণ্ডের দিকে বিজয়যাত্রা শুরু করল।

রাজনৈতিক কারণ : একটা দেশের বা জাতির উত্থান যে সমস্ত কারণে হয়ে থাকে, পতনও তার বিপরীত কারণেই ঘটে থাকে। আরবের পতনের মূলে ছিল রাজনৈতিক অরাজকতা ও বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা। মহানবী যখন আরবের রাজনৈতিক হাল ধরলেন, তখন হতে আরব লাভ করল এক সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ, হযরত আবুবকরের সেই পরিবেশ মহানবীর প্রবর্তিত

সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করল, হযবত ওমব-প্রশাসনে তা আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ইসলামের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পার্শ্ববর্তী সকল দেশকে অনুপ্রাণিত করে তুলল। রাজনৈতিক অরাজকতা বলতে কোথাও কিছু ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ হেন পরিচ্ছন্ন পরিবেশেব জন্য হযরত ওমর বিধর্মীদের নিকট হতেও দেবতার শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। তাঁব অভূতপূর্ব সাফল্যের মূলে এটাও ছিল একটি কারণ।

সামাজিক কারণ: সমাজের বৈষম্যমূক ব্যবস্থা যে কোন সমাজজীবনকে অস্থিরতা দান করে। যখন ইসলাম তার সামাজিক অনুশাসনগুলিকে কঠোর হস্তে পরিচালিত করছে, তখন তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে সামাজিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চরমভাবে মাথা চাড়া দিয়ে জনগণকে এক চরম বিতৃষ্ণাব মধ্যে এনে হাজির করেছে। এই সুযোগে ইসলাম তার সামাজিক ব্যবস্থাপনায সকলকে মোহিত করে তোলে। এই সময় বহু বিজিত দেশের জনসাধারণ মুসলমানদেব সাথে খোলাপ্রাণে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যোগদান করেন। এবং তাঁদের মধ্য হতেই কালক্রমে মাওয়ালী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সামাজিক বিপ্লব ও রাজনৈতিক বিবর্তনের জন্য মদিনা ছিল প্রাণকেন্দ্র। বিরাট পাবস্য বিজয, সিরিয়া বিজয় ও মিশর বিজযেব মূলে যে ইসলামের যাদুমন্ত্র কাজ করেছিল, তা ছিল রাজনৈতিক অরাজকতার অনিবার্য পতন, সামাজিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাব চির প্রস্থান। ইসলাম প্রথম সমাজকে কবেছে সুসংহত, পরে রাজ্যকে করেছে সুসংবদ্ধ। সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ওমবের এই বিচক্ষণতা তাঁব সাফল্যের গোপন রহস্য।

ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও আর্থিক তাগিদ ইসলামকে দিল সামরিক সাফল্য, আবার এই সামরিক সাফল্য পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মকে সারা বিশ্বেব এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সার্বজনীন ধর্মের আসন দান করল। হযরত ওমরেব এই বিজয শুধু আরবে নয়, সাবা বিশ্বে সৃষ্টি করল এক নব আলোড়ন। সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে আরবের বিজয় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই বিজয সমাজকে দিয়েছিল সামাজিক সুস্থ রূপ, মানুষ মাত্রকেই দিয়েছিল মানবিক মর্যাদা, রাজনীতিতে এনেছিল পূর্ণ শৃঙ্খলাবোধ। হযরত ওমরের ন্যায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি এই সমস্ত অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য অসাধারণ সাফল্যলাভ করেছিলেন। তবে তাঁকে যাঁরা অফুরন্ত মদত জুগিয়েছিলেন, তাঁরাও ইসলামের ইতিহাসে কম কিছু নন। তাঁদের মত অসাধারণ ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, রণকৌশল, ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি হযরত ওমরকে তাঁর বিরাট সাফল্যের চিরসঞ্জীবনী সুধা জুগিয়েছিল। যতদিন ইসলাম আছে, ততদিন আছে তার ইতিহাস। এই ইতিহাস হতে মহাবীর খালিদ, আমর, মুসান্না, আবু উবায়দা, সাদ বিন ওয়াক্কাসের নাম মলিন করে মহাকাল আজও সে শক্তি অর্জন করেনি।

সরলতার গোপন রহস্য: হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর কল্পনাতীত সফলতার চির সবুজ-স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শাসক হিসেবে একদিকে তিনি কুসুম অপেক্ষা কোমল, অন্যদিকে বজ্র অপেক্ষা কঠোর। প্রজাদের কল্যাণে তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা আজও সকল দেশ সমানভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি। সমাজ জীবনের এমন কোন স্তর নেই, যাকে তিনি স্পর্শ করেননি। শাসক ওমর, বিচারক ওমর, কৃষকদরদী ওমর, শ্রমিকের ওমর, সৈনিকের ওমর, অসহায় নর-নারীর ওমর, দুষ্টের দমনে ওমর, শিষ্টের পালনে ও পুরস্কারে ওমর সফলতার যে ছাপ রেখে গেছেন, তা বর্ণনাতীত।

সমগ্র সেনাবাহিনীর তিনিই ছিলেন একমাত্র কর্তাব্যক্তি। অন্যান্য সেনাপতিদের তিনি নির্দেশ দিতেন, তাঁরা পালন করতেন তাঁর নির্দেশ। সমগ্র সেনাবাহিনীর প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল, শত্রু ব্যতীত কোথাও যেন কোন মানুষের প্রতি এতটুকুও আঘাত না পড়ে। নারী ও শিশু কোথাও যেন এতটুকু আঘাত না পায়, সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রতি মুসলমান বাহিনীর আচরণ যেন আদর্শস্থানীয় হয়। প্রাণিজগৎ সম্পর্কেও তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল, কোথাও কোন প্রাণীর শরীরে যেন হাত না পড়ে, যদি সে নিহত শত্রুর ঘোড়াও হয়। সমগ্র প্রাণিজগৎকে তিনি আল্লাহর রহমত রূপে দেখে গেছেন। তাই প্রাণী মাত্রকেই তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। প্রকৃতিজগৎ সম্পর্কেও তিনি একই নির্দেশ দান করেন। গাছপালা, বৃক্ষ-লতা, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদিতে কোথাও যেন ধ্বংসের হাত না পড়ে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন—এগুলো সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকারের জন্য, ধ্বংসের জন্য নয়। বাড়িঘর, স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কেও তাঁর কঠিন নির্দেশ ছিল। কোথাও কোন স্থাপত্যশিল্পে হাত দেওয়া চলবে না। শত্রুর প্রার্থনাগার সদাই সুরক্ষিত থাকবে, এমন কি তাদের ঘরবাড়িগুলোও যেন ধ্বংস না হয়।

এইভাবে মহানুভব ওমর (রাঃ) এককথায় তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তোমরা যুদ্ধ করবে শুধু তোমাদের শত্রুদের সাথে, মনে রেখ, যুদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমিত থাকবে, সমগ্র দেশকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করবে না। ধ্বংস তোমাদের ধর্ম নয়। রক্ষাই তোমাদের ধর্ম। এমনকি কোন শত্রু আত্মসমর্পণ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আশ্রয় দেবে। যখনই ওমর (রাঃ) শুনতে পেতেন কোন বিধর্মীর প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর ক্ষোভে ও দুঃখে রক্তিমাভ হয়ে উঠত এবং কালবিলম্ব না করে তার বিচার করতেন। বিচারে তিনি যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, এক হাতে পিতার, অন্য হাতে পুত্রের প্রাণদণ্ড, পৃথিবী আজও কি পেরেছে! হয়তো আর কোনদিনই পারবে না। সমগ্র পৃথিবীর বিচারবিভাগ পূর্ণতালাভ করেছে গৌরবে ও সৌরভে মহানুভব ওমর (রাঃ)-এর বিচার দ্বারা। আচারে

লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত, মহানুভব ওমর (রাঃ) বিশ্বের সেই পরম পুরুষ পূতপ্রাণ পণ্ডিত।

প্যালেস্টাইন-জেরুজালেমের পতনের পর যখন সেখানকার পাদ্রী ও পণ্ডিতগণ মুসলিম সেনাপতির নিকট আবেদন করলেন—ইসলাম জগতেব আমিরুল মোমেনিন খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) স্বয়ং এখানে পদার্পণ করলে তাঁবা সকলেই তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করবেন তখন সেনাপতি একথা খলিফাকে জ্ঞাপন করলে তিনি আসার সম্মতি দিলেন এবং বের হলেন জেরুজালেমেব পথে একটি উট, একজন কোচোয়ান ও খলিফা। কিছুদূর আসতেই খলিফা উট হতে অবতরণ করলেন, এবং তাঁর কোচোয়ানকে অনুরোধ করলেন উটে চড়তে। কোচোয়ান প্রথম হতবাক। পরে অস্বীকার করলেন উটে চড়তে। তখন খলিফা তাঁকে নির্দেশ দিলেন—যদি তুমি আমার নির্দেশ মেনে না নাও, তাহলে উট নিয়ে ফিরে যাও। তখন কোচোয়ান বাধ্য হয়ে উটে চড়লেন। খলিফা উটের দড়ি ধরে এগোতে থাকলেন। এইভাবে যখন জেরুজালেমে হাজির হলেন, তখন কোচোয়ানেরই উটে চড়ার পালা। তাই কোচোয়ান উটেব পিঠে এবং খলিফা উটের রশি টানছেন।

এঁরা হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিত ও পাদ্রীগণ তাডাতাড়ি উটের ওপরে বসা খলিফাকে ফুল ও মালা দ্বারা অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত থাকলেন। চরম কোলাহল, কে কার কথা শোনে। এদিকে আসল খলিফা মহানুভব ওমর (রাঃ) তখন উটটিকে অন্য স্থানে একটি গাছে বাঁধতে ব্যস্ত আছেন। অত্যন্ত বিব্রত অবস্থায় কোচোয়ান তখন চিৎকাব কবে সকলকে জানিযে দিলেন—তিনি খলিফা নন, যিনি খলিফা, তিনি গাছে উট বাঁধছেন। তখন পণ্ডিত ও পাদ্রীগণ জানতে চাইলেন এরূপ কেন হল। তখন কোচোযান সমস্ত কথা জানিয়ে বললেন—এরই নাম ইসলামেব সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। তখন পণ্ডিত ও পাদ্রীগণ মহাবীর মহানুভব ওমর (রাঃ)-এর শবণাপন্ন হযে জানালেন—হে মহাবীর, হে মহানুভব, তোমার এই বীবত্বের কাছে বিশ্ব বিজয় কিছুই না। এই মহাসত্যের এই মহানুভবত্বের সঞ্জীবনী সুধাই মহানুভব ওমরের (রাঃ) বিরাট সফলতার সবুজ স্বাক্ষরে কালি জুগিয়েছিল।

তুমি এ জগৎ বুকে ফুল যদি হও
ছড়াবে সুবাস তব যেখানেই রও।
আমি এ সমাজ বুকে অমানুষ হলে
শ্রেষ্ঠ আমার জাতি কি ফল বলে।
তুমি এ জগৎ-বুকে চন্দ্র যদি হও
ছড়াবে তোমার জ্যোতি যে-জাতেই রও।

হজরত ওমরের (রাঃ) চরিত্র :
(Character of Omar-I)

হযরত ওমর ছিলেন লম্বা, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী, গৌরবর্ণ, কেশবিহীন মস্তক, প্রশস্ত বক্ষ, লম্বায়িত বাহু, প্রলম্বিত নয়ন, তেজদীপ্ত জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল। তাঁর প্রকৃতিগত পরিচয় বর্ণনাতীত। তাঁকে শোভিত ও সমৃদ্ধ করেছিল তাঁর অসমান্য ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ চরিত্রবল, অতুলনীয় আত্মত্যাগ, অভাবনীয় সরল ও অনাড়ম্বর জীবন, অচিন্ত্যনীয় প্রজাবাৎসল্য, অক্লান্ত উদ্দম ও কর্মস্পৃহা, অকৃত্রিম পাণ্ডিত্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বী রণকৌশল, নজিরবিহীন ন্যায়পরায়ণতা, বিরল বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ইত্যাদি।

মূইর বলেন—"সরলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠ ছিল তাঁর মুখ্য নীতি।" সরল জীবন যাপনে যে নজির তিনি সৃষ্টি করে গেছেন, তাকে আজও কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। পরনে থাকত অত্যন্ত কম দামী কাপড়, শরীরে থাকত তালিযুক্ত জামা, তখনকার দিনেও যাঁরা তাঁকে দেখেছেন সকলেই অবাক, বিস্ময় বোধ করেছেন। বর্তমান জগৎ তো অবিশ্বাস্য বলেই মনে করবেন। পারস্য যোদ্ধা হরমুজ বন্দী বেশে মদিনায় এসে মদিনার মসজিদে নববীতে যেভাবে খলিফাকে দেখলেন, তাতে তাঁর যেন দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছিল। হরমুজ প্রকাশ করেছিলেন—"জগৎ তোমার নিকট হার মানবে। যেহেতু জগতের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা তোমার নিকট হার মেনেছে।" এইভাবে একদিন খলিফা স্বয়ং যখন উটের রশি ধরে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নজিরবিহীন আদর্শ রূপে ভৃত্য বেশে জেরুজালেমে পৌঁছালেন, তখন তাঁরাও সকলেই একই কথা বলে উঠেছিলেন—কি অকল্পনীয় অপূর্ব চরিত্র!

প্রজাবৎসল ওমরকে কেউ দেখতে চান, দেখবেন খলিফা স্বয়ং সুখে ও দুঃখে রাত্রির অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রজাদের অবস্থা নিজ চোখে অবলোকন করার জন্য। কোথাও বা দরিদ্র বিধবা রমণীর জন্য আপন পিঠে ময়দার বোঝা বহন করছেন। এইরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত খলিফার জীবনে পাওয়া যায়। কোথাও বা আপন স্ত্রীকে দরিদ্র রমণীর রোগশয্যায় পরিচর্যার কাজে পাঠাচ্ছেন। মহাবীর খলিফা ওমরের বীরত্বের রহস্য লুকিয়ে ছিল এই সব বিরল দৃষ্টান্তে। ইসলামের চোখে প্রকৃত বীর তিনিই, যিনি ইচ্ছা ও কামনাকে আপন দাসে পরিণত করতে পেরেছেন, এবং তিনিই কাপুরুষ যিনি কামনার দাস।

মহানবীর অকৃত্রিম শিষ্য হযরত ওমর বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও জাঁকজমককে অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন। তিনি সব সময়ই বলতেন, "ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা মানব জীবনের সরলতা ও পবিত্রতাকে নষ্ট

করার শ্রেষ্ঠ পথ।” তাই এই দুটোর প্রতিই তাঁর ঘৃণার কোন অবধি ছিল না। এই কারণে মাদাইন ও জালুলার যুদ্ধ জয়ের পর প্রচুর ধনবত্ন তাঁব নিকট প্রেরিত হলে খলিফা ক্রন্দনরত অবস্থায় বলে উঠেছিলেন, “এই সমস্ত প্রচুর ধনরত্নের মধ্যেই তিনি তাঁর জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস লক্ষ্য করছেন।” পরবর্তীকালে উমাইয়া যুগে ঠিক তাই ঘটেছিল। সমগ্র উমাইয়া যুগে একমাত্র খলিফা দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত প্রায় সকলেই ধন-রত্নে ডুবে গিয়েছিলেন। তাঁরা ধন-রত্নকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আসলে ধন-রত্ন তাদের গ্রাস করেছিল। এই দিক দিয়ে খলিফা ওমরের ঐশ্বর্যের প্রতি যে অনীহা তা অবিস্মরণীয়। কোনদিনই তাঁর কোন দারোয়ান বা দেহরক্ষী ছিল না। তাঁর জীবন-চরিত সম্পর্কে বলতে গিয়ে হিট্টি বলেন, “হযরত ওমরের জীবনচরিত রচনাব জন্য অতি অল্প কথার প্রয়োজন, তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল সরলতা ও কর্তব্যজ্ঞান, তাঁর শাসনের মূল নীতি ছিল ন্যায়পরায়ণতা ও একাগ্রতা।”

হযরত ওমর ছিলেন ন্যায়বিচারক। বিচারবিভাগকে নিরপেক্ষ এবং নির্মল রাখার জন্যে শাসনবিভাগকে বিচারবিভাগ হতে পৃথক করেছিলেন। এবং নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করিছিলেন। কোন এক সময় উবাই-ইবন-কাব খলিফার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। খলিফা সরাসরি বিচারালয়ে হাজির হলে বিচারপতি জায়েদ বিন সাবিত উঠে দাঁড়ান, এবং খলিফা পবিত্র কোরআন স্পর্শ করে হলফ করতে গেলে বিচারপতি তাঁকে নিরস্ত করতে গেলে খলিফা এতই রুষ্ট হন যে, তিনি সেইখানেই ঘোষণা করেন যে, জায়েদ বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করার অযোগ্য। তিনি তাঁকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করেন। খলিফা ঘোষণা করেছিলেন—বিচারে ও বিচারালয়ে সকলেই সমান। খলিফার নিরপেক্ষ বিচারে ইসলাম জগতের মহাবীর খালিদও নিষ্কৃতিলাভ করেননি, পদ হারিয়েছিলেন। খলিফার ন্যায়বিচারে প্রিয় আপন পুত্র আবু সামাকে প্রাণ দিতে হল। খলিফার স্ত্রী আবু সামার গর্ভধারিণী মা, পুত্রহারা মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তাই খলিফা ওমরের ন্যায় বিচারের জন্য আজও বিশ্ববিচারালয় গর্বিত। আজও প্রবাদবাক্য—খলিফা ওমরের চাবুক অন্যের তলোয়ার হতেও অনেক ভয়ঙ্কর।

খলিফার সাম্যবোধ এত বেশি ছিল যে, তিনি মানুষে মানুষে কোন ব্যবধান রাখেননি। জেরুজালেমের পথে আপন ভৃত্য কোচওয়ানের সাথে নিজেকে এক করেছিলেন। আমর ইবনুল আসকে নির্দেশ দিয়েছিসেন—ফুসতাতের খাস দরবার, ও মসজিদের মক্‌সুরা ভেঙে ফেলার জন্য, যাতে মানুষে মানুষে কোন ব্যবধান রচিত না হয়। স্বজনপ্রীতিকে তিনি শুধু ঘৃণাই করতেন না, মানব জীবনের সুন্দরের পথে কাঁটা ও প্রশাসনের মারাত্মক ব্যাধি মনে করতেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই খলিফা ওমর ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী ও পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন—“হযরত ওমর (রাঃ) এক

হাজার মুসলিম আইন ও ব্যবহার তত্ত্বের ওপর, এবং বিবিধ প্রশ্নের ওপর মন্তব্য ও অভিমত প্রকাশ করে গেছেন।" তাই তাঁকে বিশিষ্ট আইনবিদ—মোফাস্সের (কোরআনের ব্যাখ্যাকারী) ও মোহাদ্দেস (হাদিসের ব্যাখ্যাকারী) বলে অভিহিত করা হয়। হিট্টি বলেন—"প্রকৃতপক্ষে মুসলিম কিংবদন্তীতে প্রাথমিক যুগের ইসলামের ইতিহাসে খলিফা ওমরকে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পরই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একজন খলিফার যে সমস্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন সেসব মহৎ গুণই হযরত ওমর (রাঃ)-এর ছিল। তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র সমস্ত ধর্মভীরু মানুষের জন্য আদর্শ স্বরূপ।"

দুটি দিক থেকেই আমিরুল মোমেনিন খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-কে আমরা পূর্ণ মানব রূপে পেলাম। দেহগত দিকে তিনি ছিলেন মহাবীর, মানসিকতার দিকে তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত। কোমলতার দিক থেকে ছিলেন ফুলস্বরূপ, কঠোরতার দিক থেকে ছিলেন বজ্রস্বরূপ। আমরা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করলাম—আলেকজাণ্ডারের নির্ভীকতা ও বীরত্ব, অ্যারিস্টটলের সূক্ষ্ম সাংগঠনিক ক্ষমতা, তৈমুরের কঠোরতা, নওসরিওয়ানের ন্যায়পরায়ণতা, ইব্রাহিমের ধর্মপরায়ণতা, ইমাম আবু হানিফার (রঃ) পাণ্ডিত্য, ইমাম শাফীর (রঃ) স্মরণশক্তি ইত্যাদি। এককথায় তিনি ছিলেন মহানবীর (সাঃ) পূর্ণ অনুসারী, পূর্ণ উম্মৎ, পূর্ণ মানব।

নবম অধ্যায়

চরিত্রে ওমর

জীবনের বিচিত্র অধ্যায়ে

জগতের বিরল জন

বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার, দার্শনিক সক্রেটিস, এরিস্টটল, মহানুভব সম্রাট নওশেরওয়া, তাপস কুলরবি, আব্দুল কাদির জিলানী (রঃ), খাজা মঈনুদ্দীন চিস্তি (রঃ), মওলানা জালালুদ্দীন রুমী প্রমুখ এই সমস্ত ব্যক্তি মহামানবেব একত্রে সমবেত ও সমষ্টিগত রূপ :—

আমিরুল মু'মেনিন
হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)

সমগ্র জগতে বা মুসলিম জাহানে একটি নিরুপম আদর্শ মানবেব কথা উঠলেই, সর্বপ্রথম যাঁব কথা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই প্রাণে সাডা দেয, তিনিই হযরত ওমর ফারুক। যিনি নবী ছিলেন না, বসুল ছিলেন না, তবুও তাঁব চরিত্রে এত বেশি গুণরাশির সমাবেশ হযেছিল, স্বযং দ্বীনেব নবী হযবত মহম্মদ (দঃ) বলেছিলেন—"আমাব পব কেউ নবী হলে, ওমব হতো।" আজ পর্যন্ত এই দুর্লভ সম্মান কোন মানুষই লাভ কবেন নি, 'ওমব' ব্যতীত। সেই মহান মানুষ, মহান চরিত্র।

কত জ্ঞানী ও গুণী যাঁকে দেখামাত্রই শ্রদ্ধায় নত হযে পডেছেন, কত দুরাচার যাঁকে দেখামাত্রই দুর্নীতি ভুলে গেছে, কত অসহায মানুষ তাঁকে পাওয়া মাত্রই নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে, কত অত্যাচারী পেযেছে আশু সাজা, কত জ্ঞানপাপী যাঁকে দেখামাত্রই জ্ঞান-সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে, যিনি দুর্বলের প্রতি ছিলেন কোমল হৃদয়, সবলের প্রতি ছিলেন কঠোর প্রাণ, যাঁর দুই নয়নে দ্বিসূর্য সদাই উদ্ভাসিত খরদীপ্ত মহামানব, তেজদীপ্ত মনস্বী, ধর্মেতে ছিলেন উদাব প্রাণ, কর্মেতে ছিলেন লৌহমানব, সত্যের ছিলেন মহাসহায়ক, মিথ্যার ছিলেন যমদূত, সরলতার ছিলেন সিদ্ধপ্রাণ, ভণ্ডামির ছিলেন বৈবী, কামনায় ছিলেন কল্যাণময়ী, রসনায় ছিলেন সত্যবাদী, সৎশীলদের চিরসহায়, অসৎশীলদের আযরাইল দুঃসংবাদে ভীত নন—সুসংবাদের জীবরাইল্, দ্বীন-দরিদ্রের দরদী বন্ধু—দুষ্টজনের দৈত্যস্বরূপ, সত্যের নিকট সহজ সরল—মিথ্যার নিকট দুর্বাব,

মিতব্যয়ীর পরম বন্ধু—অমিতব্যয়ীর চরম শত্রু, অকৃত্রিমের অন্তরঙ্গ—কৃত্রিমতার খোলা তরবারি, সংসারে নয় বিরাগী জন—সমাজেতে নয় স্বার্থপর, কামিনীতে নয় মোহগ্রস্ত—কাঞ্চনে নয় প্রলুব্ধ প্রাণ, কর্মক্ষেত্রে অতি রুক্ষ—বিচারালয়ে অতি সূক্ষ্ম, কার্যক্ষেত্রে কঠোরতায় বজ্রসম—কোমলতায় কুসুমতুল্য, চক্ষুতে যেন অগ্নিবাণ—অন্তরে ছিল মায়ের প্রাণ, দিবাতে ছিলেন একনিষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক—নিশীথে ছিলেন নিরঞ্জনের ভক্তপ্রেমিক, বিদ্রোহীদের কঠোর শাসক—শান্তজনের আপন ভাই, বাইরে ছিল সম্রাট রূপ—আপন ঘরে ফকির মানুষ, রাজা-বাদশা-সেনাধ্যক্ষ এক ধর্মতেই দিশেহারা—আবার কোথাও ঐ মানুষেরই আগমনে দিগ-দিগন্ত মুখরিত।

যাঁর চরিত্র গুণে এই পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য ঘটনাটি নীরবে ও নিঃসঙ্কোচে সংঘটিত হল—জেরুজালেমের (বাইতুল মোকাদ্দাস) মাটিতে অর্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর খলিফা ওমরকে আরবের কেনা দীনাতিদীন এক গোলাম রূপে উটের রশি ধরে দেখামাত্রই কত পাদ্রী আনন্দে আত্মহারা, কত পাদ্রী অবাক বিস্ময়ে অভিভূত, কত মানুষ কোন্ মহামন্ত্রে মোহাভিভূত; সৈন্যহীন সামন্তহীন কেবল একটিমাত্র মানুষের আল্লাকে চরিত্রবলে বিজিত হল পবিত্র জেরুজালেম বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, বিনা বাক্যে; নিপীড়িত নিষ্পেষিত মাতৃভূমির আবাল-বৃদ্ধবনিতা অগণিত মানুষের উল্লোসিত মুগ্ধ কণ্ঠে জেরুজালেমের ঘরে-ঘরে, মাঠে-ঘাটে, পাহাড়ে, প্রান্তরে বারবার যেন ঘোষিত হল, নিনাদিত হল নিখিল মানবের অন্তর ধ্বনি, নিখিল বিশ্বের উত্তম বাণী—

"হে বীর! তোমার এই অকল্পনীয় বীরত্বের মহত্ত্বে ও মনুষ্যত্বে কিছুই না বিশ্ব-বিজয়ও, তোমারই হাতে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি জেরুজালেমের নরক-যন্ত্রণা চিরতরে নিভে যাক, তোমারই হাতে বিশ্ব-শান্তি স্বর্গ-সুখে নেচে উঠুক; হে বীর! বিশ্ববীরের দরবারে, বিশ্ববীরের চির-বন্দনায় তোমার বীর্য ও বীরত্ব চিরবন্দিত হোক, চিরনন্দিত হোক; হে আচার্য! হে বীরের প্রাণ! আজ হতে অনাগত কালের শ্রদ্ধাস্নাত বিশ্ব-প্রাণের লও স্বতঃস্পন্দিত অভিনন্দন, শত শত পূত প্রাণের লও আলিঙ্গন শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শত সালাম।"

এই ছিল হযরত ওমর ফারুকের মহান জীবন ও মহৎ প্রাণের চিত্রপট, যিনি ছিলেন আল্লাহর নিকট শিশুস্বরূপ, বান্দার নিকট ওমর ফারুক।

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে—কাজে বড় হবে,
মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন
মানুষ হইতে হবে, এই তার পণ।"

আপন মুখে ওমর

সমগ্র গ্রন্থটিতে আমরা হযরত ওমর ফারুককে আমাদের আপন কথাতে জানবার ও জানাবার এবং চিনবার ও চেনাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন

মানুষকে যদি তাঁর আপন কথাতে আপন কাজে কিছুটা জানা ও চেনা যায়, তা অপেক্ষা মজা আর নেই। আমরা হযরত ওমর চরিত্রের ঐ অসাধারণ স্বাদটুকু আস্বাদন করার জন্য তাঁর কথাতেই তাঁকে একটি বার জানার ও চেনার চেষ্টা করবো—

হযরত ওমর ফারুক বলেন: (সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে)

(১) "অর্থ সম্পদ সম্পর্কে তিনটি পথ—

১। সর্বদা ন্যায়পথে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে,

২। ঐ অর্থ ন্যায়পথেই ব্যয় করতে হবে,

৩। অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করতে হবে।

স্বেচ্ছাচারীর এক গাল মাটিতে রেখে, অন্য গালে পা দিয়ে তাকে একেবারেই মাটিতে লুটিয়ে দেবো। যতক্ষণ সে ঐ পথ ত্যাগ না করে। মহান আল্লাহ্ তাঁর আপন বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর, তিনি ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ বলার অধিকার দেননি। তোমরা নিশ্চিত জেন রেখো—আমি তোমাদের স্বেচ্ছাচারী করিনি, আমি তোমাদের মোমেনদের পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করেছি। তোমাদের মধ্যে সৎ-জীবনই জনগণের অনুসরণের যোগ্য।

(২)'তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধি। স্থানীয় জনসাধারণের ওপর তোমাদের প্রভূত অধিকার আছে। আল্লাহ্ তোমাদের ধর্মকে চিরস্থায়ী করেছেন।'

আবু মুসা আশারীকে:

(৩) "জনসাধারণ সাধারণ শাসকবর্গকে ঘৃণার চোখে দেখে। আমি নিজকে ঐ ঘৃণা থেকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি। অযথা সন্দেহ পোষণ করো না, অযথা মানুষকে উচ্চাশায় উৎসাহিতও করো না। আল্লাহর হক ও মানুষের হক সম্পর্কে সদাই সচেতন থেকো। এইটাই সঠিক পথে থাকার একমাত্র পথ। অসৎ লোকদের কোন সময় একত্রিত হতে সুযোগ দিও না। যদি কোন জাতিকে অহেতুক মুসলিম রাষ্ট্র সম্পর্কে বিদ্বেষপরায়ণ দেখ, তাহলে তার শয়তানিকে অস্ত্রমুখে নির্মূল করাব চেষ্টা করো। তবে যদি তারা আল্লাহর বিধান মেনে সৎপথে আসে, তখন ক্ষমা করো।"

(৪) "আজ হবে, কাল হবে, এইভাবে কোন কাজকেই ফেলে রেখো না। ফলে এমন একদিন আসবে, যখন আর কোন কাজই হবে না। কাজই তখন প্রবল হয়ে উঠবে, তুমি হবে দুর্বল। মনে রেখো কর্মে যে প্রবল, তাকেই বলা হয়—কর্মবীর। কর্ম হোক দুর্বল, কর্মী হোক প্রবল।"

একটি ভাষণ:

(৫) ১। আপন কাজে আপন বিবেকের প্রয়োগ কর।

২। যে ভাল-মন্দের পার্থক্য জানে না, সে মন্দ করবেই।

৩। যাকে ঘৃণা কর, তাকে ভয়ও করো।

৪। প্রশ্নকারীর প্রশ্নেই তার জ্ঞান-গরিমার ছাপ থাকে।
৫। বুদ্ধিমান সে, যে নিজ কাজ বুদ্ধির সাথে করতে পারে।
৬। অপরকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজকে দিও।
৭। আজকের কাজকে আজ কর, ফেলে রেখো না।
৮। অনাসক্ত সংসারী উত্তম সংসারী।
৯। অর্থে কারো মাথা উঁচু হয় না, হয় বিবেকে।
১০। তওবা করা অপেক্ষা পাপ না করাই ভাল।
১১। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা মানুষকে শান্তি দেয়।
১২। কারো নামাজ-রোজা দেখেই তার বিচার করো না, বিচার কর তার জ্ঞান ও সাধুতা দেখে।"

(৬) অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর সমীপে:

"হে খাত্তাব নন্দন! তুমি ছিলে অধম, আল্লাহ্ তোমাকে উচ্চে স্থান দিলেন। তুমি ছিলে বিভ্রান্ত, আল্লাহ্ তোমাকে সঠিক পথ দান করলেন। তুমি ছিলে দুর্বল, আল্লাহ্ তোমাকে সবল করলেন। আজ তুমি সমগ্র জাতির কর্ণধার। তাদের কেউ সাহায্য চাইলে, তুমি প্রত্যাখ্যান কর, এখন আল্লাহর সমীপে কি উত্তর দেবে!"

(৭) একবার যুদ্ধক্ষেত্র হতে বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এলে খলিফার কন্যা ও মহানবীর স্ত্রী বিবি হাফ্সা পিতার নিকট কিছু মাল-সম্পদ চাইলে, খলিফা উত্তর দেন—'প্রিয় কন্যা! আমার সম্পত্তিতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু যুদ্ধলব্ধ ধন সর্বসাধারণের; আমি ওখান হতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না।"

একদিন রাতে খলিফা প্রজাবৃন্দের অবস্থা স্বনজরে দেখার জন্য বের হলে একটি মহল্লায় একটি নারী কণ্ঠে শুনতে পেলেন—এক নব বিরাহিত যুবতী সুললিত কণ্ঠে তাঁর বিরহ বেদনা গেয়ে যাচ্ছেন। খলিফা পরে জানতে পারলেন—যুবতীর স্বামী যুদ্ধে গেছেন। তখন খলিফার মনে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি হল। কত বিরহিণী তাঁর জন্য কত বিরহ বেদনা ভোগ করেছেন ও করছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরে কন্যা হাফসাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "একটি নারী কতদিন স্বামীর বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে?" কন্যা উত্তর দিলেন—"বড় জোর চার মাস।" তখন খলিফা কালবিলম্ব না করেই ফরমান জারি করলেন—"কোন সৈন্যকেই চার মাসের বেশি গৃহ-সুখে বঞ্চিত করা চলবে না।"

(৯) একদিন খলিফা এক ব্যক্তিকে বাম হাতে খেতে দেখে ডান হাতে খেতে বললে তিনি বললেন—ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি তাঁর ডান হাতটি হারিয়ে ফেলেছেন। খলিফার কোমল মন ক্রন্দন করে উঠল। তিনি তাঁর জন্য একটি ভৃত্যের ব্যবস্থা করে দিলেন।

(১০) অন্যতম সাহাবী সাঈদ জুমার নামাজ পড়তে না আসায় খলিফা তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সাহাবী অন্ধ হওয়ার কথা জানানো মাত্রই খলিফা তাঁর সাহায্যের জন্য একজন ভৃত্য নিযুক্ত করেন।

(১১) একদিন এক গরিব বেদুঈন কাতর স্বরে খলিফার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করলে, খলিফার নিকট কোন অতিরিক্ত বস্ত্র না থাকায় আপন শরীরের বস্ত্রটিই খুলে দিলেন।

(১২) একবার খলিফা পত্নী উম্মে কুলসুম এক সম্রাজ্ঞীর নিকট কয়েক শিশি আতর উপহার পাঠান, সম্রাজ্ঞী প্রতিদানে ঐ শিশিগুলোতে মহামূল্য মণি-মুক্তা ভর্তি করে পাঠিয়ে দেন। খলিফা একথা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ওগুলোকে হস্তগত করে সরকারি বায়তুল মালে পাঠিয়ে দেন। এবং স্ত্রীকে বলেন—"তুমি খলিফার পত্নী না হলে ওসব পেতে না, সুতরাং ও মাল জনসাধরণের, তোমার নয়। তুমি বড় জোর তোমাব আতরের মূল্য পেতে পারো।"

(১৩) একদিন খলিফা ওমর তাঁর ভৃত্য আসলাম-সহ রাত্রিকালে মদিনা হতে তিন মাইল দূরে সবার নামক পল্লীতে উপস্থিত হয়ে শুনতে পাচ্ছেন—কয়েকটি শিশু (ক্ষুধার জ্বালায়) খুবই ক্রন্দন করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা (ক্লান্ত শবীরে) চুপ হয়ে গেলে খলিফা দরজায় আঘাত দিলে এক রমণী দরজাটি খুলে দিলে খলিফা শিশুদের ক্রন্দন ও নীরব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মহিলা সমস্ত কথা খুলে বলেন—"আমার ঘরে কোন খাবার নেই, দিনে কোন খাবার সংগ্রহ করতে পারিনি। বাছারা ক্রন্দন করতে থাকলে আমি তাদের সান্ত্বনা (বা প্রতারণা করার জন্য) চুলো জ্বেলে বলতে থাকলাম—খাবার হচ্ছে, অপেক্ষা কর! আমি জানি ইতিমধ্যে তারা কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। এখন ঘুমিয়ে পড়ল।" খলিফা পাগলের মত মদিনার দিকে ধাবিত হলেন খাবার আনার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে খাবার এনে মহিলার সঙ্গে একসাথে তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করে ক্ষুধার্ত ও ঘুমন্ত বাচ্চাদের ঘুম হতে তুলিয়ে খাবার খাওয়ানোর পর মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি খলিফাকে আপনার কথা জানান না কেন?" মহিলা উত্তর দিলেন—"ওমরের বদলে আপনি খলিফা হলে কতই না ভাল হতো, ওমর কারো খবর রাখে না।" তখন খলিফা বললেন—"আগামীকাল খলিফার দরবারে যাবেন," তখন মহিলা বলেন—"খলিফার বিরাট দরবারে আমাকে কে দেখবে?" খলিফা—"আমি ওখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করব, ভয় নেই।" পরদিন মহিলা খলিফার দরবারে গিয়ে দেখলেন এ কোন্ খলিফা! একি ধরার মানুষ! মহিলা সবকিছু যেন ভুলে গেলেন। একটি প্রশ্নই কেবল বারবার প্রাণে জাগতে থাকল—"হে আল্লাহ্! খলিফাকে দেখতে এসে, তোমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম।"

(১৪) বাইতুল মালেব একটি উট পালিযে গেলে খলিফা ওমব সেটাকে ধবাব জন্য দৌড়ে গেলেন। তখন আহনাক বিন কাযেস খলিফাকে বলেন, একটি গোলাম পাঠালেই হতো। উত্তবে খলিফা বললেন—"আমাব চেযে জনগণেব বড গোলাম আব কে আছে ?

(১৫) এক খ্রীস্টান বৃদ্ধকে পথিমধ্যে ভিক্ষা কবতে দেখে খলিফা জিজ্ঞাসা কবলেন—"কেন ভিক্ষা কবছেন ?" বৃদ্ধ উত্তবে বললেন—"বৃদ্ধ হযে গেছি, আব পবিশ্রম কবতে পাবি না।" খলিফা উত্তবে বলেন—"আল্লাহব নামে বলছি, এটা কখনও উচিত নয যে, মানুষেব যৌবনেব ফল ভোগ কববো ও বার্ধক্যে বাস্তায ফেলে দেবো।" সঙ্গে সঙ্গে বাইতুল মালেব প্রধানকে হুকুম দিলেন, "একপ সমস্ত অক্ষম ব্যক্তিদেব জন্য ভবণপোষণেব ব্যবস্থা কবো।"

(১৬) একবাব খলিফা অসুস্থ হলে হাকিম মধু সহ ওষুধ খেতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ঘবে মধু না থাকায একজন বললেন—"বাইতুল মালে প্রচুব মধু জমা আছে, কিছুটা আনিযে নিন।" খলিফা বললেন—জুম্মাব দিনে সকলেব অনুমতি ব্যতীত আমি ওটা নিতে পাবি না আমাব নিজেব জন্য। কেননা আমি মালি মাত্র মালিক নই।"

(১৭) একবাব খলিফা ছদ্মবেশে বাত্রিকালে মদিনাব উপকণ্ঠে ঘুবাফেবা কবতে থাকেন। এবং লক্ষ্য কবলেন—একটি তাঁবুতে এক জননীব কোলে একটি কচি শিশু অনববত সজোবে ক্রন্দন কবছে। শিশুটি ক্ষুধাব জ্বালায মাযেব বুকেব দুধ খাওযাব জন্য ছটফট কবছে। মা কিছুতেই তাকে দুধ দেবে না। খলিফা মহিলাকে বাচ্চাটিকে শান্ত কবাব জন্য বলেন। কিন্তু জননী ভ্রূক্ষেপ কবেন না। খলিফা তখন শিশুটিব চিৎকাবে মা কে ধমক দিযে কথা বললে মা খলিফাকে জানান—"যা জান না, তা নিযে ঝাল ঝাড়ছ কেন ?" খলিফা জানতে চাইলে—মা গোপন বহস্যটি ব্যাখ্যা কবে বোঝালেন—"খলিফা ওমব আইন কবেছেন, শিশু তাব মাঁযেব দুধ না ছাড়া পর্যন্ত সবকাবি ভাতা পাবে না। সুতবাং সবকাবি ভাতা পাওযাব জন্যই তাকে জোব কবে দুধ ছাড়াচ্ছি।" এই কথা শোনামাত্রই খলিফাব অনুশোচনাব কোন সীমা থাকল না। তিনি পবদিনই ফবমান জাবি কবলেন—"শিশু জন্মাবাব সঙ্গে সঙ্গেই সবকাবি ভাতা পাবে।"

(১৮) একটি জনসভায খলিফা বক্তৃতা দান কালে একবাব জনগণকে সম্বোধন কবে বলেন—"আমি যদি বিপথগামী হই, তাহলে তোমবা কি কববে ?" তখনই এক যুবক তববাবি হাতে দাঁড়িযে উত্তব দিল—"এই তববাবিই আপনাকে পথে আনবে, কিংবা পবপাবে পাঠিযে দেবে।" খলিফা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহব নিকট শুকব কবলেন এই বলে—"হে আল্লাহ্! অমি কতই ভাগ্যবান, আমাকে সৎপথে চালাবাব জন্য তুমি কতই না সাহসী যুবক দান কবেছ।"

(১৯) একদা শুক্রবার জুম্মার নামাজে খলিফা খোতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে দাঁড়ানো মাত্র এক যুবক বলে বসলেন—"হে খলিফা! আপনি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, অতঃপর আপনার ভাষণ শুনবো। খলিফা তৎক্ষণাৎ মিম্বর হতে নেমে তাঁকে প্রশ্ন করলেন—"আপনার জিজ্ঞাস্য কি? যুবক উত্তর দিলেন আমরা মালে গনিমাত থেকে যেটুকু কাপড় পেয়েছি, তাতে একটি জামা তৈরি করাও শক্ত, কিন্তু আপনি এত বড় জামা কোথা হতে পেলেন?" খলিফা উত্তরে বলেন—আমার পুত্র আব্দুল্লাহ এর উত্তর দেবে।" সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল্লাহ দাঁড়িয়ে বললেন—"আমার কাপড়ের অংশটুকু আমি আমার পিতাকে দিয়েছি।" তখন যুবক বললেন—"হে খলিফা, আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম। আপনি ভাষণ দিন।" খলিফা বললেন—"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে কতই না ভাগ্যবান করেছো যে, আমাদের মধ্যে একটি সাধারণ মানুষও আমার কৈফিয়ত তলব করার সাহস রাখে। এবং তুমি আমাকে এমনি শক্তি দান করেছ যে, আমি আমার শাসনতন্ত্র এরূপভাবে চালাই, যাতে সাধারণ মানুষও সাহস হারায় না।"

(২০) একদা এক ব্যক্তি খলিফাকে বলেন—"হে ওমর! আপনি কি জানেন, মিশরের গভর্নর আইয়াজ-বিন-ঘনম মিহি কাপড় শৌখিন পোশাক পরেন এবং দ্বারে দ্বারী রাখেন। খলিফা সেইদিনই মিশরে মহম্মদ-বিন-মসলামাহকে একটি কড়া নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন। আইয়াজকে যে অবস্থাতে পাবে, সেই অবস্থাতেই খলিফার সম্মুখে হাজির করার জন্য। দূত সেখানে গিয়ে দেখলেন—অভিযোগ সত্য। তিনি আইয়াজকে ঐ অবস্থাতেই খলিফার সম্মুখে হাজির করলে খলিফা নির্দেশ দিলেন আইয়াজকে কোরা কাপড় পবতে, এবং এক পাল মেষ দিয়ে বললেন—"যাও এবার হতে জঙ্গলে মেষ চরাও।" আইয়াজ বিনা প্রতিবাদে খলিফার হুকুম তামিল করে আপন অদৃষ্টকে এই বল্লে ধিক্কার দিলেন যে—"এর চেয়ে মৃত্যু ঢের ভাল ছিল।" খলিফা তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"তোমার পিতা চিরদিনই মেষের রাখাল ছিলেন, সুতরাং তোমার লজ্জা পাওয়ার কথা নয়।" আইয়াজ অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং খলিফার নির্দেশকে শিরধার্য করে মেষপালকের কাজ আরম্ভ করলেন। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে খলিফা ওমরের এই বিচারের দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত আজও পর্যন্ত মিলবে কি না জানি না। একমাত্র এই জন্যই খলিফা ওমরের একটি অঙ্গুলি হেলানতে একদিন অর্ধ পৃথিবী কেঁপে উঠত।

"অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধূলার তখতে বসি'
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি'।"

—নজরুল

অপরের মুখে ওমর:

পারস্যের শাসনকর্তা যখন বশ্যতা স্বীকার করতে এলেন, তখন দেখলেন অর্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর খলিফা ওমর দীন-দুঃখীদের সাথে ক্লান্ত শরীরে মসজিদের মাটিতে ঘুমন্ত।" —বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন।

"ওমর বেত্র হাতে মদিনার পথে ঘাটে ভ্রমণ করতেন।... ওমরের বেত্র অন্যের তরবারি অপেক্ষাও ভীষণ ছিল।" ——উইলিয়ম মূইর।

"ওমরই ছিলেন মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা,..তাঁর আদেশ ও নিষেধ অতি উত্তম হৃদয়ের পরিচয় বহন করে।" —ওয়াশিংটন আরভিং।

"ওমর মদিনাতেই থাকতেন, কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর সামান্য মুঠিতেই থাকত। এমনি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অসামান্য প্রভাব।"

— এনসাইক্লোপেডিয়া বিট্রানিকা।

"ওমর-হৃদয় একটি বহু দ্বারবিশিষ্ট গৃহ যেন। কোন দ্বারে বিশ্ববিজয়ী আলেজাণ্ডারের বিশ্বজয়ী প্রতিভা, কোন দ্বারে—নওশেরওয়ার মহানুভবতা, কোন দ্বারে আব্দুল কাদের জিলানীর ন্যায় তাপস, কোন দ্বারে আবু হোরাইবার মতো হাদিস বিদ, কোন দ্বারে জালালুদ্দীন রুমীর ন্যায় চিন্তানায়ক। আর বিশাল জনতা গৃহটির চারিদিকে ইমামের নিকট হতে আপন আপন ক্ষুধা মিটিয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে বাড়ি ফিরছে।" —শাহ ওয়ালীউল্লাহ।